হেমেন্দ্রকুমার রচনাসমগ্র-৩

তৃতীয় প্রকাশ
ফাল্গুন ২২, ১৩৮৯
মার্চ ৭, ১৯৮৩

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর
ধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
রমেন আচার্য
কলকাতা-৭০০ ০০১

অলঙ্করণ
সুব্রত ত্রিপাঠী
কলকাতা-৭০০ ০৩৩

বাঁধাই
বিদ্যুৎ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
কলকাতা-৭০০ ০০৯

দাম
ত্রিশ টাকা

ভূমিকা

কোন একটা পত্র পত্রিকার নাম ধরে এক এক সময়ের সাহিত্যের ধারাকে আলাদা করে দেখা আর সে পত্র-পত্রিকার সম্বন্ধ ধরে এক দল লেখককে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলাটা সব ক্ষেত্রে যে সঠিক হয় তা নয়। পত্রিকার নামে যুগ ভাগ করতে গিয়ে সাহিত্যের প্রবাহকে একটা কৃত্রিম ছকে ফেলা হয়, আর গোষ্ঠীর বেড়ার মধ্যে বাঁধতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ লেখকের মৌলিক ব্যক্তিত্বের ওপর করা হয় অবিচার।

কল্লোল-কালিকলম যুগ, ভারতী যুগ বললে সে রকম একটু দোষ ত্রুটি হলেও নামকরণগুলো একেবারে নিরর্থক নয়। এক একটি কাগজকে আশ্রয় করে সত্যিই এক এক সময়ের সাহিত্য সাধনার একটা বিশেষ বেগ আর বিস্তার দেখা যায়। যে পত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সব লেখক নিজেদের প্রকাশিত করেন নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়েই তাঁদের মধ্যে একটি যুগোচিত প্রেরণা আর সুরের মিল দেখা যায়।

চন্দ্র সূর্যের মত সাহিত্যের আকাশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পূর্ণজ্যোতিতে বিরাজ করবার সময়েই ভারতী পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত এমনি একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

এ গোষ্ঠীতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ মহারথী না হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের দুনিয়ার পরিবর্তনশীল নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রাণবেগের আভাস ফুটিয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্যে।

'ভারতী' দলের এই সব সাহিত্যকারদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় যে প্রাণবেগে সব চেয়ে উচ্ছল ছিলেন, তাঁর লেখার বহর দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কি না লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, আর কত কি না করেছেন সে যুগের অনেক কিছুতে অগ্র পথিকের ভূমিকা নিয়ে।

লেখক জীবন শুরু করেছিলেন বড়দের জন্যে গল্প, কবিতা, উপন্যাস দিয়ে। ঝড়ের যাত্রী, পাঁকের ফুল, মণিকাঞ্চন ইত্যাদি উপন্যাস তখনকার দিনে রসিক পাঠকের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। কবিতা ও গল্প লেখাতেও তাঁর স্বচ্ছন্দ মুন্সিয়ানা ছিল তা অবহেলার যোগ্য নয়। তাঁর কয়েকটি গল্প অনুবাদিত হয়ে ইওরোপের সাহিত্য রসিকদের মুগ্ধ প্রশংসা পেয়েছিল।

তাঁর সে সময়কার সাহিত্য সৃষ্টিতে সব চেয়ে যা লক্ষ্য করবার ছিল তা তাঁর

বলিষ্ঠ মনের সৎ সাহস। সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে অনবদ্য অসাধারণ বিশেষণ প্রয়োগ করবার মত না হলেও তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাতেই আমাদের সমাজ জীবনের নানাদিকের অন্ধ সংস্কার ভাঙার একটা নির্ভীক প্রেরণা সব সময় দেখা যেত।

আমাদের সেই সদ্য কৈশোর পার হওয়া বয়সে মনের ওপর তাঁর একটি উপন্যাস পড়ার দাগ এখনো মোছেনি দেখতে পাচ্ছি। সে উপন্যাসের নামটি ঠিক মনে নেই, গল্পটাও স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে এসেছে কিন্তু মনের মধ্যে যা এখনো সুস্পষ্ট হয়ে আছে তা লেখকের সাহস। কোনো রকম আস্ফালিত সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা না দিয়ে অতি সহজ স্বাভাবিকভাবে মিথ্যা জাতি ভেদের লজ্জাকর অসারতা যে সে রচনায় দেখানো হয়েছিল এটুকু বেশ স্পষ্ট করেই মনে আছে।

গল্প উপন্যাস কবিতা লেখা ছাড়া হেমেন্দ্রকুমার আরো অনেক কিছুতেই উৎসাহী ছিলেন। শিল্পের রাজ্যে চৌকস মানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। ছবি আঁকা শিখেছিলেন রীতিমতো স্কুলের শিক্ষা নিয়ে। শুধু গান বাঁধতেন না, যথার্থ সুরজ্ঞ ছিলেন, রসিক ছিলেন নৃত্যকলার। তখনকার রঙ্গমঞ্চে অনেক নাচের পরিকল্পনা তাঁর দেওয়া। আদি ছৌ নৃত্যের তিনিই আবিষ্কারক ও প্রচারক বলা যায়। উড়িষ্যায় সেরাইকেলা রাজ পরিবারের নিজস্ব নৃত্যশিল্প ছৌ নৃত্যের মাধুর্য মহিমা তিনিই প্রথম শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনেন।

এই বহুগুণান্বিত মানুষ একদিন ছোটদের জন্যে কলম ধরলেন।

ছোটদের সাহিত্য তখন দরিদ্র দুর্বলগোছের কিছু নয়। বরং সেটাকে আমাদের শিশু ও কিশোর সাহিত্যের স্বর্ণ-যুগ বলা যায়। যোগীন সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ত আছেনই, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার দেশীয় রূপকথার ভাঁড়ার নতুন করে সাজিয়ে সকলের জন্যে খুলে ধরেছেন। সব চেয়ে যা বড় কথা তা হ'ল 'সন্দেশ' পত্রিকা তখন বার হয়ে ছোটদের সাহিত্যে যুগান্তর এনেছে। যুগান্তর বিশেষ করে এসেছে সুকুমার রায়ের লেখায়।

সুতরাং ছোটদের সাহিত্যের সে একটা সত্যিকার জমজমাট সময় যেদিকে চাওয়া যায় সবদিকই ঝলমল করছে আশ্চর্য সব লেখায়। এর মধ্যে অভাব ছিল শুধু এক জাতের লেখার। সে লেখা হল অজানার টানে আর দুঃসাধ্য সাধনের উৎসাহে ছোটদের মনে বিপদ বাধার সঙ্গে যোঝার একটা দুঃসাহসিকতার নেশা ধরিয়ে দেবার।

ছোটদের সাহিত্যের এই অভাবটার কথা মনে রেখেই শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার গল্পের প্রয়োজন আছে বলেছিলেন।

সেই অভাব পূরণ করার প্রথম সার্থক চেষ্টা হেমেন্দ্রকুমারের কলমেই হল।

'যকের ধন' এ দেশের কিশোর সাহিত্যের প্রথম বিপদ-বরণ দুঃসাহসিকতার রহস্যঘন কাহিনী বললে ভুল বলা হয় না। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মৌচাক পত্রিকায় বার হবার পরই তা ছোটদের মহলে যে সাড়া জাগিয়ে দেয় একথা আজও মনে আছে।

সেই ১৯২৩-এ শুরু করবার পর হেমেন্দ্রকুমার ছোটদের জন্যে অজস্র লেখা লিখেছেন। সে সব লেখা এক জাতের নয়। এ্যাডভেঞ্চার গল্প থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক, ভৌতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক নানা ধরনের কাহিনী তার মধ্যে আছে।

সে সময়কার ত বটেই। কালের ব্যবধান ডিঙিয়ে সে সব রচনার আকর্ষণ আজও যে অক্ষুণ্ণ আছে তার কারণগুলির মধ্যে একটি হল তাদের প্রাণবন্ত সজীবতা। সে সব লেখার প্রতি ছত্রে একটা সুস্থ বলিষ্ঠ প্রাণবেগ যেন আপনা থেকে ফুটে উঠেছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় নিজে মানুষটি যেমন ছিলেন তাঁর লেখাও যেন তাই। তিনি যে কি রকম সহজ সদানন্দ প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন তা বিশেষণ দেওয়া ভাষায় বোঝাবার দুর্বল চেষ্টা না করে একটা ছোট ঘটনার কথাই বলি।

বেশ অনেক দিন আগের কথা। দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী এ্যাভিনিউ তখন রাস্তা হিসাবে পাতা হয়েছে কিন্তু ট্রাম বাস দূরের কথা গাড়ি ঘোড়াও সে রাস্তায় চলে না বললেই হয়। রাস্তার দু'ধার তখনও প্রায় ফাঁকা। এক একটা ছোটখাটো বাড়ি ছাড়া বেশির ভাগ জায়গাতেই গাছ-গাছড়া তখনো কাটা হয়নি।

এ রাস্তার সেই আদি যুগে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধেয় কবি যতীন বাগচি মশাই এখন যেখানে হিন্দুস্থান রোড সেখানে একটি বাড়ি তৈরি করে থাকতেন। এক তলা বাড়ি। তবে ঘর অনেকগুলি আর বাড়িটি ছোট বড় লেখকদের জন্যে সব সময়ে অবারিত দ্বার। যতীন বাগচি মশাই সাহিত্য ভালবাসতেন আর সাহিত্যিকদেরও। তাঁর বাড়িতে প্রতিদিনই বিকালের দিকে অন্ততঃ অনাহুত সাহিত্যের আসর পাতাই থাকত। তাঁর স্নেহ ভালবাসার টানে মাঝে মাঝে সে বাড়িতে উপস্থিত হতাম আমরা কেউ কেউ। একবার সেখানে গেলে সকাল সকাল ছাড়া পাওয়া ছিল অসম্ভব।

সেদিনও অমনি ছাড়া পাইনি। রাত তখন প্রায় ন'টা বাজে। অনেক বলে

কয়ে অনুমতি পেয়ে উঠব উঠব করছি এমন সময় যেখানে আমাদের আসর জমেছিল সেই বৈঠকখানায় বাইরের দরজায় নয়, সেই ঘরেরই একদিকের পাশের একটি বন্ধ জানালায় বেশ জোরে জোরে ঘা দেওয়ার শব্দ।

ও জানালায় আবার ঘা দেয় কে! জানালার ওদিকটা ত একেবারে ফাঁকা উদম জংলা মাঠ। রাস্তার দিকের দরজায় এসে ওদিকে এল আবার কে?

কে যে এসেছে তা এরপরেই জানালার খড়খড়ি তুলে হাঁক দেওয়া গলার আওয়াজেই বোঝা গেল। এসেছেন হেমেন্দ্রকুমার, সঙ্গে তাঁর মঙ্গোলীয় ছাঁচের মুখ একজন তরুণ ভদ্রলোক। বাড়ি চিনতে না পেরে রাস্তা ভুল করে ওই জানালার দিক দিয়েই এসে পৌঁছেছেন।

হেমেন্দ্রকুমার এসেই তারপর ঘোষণা করলেন যে এবার তিনি সকলকে গান শোনাবেন। গান সব তাঁর রচনা আর গাইবেন হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গী সেই অজানা তরুণ।

অসময়ে অদ্ভুত প্রস্তাব সন্দেহ নেই। কিন্তু গান শুনে সবাই মুগ্ধ। গানের রচনায় যতটা গায়কের গলা আর গাওয়ার উৎকর্ষেও ততটা। পরে যিনি সঙ্গীতের জগতে ভারত বিখ্যাত সেই অজানা তরুণ ছিলেন সেই শচীন দেব বর্মণ।

সেদিন কবি যতীন বাগচি মশাই-এর বাড়িতে হেমেন্দ্রকুমারকে যে রকম দেখেছিলাম সেইটেই তাঁর স্বাভাবিক স্বরূপ। তিনি কোন দিকেই ছকবাঁধা গতানুগতিক রাস্তার পথিক নন, কিন্তু জীবনে যেমন সাহিত্যেও তেমনি তাঁর প্রাণোচ্ছলতা শোভন সংযমে বাঁধা।

ছোটদের সাহিত্যে তাঁর অসামান্য সাফল্যের প্রধান রহস্যও এইখানে।

ভাষার মধুর প্রাঞ্জলতা তাঁর সমস্ত রচনার একটা প্রধান আকর্ষণ ত বটেই তার চেয়েও যা বিশেষভাবে মূল্যবান তা হল একটা সুস্থ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি যা দুঃসাহসিক প্রাণবেগকেও ভাবালুতা কি আস্ফালনের আতিশয্যে কখনো স্খলভ হতে দেয় না।

ছোটদের মনের স্বাভাবিক সুস্থ বলিষ্ঠ বিকাশ যাঁরা চান হেমেন্দ্রকুমারের লেখা তাঁদের কাছে চিরদিনই যোগ্য স্বীকৃতি পাবে।

কলিকাতা　　　　　　　　　　　　　　　　　প্রেমেন্দ্র মিত্র

৭-১২-১৯৭৬

সূচীপত্র

আমাদের প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বই

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

প্রথম খণ্ড	২৫·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	৩০·০০
চতুর্থ খণ্ড	২৫·০০
অমাবস্যার রাত	৫·০০
ভূতের রাজা	৫·০০
অমৃতদ্বীপ	৪·০০
সব সেরা গল্প	৫·০০

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবলা-বিবি নয়, অবলা-বাবু

আজকের বিকাল-বেলাটা বিমলের কাছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল। কারণ তার অষ্ট-পহরের সঙ্গী কুমার বেড়াতে গিয়েছিল মামার বাড়িতে, শান্তিপুরে।

ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সে একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল আনমনে।

এমন সময়ে নিচে থেকে মেয়ে-গলায় ডাক এল, 'বিমলবাবু বাড়িতে আছেন?'

বিমল বিস্মিত হল। কারণ আজ পর্যন্ত কোন মহিলা আগন্তুকই রাস্তা থেকে এভাবে গলাবাজি করে তার নাম ধরে ডাকেননি।

চেঁচিয়ে বললে, 'রামহরি, কে ডাকছেন দেখ! ওঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাও। আমি এখনি যাচ্ছি।'

রামহরি নিজের মনেই বক্‌বক্‌ করতে করতে এগিয়ে গেল— 'কালে কালে আরো কতই দেখতে হবে, জানি-নে বাপু! রাস্তায় বেরিয়ে মেয়েরাও বাবুদের মত নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকে! হল কি!'

গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে বিমলও নিচে নেমে গেল।

বৈঠকখানায় ঢুকে সবিস্ময়ে দেখলে, একখানা কৌচ জুড়ে বসে আছে অতিকায় এক পুরুষ-মূর্তি—মানুষের এত মস্ত চেহারা প্রায় অসম্ভব বললেও চলে! উঠে দাঁড়ালে তার মাথা নিশ্চয়ই সাত ফুটের উপরে যাবে, এবং তার বুকের ঘের সহজ অবস্থাতেই বোধহয় পঁয়তাল্লিশ ছ-চল্লিশ ইঞ্চির কম হবে না। তার রঙ শ্যাম, মুখের আধখানা প্রকাণ্ড চাপদাড়িতে সমাচ্ছন্ন এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা উদ্দাম পশুশক্তির উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে। বয়েস তার চল্লিশের ভিতরেই।

বিমল ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'যে মহিলাটি আমায় ডেকেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?'

মেয়ে-গলায় খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে আগন্তুক বললে, 'না বিমলবাবু, ডাকছিলুম আমিই। আমায় কি আপনি মেয়েমানুষ বলে মনে করেন?'

বিমল চমৎকৃত হয়ে হেসে বললে, 'সর্বনাশ, আপনার মত প্রচণ্ড পুরুষকে মহিলা বলে শেষটা কি বিপদে পড়ব?'

আগন্তুক বললে, 'আপনার দোষ নেই, আমার গলা শুনে সকলেই ধাঁধায় পড়ে যান, তারপর আমার চেহারা দেখে চমকে ওঠেন! ভগবানের ভুল মশাই, ভগবানের ভুল! তারপরে বাবাও ভুল করে আমার নাম রেখেছেন অবলাকান্ত!'

বিমল একখানা সোফার উপরে বসে পড়ে বললে, 'তাই বুঝি আপনি কুস্তি-টুস্তি লড়ে ভগবানের আর পিতার ভ্রম-সংশোধনের চেষ্টা করেন?'

অবলাকান্ত আবার নারীকণ্ঠে হাসতে শুরু করে দিলে।

ঐ চেহারার ভিতর থেকে মেয়ে-হাসি শুনে বিমল কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল,—এ যেন জয়ঢাক ফুঁড়ে বেরুচ্ছে সেতারের প্রিং-প্রাং!

সে বললে, 'আমার কাছে কি মশাইয়ের কোন দরকার আছে!' এবং বলেই লক্ষ্য করলে, অবলাকান্ত কানা। তার একটা চোখ পাথরের।

অবলাকান্ত বললে, 'হ্যাঁ বিমলবাবু, আপনাকে আমার অত্যন্ত দরকার! আমি এখানে এসেছি একটা গোপনীয় পরামর্শ করতে!'

—'আমার মত অচেনা লোকের সঙ্গে আপনি গোপনীয় পরামর্শ করতে এসেছেন? আশ্চর্য কথা বটে!'

—'বিলক্ষণ! কে বললে আপনি আমার অচেনা! আপনাদের দুঃসাহসিকতার কাহিনী বাংলাদেশের কে না জানে? খালি কি বাংলাদেশ? মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত আপনাদের চিনে ফেলেছে! তাই তো এসেছি আপনার কাছে!'

বিমল কৌতূহলী স্বরে বললে, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলে বলুন তো?'—'হ্যাঁ, তাই বলব বলেই তো এসেছি। কিন্তু তার আগে অঙ্গীকার করুন, আমার গুপ্তকথা আর কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না?'

—'বেশ অঙ্গীকার করছি।'

অবলাকান্ত অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আপনারা একবার আসামে যকের ধন আনতে গিয়েছিলেন তো?'

—'হুঁ।'

—'আমি কিন্তু এই কলকাতাতেই এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পেয়েছি।'

বিমল তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে বসে বললে, 'কি রকম?'

—'শুনুন বলি—আমি টালিগঞ্জের পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রীটে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছি। বাড়িখানা খুব বড়ো আর পুরানো। শুনেছি কোন্ সেকালে এখানে নাকি এক রাজা বাস করতেন—এখন তাঁর বংশের কেউ নেই। এই বাড়ির সিঁড়ির তলায় চোর-কুঠরীর মতন একখানা ঘর আছে, সে ঘর আমরা ব্যবহার করি

না। এই ঘরেরই এক দেয়ালে হঠাৎ আমি একটা গুপ্তদ্বার আবিষ্কার করেছি।'

বিমল বললে, 'সেকালকার অনেক ধনীর বাড়িতেই এমন গুপ্তদ্বার পাওয়া যায়। এ আর এমন আশ্চর্য কি? আপনি কি সেই গুপ্তদ্বার খুলেছেন?'

—'হ্যাঁ?'

—'খুলে কি দেখলেন?'

—'খালি অন্ধকার।'

—'তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন? অমন অনেক গুপ্ত-দ্বারই আমি দেখেছি। তাদের পিছনে অন্ধকার থাকতে পারে, কিন্তু কোন রহস্য থাকে না।'

—'আগে আমার কথা শুনুন। গুপ্তদ্বার খুলে প্রথমে দেখলুম অন্ধকার। তারপর আলো জ্বেলে দেখলুম, একটা সরু পথ। সেই পথ ধরে খানিকটা এগিয়েই কি হলো জানেন?'

—'কি হলো?'

বিমল দেখলে, অবলাকান্তের পাথরের চোখে কোন ভাবান্তর হলো না বটে, কিন্তু তার অন্য চোখটি দারুণ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ভীত অভিভূত কণ্ঠে সে বললে, 'পথটা কতখানি লম্বা জানি না, কারণ, আমার লণ্ঠনের আলো সামনের অন্ধকার ঠেলে বেশিদূর যেতে পারেনি। আমিও হাত পাঁচ-ছয়ের বেশি যেতে না যেতেই শুনতে পেলুম, নিরেট অন্ধকারের ভিতর থেকে বিকট, অমানুষিক স্বরে কে গর্জন করে উঠলো। তারপরেই শুনলুম যেন কাদের দ্রুত পদশব্দ—যেন কারা দৌড়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে! ভয়ে পাগলের মতো হয়ে আবার বাইরে পালিয়ে এলুম। সে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়েছি।'

বিষম কৌতূহলে বিমলের দুই চক্ষু জ্বলে উঠলো—এতক্ষণ পরে জাগল তার সত্যিকার আগ্রহ!

অবলাকান্ত বললে, 'আমার বিশ্বাস সেই গুপ্তদ্বারের পিছনে যকেরা পাহারা দেয়, আর তার ভিতরে আছে গুপ্তধন! কিন্তু গুপ্তধনের লোভে তো আর প্রাণ দিতে পারি না মশাই?'

বিমল বললে, 'ওখানে গুপ্তধন আছে কিনা জানি না, কিন্তু যক-টক যে নেই এটা একেবারে নিশ্চিত। ও-সব আমি মানি না।'

অবলাকান্ত বললে, 'আমার চেহারাটাই কেবল প্রকাণ্ড, আপনার মতন দুর্জয় সাহস আমার নেই! আর এ-রকম ব্যাপারে আপনার মাথা খুব খেলে জেনেই তো পরামর্শ করতে এসেছি! এখন আমার কি করা কর্তব্য!'

—'সেই গুপ্তদ্বারটা আগে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?'

—'কেন পারব না? মনে রাখবেন, গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলে আপনিও তার অংশ থেকে বঞ্চিত হবেন না!'

বিমল শুষ্কস্বরে বললে, 'গুপ্তধনের কথা এখন থাক। সুড়ঙ্গের রহস্যটা কি আমি কেবল তাই জানতে চাই! আপনি কি এখনি আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন?'

—'অনায়াসে। ট্যাক্সিতে চড়ে সেখানে যেতে আধঘণ্টার বেশী লাগবে না।'

—'তাহলে উঠে পড়ুন। আজ আমি জায়গাটা খালি চোখে দেখে আসব। কর্তব্য স্থির করব পরে।'

টালিগঞ্জের যে-জায়গায় গিয়ে ট্যাক্সি থামল সেখানটাকে কলকাতা শহরের এক প্রান্ত না বলে প্রায় নির্জন জঙ্গলের প্রান্ত বলা উচিত। লোকজনের আনাগোনা খুব কম—দূর থেকে মাঝে মাঝে কেবল দু-একজন মানুষের উচ্চ কণ্ঠস্বর বা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়ায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

বড় রাস্তা ছেড়ে অবলাকান্তের সঙ্গে বিমল আরো সরু এমন একটি পথে প্রবেশ করল, যেখান দিয়ে গাড়ি চলবার উপায় নেই।

বেশ খানিকটা এগিয়ে পাওয়া গেল একখানা জরাজীর্ণ, কিন্তু প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই নাকি অবলাকান্তের রাজবাড়ি। কত যুগ আগে সে যে রাজার উপযোগী ছিল, তাকে দেখে আজ তা অনুমান করা সহজ নয়। তার চারিদিকের জঙ্গলাকীর্ণ জমি আচ্ছন্ন করেই কেবল মান্ধাতার আমলের বুড়ো বুড়ো গাছ বিরাজ করছে না, নিজের গায়ে অর্থাৎ দেওয়ালের ওপরেও সে আশ্রয় দিয়েছে রীতিমত হোমরা-চোম্‌রা অশ্বত্থ-বটকে। অনেক জায়গাতেই জানলা-দরজা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের বদলে রয়েছে কতকগুলো হাঁ-হাঁ করা গর্ত।

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'অবলাকান্তবাবু, এ বাড়িতে থাকেন কি করে?'

অবলাকান্ত বললে, 'বাড়ির বর্তমান মালিকের এমন পয়সা নেই যে এর আগাগোড়া মেরামত করেন। কিন্তু তিনি একটা মহল ভালো করেই সংস্কার করে দিয়েছেন, কাজেই আমার অসুবিধা হয় না। এই যে, এইদিকে আসুন।'

হ্যাঁ, বাড়ির এ অংশটা বাসের উপযোগী বটে। উপরের কোন কোন ঘরে আলো জ্বলছে, নিচের সদর-দরজার সামনে বসে এক দ্বারবান।

অবলাকান্ত দ্বারবানের কাছ থেকে একটা লণ্ঠন চেয়ে নিয়ে বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে আগেই সেই চোর-কুঠরীটা দেখিয়ে আনি।'

দু-দিকের কয়েকটা ঘর পার হয়েই তারা একটা উঠানে গিয়ে পড়ল। উঠানের এককোণে সেকেলে সিঁড়ির সার এবং তার তলায় একটা মাঝারি আকারের দরজা, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত—গায়ে তার লোহার কীল মারা।

অবলাকান্ত দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আড়ষ্ট স্বরে

বললে, 'ঐ দরজাটা খুললেই ওর ভেতরে পাবেন সেই ভয়াবহ গুপ্ত-দ্বার ! সত্যি বলছি বিমলবাবু, আমার কিন্তু এখানে আর দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না !'

বিমল বাইরের দরজা খুলে ফেলে বললে, 'আপনার ভয় দেখে আমার হাসি পাচ্ছে ! কই গুপ্তদ্বার কোথায় ? আলোটা ভালো করে তুলে ধরুন দেখি !' সে একেবারে চোর-কুঠরীর ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল—এবং সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল চোর-কুঠরীর দরজা ! ঘোর অন্ধকার !

ভিতর থেকে বিস্মিত কণ্ঠে বিমল বললে, 'একি অবলাকান্তবাবু, দরজা বন্ধ করলেন কেন ?'

বাহির থেকে শব্দ শুনে বোঝা গেল, চোর-কুঠরীর দরজায় শিকল তুলে দেওয়ার ও তালা-চাবি-লাগানোর শব্দ !

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে বিমল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'দরজা খুলে-দিন অবলাকান্তবাবু ! আমি এ-রকম ঠাট্টা পছন্দ করি না !'

বাহির থেকে নারীকণ্ঠে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে অবলাকান্ত বললে, 'ঠাট্টা নয় হে বিমল, ঠাট্টা নয় ! আজ তুমি আমার বন্দী !'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামহরি যা শোনে, ভোলে না

মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে কুমার প্রথমেই ছুটলো বিমলের বাড়িতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এলো বাঘা। তখন সকাল।

এ রাস্তায় বিমলদের দু-খানা বাড়ি ছিল। একখানা খুব বড়ো এবং একখানা খুব ছোট। বড়ো বাড়িখানায় বাস করতেন বিমলের বহু আত্মীয়-স্বজন—যাঁদের সঙ্গে আমাদের গল্পের কোন যোগ নেই।

ছোট বাড়িখানায় বাস করত বিমল নিজে। সে বহু লোকের গোলমাল সহ্য করতে পারত না, তাই ফাই-ফরমাস খাটবার পক্ষে রামহরিই ছিল যথেষ্ট। বড়ো বাড়িতে যেত কেবল দু-বেলা দুটি আহার করবার জন্যে। বাকি সময়টা তার কেটে যেত ছোট বাড়ির ছোট্ট বৈঠকখানায় বা লাইব্রেরিতে বসে কখনো পড়াশুনা করে এবং কখনো কুমারের সঙ্গে বিচিত্র ও অসম্ভব সব স্বপ্ন দেখে। শান্তিপূর্ণ নির্জনতায় বাড়িখানিকে মনে হোত যেন আশ্রমের মতো।

এ-বাড়ির আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, পিছনকার বাগান। বিমল ও কুমারের যত্নে এই মাঝারি বাগানখানি সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে এমন অপূর্ব হয়ে উঠেছিল যে, অধিকাংশ বিখ্যাত ও বৃহৎ উদ্যানকেও লজ্জা দিতে পারত অনায়াসেই। তারা যখনই পৃথিবীর যে-কোন দেশে গিয়েছে, তখনই সেখান থেকে নিয়ে এসেছে নানা-জাতের গাছ-গাছড়া। য়ুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা দেশের গাছ ও চারার সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করে এখানে বাংলার নিজস্ব বনভূমির রঙ, গন্ধ, শ্যামলতা।

আঁকাবাঁকা করে কাটা একটি খাল নদীর অভাব মেটাবার চেষ্টা

করে। টলমলে জলে দোলে পদ্মফুল, আশেপাশে বাহারী ঝোপ-ঝাপ, ছোট্ট নকল পাহাড়, কোথাও সুদৃশ্য সেতু চলে গিয়েছে এ-পার থেকে ও-পারে। এক জায়গায় পাহাড়ের উপর আছে কৃত্রিম ঝরনা। ফুলন্ত লতাপাতায় সমাচ্ছন্ন এতটুকু একখানি কুঁড়েঘরেরও অভাব নেই। বড়ো বড়ো গাছের ঘন পাতার আড়ালে লুকোনো সব খাঁচায় বসে নানান পাখি মিষ্টি সুরের আলাপে চারিদিক করে তুলেছে সঙ্গীতময়। বাগানে এসে দাঁড়ালেই বিস্ময় জাগে, এত অল্প জায়গার ভিতরে এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ সম্ভবপর হলো কেমন করে?

কুমার বাড়ির সদর-দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। বৈঠকখানায় কেউ নেই, লাইব্রেরিও শূন্য। উপরে উঠেও কারুর দেখা পেলে না। একটু আশ্চর্য হয়ে ডাকলে 'বিমল, বিমল!··রামহরি!'

কারুর সাড়া নেই।

বাঘা ব্যস্তভাবে এ-ঘরে ও-ঘরে ঢুকে ঘেউ-ঘেউ ভাষায় বোধ করি বিমল ও রামহরিকেই ডাকতে লাগল।

কুমার ভাবলে, বিমল তাহলে বাগানের দিকে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে আবার নিচে নামবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখলে, রেলিং ধরে কাতরভাবে উপরে উঠছে রামহরি—তার মাথার চুল, মুখ ও দেহ রক্তমাখা!

মুহূর্তকাল হতভম্বের মতো থেকে কুমার বললে, 'রামহরি, এ-কী ব্যাপার?'

রামহরি ধপাস্ করে সিঁড়ির ধাপের উপরে বসে পড়ে বললে, 'গুণ্ডার হাতে পড়েছিলুম বাবু!'

—'গুণ্ডার হাতে!'

রামহরি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কাল বৈকালে একটা দুশমন চেহারার লোক এসে খোকাবাবুকে ডেকে নিয়ে যায়! অনেক রাত পর্যন্ত খোকাবাবু ফিরল না বলে আমি যখন ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ সদর-দরজায় কড়া-নাড়া শুনে গিয়ে দেখি, একটা অচেনা

লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার নাম কি রামহরি?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ।' সে বললে, 'বিমলবাবু তোমাকে ডাকছেন। শীগগির চলো।' সামনেই একখানা মোটর-গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, আমি আর দ্বিরুক্তি না-করে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। তারপর আমরা যখন গড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, তখন পাশ থেকে সেই লোকটা হঠাৎ লাঠি তুলে এমন জোরে আমার মাথার ওপর মারলে যে, আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। জ্ঞান হবার পর দেখলুম, সকাল হয়ে গেছে, আমি একটা গাছতলায় শুয়ে আছি, আর গুণ্ডারা গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে!'

কুমার চমৎকৃত স্বরে বললে, 'রামহরি, তুমি যা বললে তার কোন মানে হয় না। তোমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন ভাবে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্য কি?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবু! তারা কি পাগল, না আমার শত্রু?'

—'তারা যদি তোমার শত্রু হবে, তবে বিমল কোথায় গেল? সে এখনো ফেরেনি কেন?'

রামহরি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'অ্যাঁঃ, খোকাবাবু এখনো ফেরেনি? বল কি গো! তবে কি তারা চোর-ডাকাত? ফন্দি খাটিয়ে খোকাবাবু আর আমাকে পথ থেকে স'রিয়ে তারা কি এ-বাড়ির সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে?'

কুমার মাথা নেড়ে বললে, 'না, রামহরি, না! এ-বাড়িতে লুট করার মতো কোন সম্পত্তি থাকে না! এ-বাড়ির সব চেয়ে মূল্যবান নিধি হচ্ছে, বিমল নিজেই।—তাকেই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! নিশ্চয়ই এর মধ্যে অন্য কোন গূঢ় রহস্য আছে।'

হঠাৎ নিচে সদর-দরজার কাছ থেকে উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আরে, আরে! এ বাড়ি যে আমি চিনি! কি আশ্চর্য, এ যে বিমল-বাবুর বাড়ি! হুম্!'

কুমার তখনি বুঝতে পারলে, এ হচ্ছে পুলিস ইন্সপেক্টার সুন্দরবাবুর গলা! গত বৎসরে তাঁর সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি নিচে নামতে নামতেই দেখলে সুন্দরবাবু দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

—'একি, সুন্দরবাবু যে, নমস্কার! আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন!'

—'ঠিক সময় এসেছি মানে?'

—'কাল এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সুন্দরবাবু!'

—'হুম্, সেইজন্যেই তো আমি তদারক করতে এসেছি!'

—'তাহলে বিমলের খোঁজ আপনারা পেয়েছেন?'

—'হুম্! আমি বিমলবাবুর খোঁজ করবার জন্যে এখানে আসিনি! আমি এসেছি আপনাদের বাগানে চোরের পায়ের ছাপ খুঁজতে!'

—'আমাদের বাগানে? চোরের পায়ের ছাপ? কী বলছেন!'

—'কিচ্ছু ভুল বলিনি। জানেন, কাল রাতে জেরিণার কণ্ঠহার চুরি গিয়েছে? আগে তার দাম ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, কিন্তু এখন তাকে অমূল্য বলাও চলে!'

—'জেরিণার কণ্ঠহার? সে আবার কি?'

—'শুনুন তবে—রুশিয়ার সম্রাট্ আর সম্রাজ্ঞীকে জার আর জেরিণা বলে ডাকা হোত, জানেন তো? রুশিয়ার সম্রাজ্ঞীর গলায় ছিল একছড়া মহামূল্য হীরার হার। কিন্তু রুশিয়ার বিপ্লবের সময় জার আর জেরিণাকে যখন হত্যা করা হয়, তখন এই আশ্চর্য কণ্ঠহার কেমন করে রুশদেশের বাইরে গিয়ে পড়ে। বিজয়পুরের মহারাজা গেল বছরে ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে প্রকাশ্য নীলামে আধকোটি টাকা দিয়ে সেই হার কিনে আনেন।'

—'কিন্তু কোন নির্বোধ ধনী যদি আধকোটি টাকা খরচ করে কতকগুলো দুর্লভ, অকেজো কাঁচ কিনে বসেন, তার জন্যে আমাদের মাথা-ব্যথার দরকার কি?'

—'আ-হা-হা শুনুন না! দরকার আছে বৈকি! জেরিণার সেই কণ্ঠহার কাল রাতে চুরি গিয়েছে!'

—'আপদ গিয়েছে! এখন তা নিয়ে দুঃখ করবার সময় আমার নেই!'

—'অপনি বয়সে নবীন কিনা, তাই আসল কথা শোনবার আগেই অধীর হয়ে উঠছেন! কুমারবাবু, আপনি কি জানেন না, বিজয়-পুরের মহারাজা কলকাতায় এসে আপনাদেরই বাগানের পিছনকার মস্ত বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে বাস করছেন?'

—'তা আবার জানি না? রাজকীয় ধুমধামের চোটে এ-পাড়ার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে!'

—'বিজয়পুরের মহারাজা কাল মহারানীকে নিয়ে মোটরে করে কলকাতার বাইরে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাত্রিবেলায় ফেরবার সময়ে পথে হঠাৎ মোটরের কল বিগড়ে যায়। ফলে মোটরকে আবার কার্যক্ষম করে নিয়ে বাড়িতে আসতে তাঁদের অনেক রাত হয়। ইতিমধ্যে কখন যে মহারাজের শোবার ঘর থেকে জেরিণার কণ্ঠহার চুরি গিয়েছে, সে-কথা কেউ জানে না। আজ সকালে সেই চুরির কথা প্রকাশ পেয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মামলার কিনারা করবার জন্যে ডাক পড়েছে ছাই ফেলতে ভাঙা-কুলো এই সুন্দর চৌধুরীর! আমি এসে দেখলুম—'

—'আপনি এসে কি দেখলেন, তা জানবার আগ্রহ আমার একটুও নেই! আমি এখন—'

কুমারকে থামিয়ে দিয়ে সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'আপনি কথায় কথায় বড্ড বেশী বাধা দিচ্ছেন কুমারবাবু! আগে আমি কি বলি শুনুন, নইলে পথ ছেড়ে দিন, আমি এই বাড়ির ভিতরটা আর বাগানের চারিদিকটা একবার ভালো করে দেখে আসি!'

কুমার বিস্মিত স্বরে বললে, 'কেন?'

—'কারণ আমার মতন ঝানু ইন্সপেক্টারের চোখে ধুলো দেওয়া

সহজ নয়! আমি আবিষ্কার করেছি যে, চোরেরা এই বাড়ির পিছনকার বাগানের পাঁচিল টপ্‌কে মহারাজার বাড়িতে ঢুকে জেরিণার কণ্ঠহার চুরি করে আবার এই দিক দিয়েই ফিরে এসেছে! রাজবাড়ি থেকে আজ যখন আপনাদের বাগানটাকে দেখলুম তখন বুঝতে পারিনি যে, এটা বিমলবাবুর বাড়ি—কারণ এ-বাড়িতে এসে আমি অনেক চা, টোস্ট, ওম্‌লেট উড়িয়েছি বটে, কিন্তু কোনদিন ঐ বাগানটার দিকে যাইনি। কিন্তু বাড়ির সামনের দিকে এসেই বিমলবাবুর বাড়ি চিনতে পেরেছি। এখন আমি এই বাড়ির সর্বত্র খানাতল্লাস করতে চাই,—হুম্! কি করব বলুন, 'ডিউটি ইজ্ ডিউটি'!

প্রথমটা কুমারের মন রাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! আরক্ত মুখে সে কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা সত্য আবিষ্কার করে ফেলে নিজেকে সামলে নিলে এবং তারপরেই উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'বুঝেছি—বুঝেছি, এতক্ষণ পরে বুঝেছি! এই জন্যেই বিমল হয়েছে অদৃশ্য আর রামহরি হয়েছে আহত!'

সুন্দরবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'কুমারবাবু, আপনার এ-সব কথার অর্থ কি? কে অদৃশ্য, আর কে আহত হয়েছে?'

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, এতক্ষণ আমরা দুজনেই অন্ধকারে বাস করছিলুম, তাই কারুর কথা কেউ বুঝতে পারছিলুম না! এইবার আমি এসেছি অন্ধকার থেকে আলোকে!'

—'হুম্, তার মানে?'

—'আগে রামহরির গল্প শুনুন,—রামহরি, রামহরি!'

রামহরি ওপর থেকে নিচে নেমে এলো। তাকে দেখেই সুন্দরবাবু চমকে বলে উঠলেন, 'একি রামহরি, তোমার এমন মূর্তি কেন?'

রামহরি আবার তার গল্প বললে। সুন্দরবাবু সব শুনে মহাবিস্ময়ে বললেন, 'অ্যাঁঃ বলো কি? বিমলবাবু অদৃশ্য!'

কুমার বললে, 'কিন্তু বিমলের অদৃশ্য হওয়ার কারণ অনুমান করতে পারছেন?'

—'হুম্, এখনো আমি কারণ-টারণ অনুমান করবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আপনি কি অনুমান করেছেন?'

—'ভেবে দেখুন সুন্দরবাবু! একদল চোর যদি এই বাড়ির ভিতর দিয়ে বিজয়পুরের মহারাজার বাড়িতে ঢুকে চুরি করতে চায়, তাহলে তারা কি চুরির আগে বিমল আর রামহরিকে যে কোন কৌশলে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করবে না?'

সুন্দরবাবু বেজায় উৎসাহে লাফ মেরে বললেন, 'ঠিক ধরেছেন কুমারবাবু!...রামহরি, রামহরি! কাল বিকেলে যে-লোকটা বিমলবাবুকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, তার চেহারা কি রকম বলতে পারো?'

—'তা কেন পারব না? তার মতন ঢ্যাঙা আর লম্বা-চওড়া চেহারা আমি আর কখনো দেখিনি, বাবু! মুখে মস্ত গোঁফ-দাড়ি, কিন্তু তার গলার আওয়াজ ঠিক মেয়েমানুষের মতো! তার চেহারা দেখলে ভয় হয়, কিন্তু গলা শুনলে হাসি পায়।'

—'হুম্। রাত্রে যে তোমার কাছে এসেছিল, তাকে আবার দেখলে তুমি চিনতে পারবে?'

—'তা আবার পারব না, তাকে আর একবার দেখবার জন্যে আমার মন যে ব্যাকুল হয়ে আছে!'

—'আমরাও কম ব্যাকুল নই হে! আচ্ছা রামহরি, বিমলবাবু কোথায় যাচ্ছেন বেরুবার সময়ে সে-কথা তোমাকে বলে যাননি?'

—'না...তবে হ্যাঁ, একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে! আমি একবার ঘরের দরজার কাছদিয়ে যেতে যেতে শুনেছি বটে, খোকাবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে সেই গুণ্ডার মতন লোকটা বলছে—'আমি টালিগঞ্জের পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রীটে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছি।'

সুন্দরবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রীট! পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রীট! ঠিক শুনেছ রামহরি?'

—'হ্যাঁ গো বাবু, হ্যাঁ। আমি একবার যা শুনি তা আর কখনো ভুলি না।'

—'হুম্, তোমার এ অভ্যাসটি ভালো বলতে হবে। কুমারবাবু, এখন আমাদের কি কর্তব্য বলুন দেখি?'

—'পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রীটের দিকে সবেগে অগ্রসর হওয়া।'

—'ঠিক বলেছেন। এই আমি মহাবেগে অগ্রসর হলুম, হুম্।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবলার ছবি

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, এই যে মণিলাল বসু স্ট্রীট।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাব্বাঃ। কোন্ রসিক এই গলিটার নাম রেখেছে, স্ট্রীট! এটা শহরের রাস্তা, না জঙ্গলের পথ? এই সেপাইরা, হুঁশিয়ার! গলির ভেতর থেকে কারুকে বেরুতে দিও না, খবর্দার!'

পানায়-সবুজ পচা জলে ভরা পুকুরের পাশ দিয়ে, দু-ধার থেকে ঝুঁকে-পড়া বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে, নড়বড়ে কুঁড়েঘর আর ভাঙা ভাঙা ছোট ছোট বাড়ি আর ঝোপঝাপ জঙ্গল, আদ্যিকালের অশথ-বট-আম-কাঁঠাল গাছের ভিড়ের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথের সঙ্গে মোড়ের পর মোড় ফিরতে ফিরতে সদলবলে কুমার খানিকটা এগিয়েই দেখতে পেলে সেই মান্ধাতার আমলের প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানা। সকালবেলার সমুজ্জ্বল সূর্যকিরণে তার দীনতা ও জীর্ণতা যেন আরো ভালো করে ফুটে উঠেছে।

কুমার বললে, 'ঐখানাই পাঁচ নম্বরের বাড়ি বলে বোধ হচ্ছে।'

এগুতে এগুতে সুন্দরবাবু বললেন, 'ও বাড়ির আবার নম্বর আছে নাকি? ও তো মস্ত বড় ভাঙা ঢিপি!' কুমার বললে, 'না, না, এদিকে এসে দেখুন। এদিকটাতে দেওয়ালের গায়ে অশথ-বটরা রাজত্ব বিস্তার করতে পারেনি, চুন-বালির প্রলেপ ঠেলে বাড়ির কঙ্কালও বেরিয়ে পড়েনি। ঐ দেখুন, সদর-দরজায় একজন দরোয়ানও অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

কিন্তু দ্বারবানের সেই বিস্মিত ভাব স্থায়ী হল না। হঠাৎ সে উঠে

দাঁড়াল এবং তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বটে, বটে, হুম্। পুলিস দেখেই লোকটা যখন ভড়কে গেল, তখন বাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।'

কুমার দৌড়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখে বললে, 'এই তো পাঁচ নম্বরের বাড়ি!'

সুন্দরবাবু বেজায় জোরে দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে ডাকলেন, 'দরওয়ান। দরওয়ান। এই বেটা পাজীর পা-ঝাড়া।'

কেউ সাড়া দিলে না।

কুমার বললে, 'এত বড় বাড়ি ঘিরে ফেলবার মত লোক আমাদের সঙ্গে নেই। ওদিকে দরওয়ানটা বাড়ির ভেতরে গিয়ে এতক্ষণে খবর দিয়েছে, সময় পেলেই বদমাইসরা কোন্ দিক দিয়ে পালাবে, কে জানে? সুন্দরবাবু, আসবার সময়ে আপনি তো সার্চ-ওয়ারেন্ট বার করে এনেছেন, দরজাটা ভেঙে ফেলুন না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, তা ছাড়া আর উপায় নেই দেখছি।··· জমাদার, তোমরা সবাই মিলে দরজাটা লাথি মেরে ভেঙে ফেল তো।'

পাহারাওয়ালাদের দমাদ্দম লাথির আঘাত সেই পুরাতন দরজা বেশীক্ষণ সইতে পারলে না, তার ভিতরকার খিল গেল ভেঙে।

ভিতরে প্রবেশ করল সর্বাগ্রে কুমার, তারপর সুন্দরবাবু, তারপর জমাদার ও জনকয় পাহারাওয়ালা। সকলে উঠানের উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ঐ তো দেখছি ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। কিন্তু রোসো, আগে নিচের ঘরগুলোই খুঁজে দেখি। আরে আরে, ও কি ও?'

ডুম, ডুম, ডুম করে একটা শব্দ শোনা যেতে লাগল।

কুমার এক-ছুটে সিঁড়ির তলাকার সেই লোহার কীল মারা দরজাটার সুমুখে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু, ভেতর থেকে কে ওই দরজায় ধাক্কা মারছে!'

দ্বারের ওপাশ থেকে জাগল বিমলের সুপরিচিত কণ্ঠস্বর—'কুমার, কুমার ! আমি অন্ধকূপে বন্দী, আমাকে উদ্ধার কর বন্ধু !'

আনন্দে পাগলের মত হয়ে কুমার সেই বদ্ধ-দ্বারের উপর মারতে লাগল প্রচণ্ড লাথির পর লাথি !

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠাণ্ডা হোন্ কুমারবাবু, ঠাণ্ডা হোন্ ! হাতী লাথি মারলেও এ দরজা ভাঙবে কিনা, সন্দেহ। কিন্তু দরজা ভাঙবার দরকার কি ? দেখছেন না, ওপরে খালি শেকল লাগানো রয়েছে, তালা পর্যন্ত নেই ?'—বলেই তিনি শিকল খুলে দিলেন।

দরজা খুলে বিমল বাইরে আসতেই তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কুমার বলে উঠল, 'বিমল ! এত সহজে তোমাকে যে ফিরে পাব স্বপ্নেও তা ভাবতে পারিনি !'

বিমল শ্রান্ত স্বরে বললে, 'এতক্ষণ অন্ধকূপে বন্ধ থেকে হঠাৎ বাইরের আলোতে এসে কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না ! একটু সবুর কর ভাই, নিজেকে আগে সামলেনি !'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা এইখানেই থাকুন, ততক্ষণে আমি বাড়ির ভেতরটা খানাতল্লাশ করে আসি। জমাদার, সেপাইদের নিয়ে আমার সঙ্গে এস।'

পুলিসের দলবল সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। বিমল মিনিট-দুই চুপ করে থেকে বললে, 'এইবারে তোমার কথা বল, কুমার ! কেমন করে তোমরা জানতে পারলে আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি ?'

কুমার সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণনা করে বললে, 'এখন বল, তোমার মতন অসাধারণ লোককে এরা বন্দী করেছিল কোন্ কৌশলে ?'

বিমল তিক্তস্বরে বললে, 'ভাই, আমি অসাধারণ লোক নই, কারণ বন্দী হয়েছি তুচ্ছ একটা সাধারণ প্যাঁচে। এ ভাবে তুমি বন্দী হলে তোমাকে আমিও বোকা ছাড়া আর কিছু বলতে পারতুম না। রাম-হরি যে ঢ্যাঙা লম্বা-চওড়া তুশমন চেহারার লোকটার কথা বলছে, সে কেবল মহাশক্তিশালী নয়, মহাচতুরও বটে; সে জানে আমার

দুর্বলতা কোথায় আর সেই হিসাবেই আমাকে ধরবার ফাঁদ পেতেছিল। কিন্তু এতক্ষণ আকাশ-পাতাল ভেবেও আমি ঠাওরাতে পারিনি, আমাকে এ-ভাবে বন্দী করে তার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে! এখন তোমার মুখে সমস্ত শুনে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। তার নাম অবলাকান্ত, যদিও তার চেহারাটা হচ্ছে নামের মূর্তিমান প্রতিবাদ। আবার অবলার গলার আওয়াজেও পাবে তার চেহারার প্রতিবাদ। সে—' বলতে বলতে বিমলের দুই চোখ উঠল চমকে। সে স্পষ্ট দেখলে, উঠানের পশ্চিম দিকের রৌদ্রোজ্জ্বল দেওয়ালের উপরে পড়েছে একটা আবক্ষ নরমূর্তির কালো ছায়া।

অত্যন্ত আচম্বিতে বিমল উপর-পানে মুখ তুলে তাকালে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখলে, প্রকাণ্ড একখানা মুখ ছাদের কার্নিসের ধার থেকে সাঁৎ করে সরে গেল।

বিমল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কুমার, কুমার। ঐ সেই অবলাকান্ত। ছাদের ধার থেকে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল, কিন্তু বুঝতে পারেনি যে সূর্যদেব তাকে ধরিয়ে দেবেন। চল, চল, ওপরে চল।'

দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে তারা দুজনে দেখলে তেতলার সিঁড়ির মুখে পাহারাওয়ালাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুন্দরবাবু।

হতাশভাবে তিনি বললেন, 'কোথাও টুঁ-শব্দটি নেই, সব ব্যাটাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।'

বিমল বললে, 'আপনি তেতলায় এখনো ওঠেননি?'

—'হুম্, নিশ্চয় উঠেছি। তেতলায় তো মোটে দুখানা ঘর। কোন ঘরেই কেউ নেই, সব ভোঁ-ভোঁ।'

—'না সুন্দরবাবু, আমি এইমাত্র স্বচক্ষে দেখেছি, সেই পালের গোদা অবলাকান্ত তেতলার ছাদের ওপর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে।'

—'অবলাকান্ত আবার কে?'

—'যে আমাকে বন্দী করেছিল। আসুন আবার তেতলায়।' —বলেই বিমল তেতলার সিঁড়ি দিয়ে বেগে উপরে উঠতে লাগল।

তেতলার উত্তর দিকে তুখানা বড় ঘর, অন্য তিনদিকে খোলা ছাদ। কিন্তু ছাদে কেউ নেই।

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, লোকজন নিয়ে আপনি ঐ ঘর-তুখানার দিকে যান। এস কুমার, আগে আমরা ছাদটা দেখে আসি।'

কুমার বললে, 'ছাদ চোখের সামনেই পড়ে আছে, কোথাও একটা চড়াই পাখি পর্যন্ত নেই।'

—'কিন্তু ছাদের তলায় কি আছে সেটা দেখা দরকার—যদি ছাদ থেকে অদৃশ্য হবার কোন উপায় থাকে।'

ছাদের তলায় পূর্বদিকে রয়েছে প্রায়-তুর্ভেদ্য সবুজ জঙ্গল। আম, জাম, কাঁটাল, পেয়ারা, জামরুল, নোনা, ডুমুর, নারিকেল, সুপুরি ও খেজুর প্রভৃতি ফলগাছের বাহুল্য দেখে বোঝা যায় আগে সেখানটা ছিল বাগান। এখনো সেখানে বেঁচে রয়েছে অশোক, রঙ্গন, কৃষ্ণ-চূড়া, চাঁপা ও বকুল প্রভৃতি পুষ্পতরু। তাদের ভিতর থেকে সাড়া দিচ্ছে কোকিল, বউ-কথা-কও ও শ্যামা প্রভৃতি গীতকারী পাখির দল। ফলের ফসল আর নেই বললেও চলে, ফুলের বাসর ভেঙেছে, কিন্তু পাখিদের গানের আসর আজও বসে আগেকার মতই।

দক্ষিণদিকে খানিকটা ঝোপঝাপ-ভরা খোলা জমির পর মস্ত বড় একটা দিঘি। তার পানায় আচ্ছন্ন বুকের দিকে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করলে সন্দেহ হয়, সেটা যেন একটা তৃণশ্যামল মাঠ। তারপরেই দেখা যায় মাঝে মাঝে পানা ছিঁড়ে গেছে, রোদে জল চক্‌চক্ করছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, দলবদ্ধ শালুকফুলেরও বাহার।

পশ্চিমদিকে মণিলাল বসু লেন।

বিমল সব ভালো করে দেখে-শুনে বললে, 'না, ছাদের কোনদিক দিয়ে পালাবার কোন উপায় নেই। অবলাকান্তকে যদি পাওয়া যায়, উত্তরের ঐ তুটো ঘরের ভেতরেই পাওয়া যাবে। চল কুমার।'

তারা সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'বিমল-বাবু, আপনি ভুল দেখেছেন। এ দুটো ঘরেই কেউ নেই।'

—'তবু আমি একবার ঘর দুটো দেখব' বলে বিমল প্রথম যে ঘর-খানায় ঢুকল সেখানা একেবারেই খালি—এমন কি আসবাবের মধ্যে রয়েছে মাত্র দুখানা শীতলপাটি বিছানো চৌকি।

কিন্তু অন্য ঘরখানা খুব সাজানো! একদিকে একখানা দামী খাট, তার উপরে ধবধবে চাদরে ঢাকা নরম বিছানা। আর এক-দিকে সোফা-কোচ টেবিল। আর একদিকে একটি আলমারি ও ড্রেসিং-টেবিল এবং আর একদিকের দেওয়ালে রয়েছে খুব পুরু ফ্রেমে আঁটা একখানা 'অয়েল-কলারে' আঁকা প্রকাণ্ড ছবি, সেখানা প্রায় মেঝের উপরে এসে পড়েছে।

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, যে মহাপ্রভুকে আমরা খুঁজছি তার ছবির চেহারা দেখুন!'

সুন্দরবাবু ছবির দিকে খানিকক্ষণ বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'হুম্, অবলা দেখছি মহা বলবান ব্যক্তি! কিন্তু ছবিতে কি এর চেহারা বেশী বড় করে আঁকা হয়েছে?'

—'না, এখানা হচ্ছে অবলার 'লাইফ-সাইজে'র ছবি।'

—'ওরে বাবা, বলেন কি? অবলা কি মাথায় সাত ফুটের চেয়েও লম্বা?'

—'বোধহয় তাই।'

—'কিন্তু অবলাকে যখন পেলুম না, তখন তার ছবি নিয়ে আমাদের আর কি লাভ হবে? চলুন, যাই।'

—'আমি স্বচক্ষে তাকে ছাদের ওপর থেকে উঁকি মারতে দেখেছি। কিন্তু এখন সে ছাদেও নেই, এ-ঘরে ও-ঘরেও নেই। এটা যে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। অবলা কি ডানা মেলে উড়ে গেল?' বলতে বলতে বিমল ছবির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কি পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওকি বিমলবাবু, আপনি কি অবলাকে না পেয়ে তার ছবিখানাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চান ?'

বিমল খানিকক্ষণ জবাব দিলে না। তারপর কুমারের দিকে ফিরে বললে, 'দেখ তো কুমার, ছবির ওপরে ডানদিকের ঐখানটায় তাকিয়ে !···কি দেখছ ?' কুমার ভালো করে দেখে বললে, 'মাকড়সার একটা বড় ছেঁড়া জাল।'

—'জালটার খানিকটা রয়েছে দেওয়ালের ওপরে, আর খানিকটা রয়েছে ছবির ফ্রেমের ওপরে। জালটা নিশ্চয়ই সবে ছিঁড়েছে, কারণ মাকড়সাটা এখনো ব্যস্তভাবে তার জাল মেরামত করবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু জালটা ছিঁড়ল কেন ?'

সুন্দরবাবু বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কি বিপদ, হুম্ ? আসামী কোথায় চম্পট দিলে, আর আপনারা মাকড়সার জাল নিয়েই মেতে রইলেন যে ! আপনাদেরও স্বভাব দেখছি, আমাদের শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত ভায়ার মত !'

বিমল মুখ টিপে হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমি গোয়েন্দা নই। কিন্তু আপনি পুলিসের পাকা লোক হয়েও কি বুঝতে পারছেন না, অমন অস্থানে ছবির ফ্রেম থেকে দেওয়াল পর্যন্ত ছিল যে মাকড়সার জাল, সে-জাল সদ্য সদ্য ছিঁড়ে যাওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক ?'

—'কেন, সন্দেহজনক কেন ? আপনার কথার অর্থ কি ?'

—'আমার কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, বড় ছবিখানাকে এইমাত্র কেউ দেওয়ালের গা থেকে সরিয়েছিল।'

—'সরিয়েছিল তো সরিয়েছিল, তাতে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন ?'

—'আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়তো কিছুই নেই, তবে আমিও ছবিখানাকে আর একবার দেওয়ালের গা থেকে সরিয়ে ফেলতে চাই।' —বলেই বিমল ছবিখানাকে দুই হাতে তুলে ধরে দেওয়ালের উপর থেকে সরিয়ে ফেললে।

ঘরসুদ্ধ সবাই চমৎকৃত হয়ে দেখলে, ছবির পিছনেই দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একটা বন্ধ দরজা।

সুন্দরবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'হুম্। বাহাদুর বিমলবাবু।'

বিমল বললে, 'এর মধ্যে আমার বাহাদুরি একটুও নেই। অবলাকান্ত ভারী চালাক বটে, কিন্তু একটু আগে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সূর্যদেব, আর একটু পরে এখন তার পথ নির্দেশ করলে তুচ্ছ এক মাকড়সা। সুন্দরবাবু, এই বন্ধ দরজার পিছনে কি আছে জানি না, কিন্তু অবলাকান্ত অদৃশ্য হয়েছে এই পথেই।'

সুন্দরবাবু প্রায় গর্জন করেই বললেন, 'জমাদার। ডাকো সিপাইদের। ভাঙো এই দরজা।'

বিমল বললে, 'কিন্তু সবাই সাবধান। অবলাকান্ত খুব শান্ত নিরীহ বালক নয়!'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি

বিমল ও কুমার বার করলে রিভলবার। কনস্টেবলরা এগিয়ে গিয়ে জোরে লাথি মারতে লাগল দরজার উপর। দরজার পাল্লা-দুখানা দড়াম করে খুলে যেতে দেরি লাগল না।

হুড়মুড় করে সবাই খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে কেউ নেই। ছোট্ট এক ফালি ঘর—চওড়ায় চার হাত আর লম্বায় ছয় হাতের বেশী হবে না। একেবারে আসবাব-শূন্য।

এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে সুন্দরবাবু বললেন, 'কই মশাই, কোথায় আপনার অবলা? ফুস্-মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি?'

উত্তর-দিকের দেওয়ালে রয়েছে গরাদে-হীন একটা ছোট জানলা। বিমল সেই দিকে ছুটে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, জানলার বাইরে মস্ত একটা হুক থেকে ঝুলছে, মোটা একগাছা দড়ি। তারপর বুক পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখলে, দড়ির অন্য প্রান্ত প্রায় মাটি পর্যন্ত নেমে গেছে এবং তখনো লটপট করে খুব দুলছে।

দড়িগাছা খানিকটা টেনে তুলে সকলকে দেখিয়ে বিমল বললে, 'সুন্দরবাবু, অবলাকে আবার ভূতলে অবতীর্ণ করেছে এই দড়ি। এটা এখনো যখন দুলছে তখন বুঝতে হবে যে, মাটিতে পা দিয়ে অবলা এইমাত্র একে ত্যাগ করেছে।'

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গী করে বললেন, 'হুম্, এ যে একেবারে ডিটেকটিভ উপন্যাসের কাণ্ড! আমরা হচ্ছি সত্যিকারের পুলিস, এর মধ্যে পড়ে আমাদের মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে যে বাবা! এখন উপায়?'

কিন্তু বিমল তখন সুন্দরবাবুর কথা শুনছিল না। মুখ বাড়িয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিচের দিকটা পর্যবেক্ষণ করছিল।

এদিক থেকেই এই পাঁচ নম্বরের বাড়ির বিশাল ধ্বংসস্তূপের আরম্ভ। নিচে সামনেই রয়েছে একটা মহলের উঠান, এক সময়ে তার দুই ধারে ছিল সারি সারি ঘর ও টানা বারান্দা, এখন কিন্তু বেশীর ভাগই হয়েছে ভূমিসাৎ। উঠানের উপরে রাশি রাশি ইটের ঢিপি, মাঝে মাঝে বুনো চারাগাছ এবং মাঝে মাঝে গর্ত। দুদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল, এখনো তারই জল জমে রয়েছে গর্তগুলোর ভিতরে।

বিমল হঠাৎ জানলার ফাঁকে নিজের দেহটা গলিয়ে দিতে দিতে বললে, 'কুমার, তুমিও আমার সঙ্গে এস এই পথে।'

সুন্দরবাবু হাঁ-হাঁ করে বলে উঠলেন, 'আরে মশাই, করেন কি, করেন কি! পড়লে বাঁচবেন না যে।'

—'পড়লে যে মানুষ বাঁচে না, আমিও সে-কথা জানি সুন্দরবাবু। কিন্তু না-পড়বার জন্যে আমি কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করব না। এখন আমার জন্যে মাথা না ঘামিয়ে আপনি সিঁড়ি দিয়েই নিচে নেমে যান। তারপর অন্য পথে বাড়ির ঐ ভাঙা অংশটায় ঢুকে পড়তে পারেন কিনা দেখুন।' বলেই বিমল বাইরে গিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল।

সুন্দরবাবু দৌড়ে জানলায় গিয়ে বিস্মিত চোখে দেখলেন, বিমল অত্যন্ত অনায়াসে তড়বড় করে দড়ি ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে। তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'বাপ্ রে বাপ্। সিঁড়ির চওড়া ধাপ দিয়েও আমরা এর চেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নামতে পারতুম না! কুমারবাবু, আপনার বন্ধুর উচিত সার্কাসে যোগ দেওয়া।'

রজ্জুর শেষ-প্রান্তে পৌঁছে বিমল মাথা নামিয়ে দেখলে, তার পা থেকে মাটি রয়েছে হাত-তিনেক তফাতে। রজ্জু ত্যাগ করতেই সে পড়ল গিয়ে ইঞ্চি-দুয়েক জল-ভরা জমির উপরে।

সেইখানেই দাঁড়িয়ে সে ঊর্ধ্বমুখে অপেক্ষা করতে লাগল, কারণ-কুমারও করেছে তখন রজ্জুকে অবলম্বন।

অল্পক্ষণ পরেই কুমার হল ভূমিষ্ঠ।

উপর থেকে জাগল সুন্দরবাবুর চীৎকার—'ঐখানেই দাঁড়ান আপনারা, আমি এখুনি নেমে ছুটে যাচ্ছি।'

বিমল বললে, 'সুন্দরবাবুর ভুঁড়ি কতক্ষণে এখানে এসে পড়তে পারবে, কেউ তা জানে না। তবু তাঁর দলবলের জন্যে বাধ্য হয়ে আমাদের খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবেই—কারণ এটা হচ্ছে শত্রুপুরী, সঙ্গে যত-বেশী লোক থাকে ততই ভালো। কিন্তু আপাতত পদযুগল চালনা করতে না পারলেও আমরা মস্তিষ্ক চালনা করতে পারব। অতএব এস কুমার, আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই 'ব্লাড-হাউণ্ডে'র কাজ আরম্ভ করে দি।'

কুমার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বললে, 'সব দিকেই তো দেখছি ভেঙে-পড়া দেওয়াল, বড় বড় রাবিশের স্তূপ, ঝোপঝাপ আর এলো-মেলো অলি-গলি। খুব সহজেই এখানে লুকোনো বা এখান থেকে পালানো যায়। এখন কোন্‌দিকে আমরা অগ্রসর হবো, বিমল?'

বিমল বললে, 'কুমার, তুমিও সাধারণ পুলিস—অর্থাৎ সুন্দরবাবুর মতন হয়ো না। ভগবান তোমাকে অনুভূতি দিয়েছেন, অনুভব কর। দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, ব্যবহার কর।'

কুমার বললে, 'দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করেই তো দেখছি, চারিদিকে ভগ্নস্তূপ। আর অনুভূতি? হুঁ, অনুভব করছি বটে, আমার পায়ের তলায় রয়েছে জল আর কাদা।'

—'কিন্তু ভাই কুমার, তুমি অনুভব করছ অন্ধের মত। আর ব্যবহার করছ কেবল স্থূলদৃষ্টি। বড় বড় স্পষ্ট জিনিস দেখে অপরাধী আর সাধারণ পুলিস সহজে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারে। পাছে বড় বড় সূত্র পিছনে ফেলে যায়, সেই ভয়ে অপরাধীও স্পষ্ট প্রমাণ-গুলোকে নষ্ট করতে ব্যস্ত হয়। আর সাধারণ পুলিসও খোঁজে কেবল

অমনি সব বড় ও স্পষ্ট সূত্রকে। ফলে সূক্ষ্ম বা ছোট প্রমাণগুলো ফাঁকি দেয় দুই পক্ষেরই চোখকে। তুচ্ছ মাকড়সার জাল, অবলা তাই তাকে আমলে আনেনি। সুন্দরবাবুর চোখেও তা যথাসময়ে পড়েনি, পড়লে হয়তো অবলা পালাতে পারত না। আর বর্তমান ক্ষেত্রে জল-কাদার উপরে দাঁড়িয়ে থেকেও তুমি চোখ ব্যবহার করে দেখছ না যে, এর জের কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে!···কুমার, কুমার! কে যেন চাপা হাসি হাসলে বলে মনে হল না?'

—'চাপা হাসি? কৈ, আমি শুনি নি তো। বোধ হয় তোমার ভ্রম!'

'ভ্রম? হতেও পারে। কিন্তু আমি যেন কার চাপা হাসির আওয়াজ পেলুম।'

—'ও কিছু নয়! তুমি যা বলছিলে বল। এই জল-কাদার জের কোন্‌খানে গিয়ে পৌঁছবে?'

—'ঐখানে কুমার, ঐখানে!' বলেই বিমল হাত-ছয়েক তফাতে মাটির উপরে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

কুমার দেখলে, উঠানের যেখানে জল নেই সেখান থেকে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে অনেকগুলো ভিজে পায়ের ছাপ। নিশ্চয় এইমাত্র কেউ এই রজ্জু-অবলম্বন ত্যাগ করে সরে পড়েছে ঐদিকেই, সুতরাং তার অনুসরণ করাও কঠিন হবে না।

কুমার বললে, 'ওঃ, তাই বল? এতক্ষণে বুঝলুম।'

বিমল বললে, 'কিন্তু ঐটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল আগেই। দড়ি ছেড়ে যখন আমি অবতীর্ণ হলুম ভূতলে, যখনি আমার পায়ের তলায় অনুভব করলুম জল-কাদাকে, সেই মুহূর্তেই আমার মন বললে, —'অবলা কোন্‌দিকে গিয়েছে তা জানা আর কঠিন হবে না। কারণ তাকেও যখন নামতে হয়েছে এই জল-কাদায়, তখন ধরিত্রীর গায়ে পায়ের ছবি না এঁকে কোনদিকেই সে আর পালাতে পারবে না।' মনে-মনে মনের কথা শুনেই ফিরে দেখলুম, সত্যই তাই। ফিরে না

দেখলেও চলত, কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই আছে, চোখে দেখবার আগেই যাদের বলা যায় অবশ্যম্ভাবী !'

কুমার হেসে ফেলে বললে, 'আমি হার মানছি। তুমি তো জানোই ভাই বিমল, যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি ততক্ষণ আমি নিজের মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়িয়ে আর নিজের বুদ্ধিকে মনের কৌটোয় বন্দী করে রাখি। আমার নিজের অস্তিত্ব কেবল প্রকাশ পায় তোমার অসাক্ষাতেই —যেমন পেয়েছিল আজ সকালে, তোমাকে দেখতে না পেয়ে।'

বিমল হেসে সস্নেহে কুমারের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, 'জানি বন্ধু, জানি,—তোমাকে জানতে আমার বাকি নেই। তখন তোমার নিজের অস্তিত্ব জেগেছিল বলেই এত শীঘ্র আমি মুক্তি পেয়েছি।··· কিন্তু চোর পালাবার পর আমাদের বুদ্ধি নিয়ে কি করব? সুন্দরবাবু হচ্ছেন জড়ভরত দি সেকেণ্ড, এখনো তাঁর আবির্ভাব হল না, আমাদের আর অপেক্ষা করা চলে না। চল কুমার, অগ্রসর হই। তোমার রিভলবারটা বার করে হাতে নাও।'

কর্দমাক্ত পদচিহ্ন উঠান পার হয়ে উত্তর দিকের একটা ছাদ-ভাঙা দালানের উপরে গিয়ে উঠেছে। তারপর একটু ডানদিকে এগিয়েই বাঁ-দিকে ফিরে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকেছে।

পদচিহ্নের অনুসরণ করে বিমল ও কুমার সে-ঘরের ভিতর দিয়ে ঢুকল আর এক ঘরে। তারপর পদচিহ্ন এমন ক্ষীণ হয়ে গেল যে আর দেখা যায় না।

বিমল চারিদিকে তাকিয়ে বললে, 'কুমার, পদচিহ্নের আয়ু তো ফুরিয়ে গেল। কিন্তু সে যতটুকু পথ নির্দেশ করেছে আমাদের পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট। কারণ আমরা বেশ বুঝতে পারছি, প্রথমত, একটু আগে অবলা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয়ত, এ-ঘর থেকে ভিতর দিকে যাবার জন্যে রয়েছে একটিমাত্র দরজা। অবলা এখান থেকে যে-পথে এসেছে সেই পথেই আবার বেরিয়ে যায়নি নিশ্চয়। সুতরাং আমাদের যাত্রা করতে হবে ভিতর দিকেই।'

তারা এবার যে ঘরে ঢুকল তার ছাদ, দেওয়াল ও দরজা জানলা সব অটুট বটে, কিন্তু ভিতরে বাসা বেঁধেছে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিমল ও কুমার সেখান থেকে বেরুবার পথ খুঁজছে, এমন সময় হঠাৎ তাদের পিছনে হল দুম্ করে দরজা বন্ধ করার শব্দ।—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হিংস্র অন্ধকার যেন সেখানকার ম্লান আলোটুকুকে গপ্ করে একেবারে গিলে ফেললে।

বিমল তাড়াতাড়ি ফিরে একলাফে ঘরের বন্ধ-দরজার উপরে গিয়ে পড়ল।

দরজার ওপাশ থেকে জাগল আবার সেই পরিচিত নারী-কণ্ঠস্বর—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বিমল, আবার তুমি আমার বন্দী!'

দারুণ ক্রোধে ও নিষ্ফল আক্রোশে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বিমল প্রায় অবরুদ্ধ-স্বরে বললে, 'কুমার, কুমার। ধিক আমার নির্বুদ্ধিতা! বিপদের রাজ্যে এসেও বিপদের দিকে নজর রাখিনি!'

বাহির থেকে অবলা আবার খুব খানিকটা হেসে নিলে। তারপর তীক্ষ্ণ খন্‌খনে স্বরে বললে, 'ওহে বিমল। এই তোমার বুদ্ধি? এই বুদ্ধি ভাঙিয়ে তুমি দেশ-বিদেশে এত বিখ্যাত হয়ে পড়েছ? একটা নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত এক ফাঁদে দুবার ধরা পড়ে না—তুমি যে দেখছি নেংটি ইঁদুরেরও চেয়ে অধম। একটু আগে তুমিই আবার মস্ত মুরুব্বীর মতন অনুভূতি আর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে কুমারকে যে মস্ত লেকচার দিচ্ছিলে, তাও আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছি। শুনে আমি হাসি চাপতে পারিনি আর সে হাসির আওয়াজ পেয়েও তুমি সাবধান হওনি। ওহে নাবালক, সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি কেবল তোমারি একচেটে, না? জানো মূর্খ, মাটির ওপরে যে আমার কাদা-মাখা পায়ের ছাপ পড়ছিল, আমারও তা অজানা ছিল না! ইচ্ছা করলেই আমি পায়ের ছাপগুলো মুছে তোমাকে ধাঁধায় ফেলে পালাতে পারতুম। কিন্তু তা আমি করিনি। কেন জানো? তোমার বুদ্ধি নেংটি ইঁদুরেরও চেয়ে মোটা বলে। আমি বেশ জানতুম, পায়ের দাগগুলো দেখেই তুমি

আহ্লাদে আটখানা হয়ে ধেই-ধেই করে নেচে উঠবে! তাই আমি মাটির গায়ে পায়ের ছবি আঁকতে আঁকতে এমন জায়গায় এসে অদৃশ্য হয়েছি, যেখানে আমার পক্ষে তোমাকে ফাঁদে ফেলা হবে খুবই সহজ! বুঝলে বোকাচন্দ্র? ঘুমোও এখন অন্ধকারে, নাকে সর্ষের তেল দিয়ে!'

অতিরিক্ত রাগে ফুলতে ফুলতে বিমল আর কোন কথাই বলতে পারলে না। কিন্তু কুমার চেঁচিয়ে বললে, 'ওরে হতভাগা চোর! আমাদের তুই বন্দী করবি? এতক্ষণে বাড়ির ভেতরে পুলিস এসে পড়েছে, তা জানিস?'

অবলা আবার হেসে উঠে বললে, 'পুলিস, না ফুলিস্? ঐ ভুঁদো হাঁদা-গঙ্গারাম সুন্দরবাবুকে আমি চিনি না নাকি? সে আমার কি করতে পারে? জানো কি বাপু, এই সাতমহলা সেকেলে বাড়িখানা ভাঙাচোরা বটে, কিন্তু মস্ত এক গোলকধাঁধার মত? ঠিক এই জায়গাটিতে আসতে আসল পুলিসের এখন একটা দিন লাগতেও পারে! ভেবো না, আমাদের আনাগোনার সাক্ষী হয়ে পায়ের ছাপগুলো এখনো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে! আমার লোকজনেরা সেগুলোকে এখন কেবল নিশ্চিহ্নই করে দিচ্ছে না, পুলিসকে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্যে উল্টোদিকে নতুন নতুন পদচিহ্নও রেখে এসেছে! অতএব হে বিমল, হে নেংটি-ইঁদুরাধম! আপাতত আমি বিদায় গ্রহণ করছি! হ্যাঁ, আর একটা কথা শুনে রাখো। ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে মিছে গলা ভেঙো না, কারণ তোমাদের চিৎকার বাইরে গিয়ে পৌঁছবে না!'

বিমল তখন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে নিয়েছে যে, এ-ঘরের দরজাটা রীতিমত পুরাতন। কাল সে যেখানে বন্দী হয়েছিল সেখানকার মতন এ-দরজাটাও মজবুত ও লোহার কীল মারা নয়। অবশ্য সাধারণ লোকের পক্ষে এ-দরজাও যথেষ্ট দুর্ভেদ্য, কিন্তু অবলা বোধহয় তার প্রায়-অমানুষিক শক্তির সঙ্গে পরিচিত নয়! আর সেই

শক্তি এখন প্রচণ্ড ক্রোধে হয়ে উঠেছে ভয়ানক মারাত্মক! বিমল জীবনে আর কখনো এত অপমান বোধ করেনি!

অবলার কথা যখন শেষ হয়নি, বিমল পিছনে হটে গিয়ে নিজের দেহের মাংসপেশীগুলোকে দ্বিগুণ ফুলিয়ে তুললে! তারপর বেগে ছুটে গিয়ে নিজের সমস্ত শক্তি একত্র করে প্রাণপণে দরজার উপরে মারলে এক বিষম ধাক্কা! মড়্-মড়্ শব্দে দরজার পাল্লা ভেঙে পড়ল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব লুকোচুরি খেলা

ভাঙা দরজার ভিতর থেকে বিমল বাইরে লাফিয়ে পড়ল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো !

বেরিয়েই দেখতে পেলে একচক্ষু অবলার দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মস্ত বড়ো মুখখানা—ক্ষণিকের জন্যে। এবং সেই এক পলকের মধ্যেই বিমল এও লক্ষ্য করলে, অবলার মুখে ফুটে উঠেছে বিপুল বিস্ময়ের চিহ্ন—নিশ্চয়ই দরজা ভেঙে তার এমন অতর্কিত আবির্ভাব সে একেবারেই আশা করেনি !

কিন্তু পর মুহূর্তেই অবলার প্রকাণ্ড মূর্তিখানা সে-ঘরের ভিতর থেকে সাঁত করে সরে গেল।

মহা ক্রোধে জ্ঞানশূন্যের মতন বিমল বেগে অগ্রসর হতে গিয়ে হঠাৎ সে-ঘরের দরজার চৌকাঠে ঠোক্কর খেয়ে দড়াম্ করে মাটির উপরে পড়ে গেল ! তার দেহ আর পাঁচজনের মতন ছোট ও হালকা ছিল না, আঘাতটা হলো রীতিমত গুরুতরই।

কুমার তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাকে তুলে ধরে বললে, 'বিমল, বিমল ! কোথায় লাগলো ?'

নিজেকে তখনি সামলে নিয়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বিমল বললে, 'না, না, আমার কিছু লাগেনি ! চলো, চলো—অবলা বুঝি আবার পালালো !'

ছুটে দুজনেই আর একটা শূন্যঘর পেরিয়ে আবার সেই ছাদ-ভাঙা দালানের উপরে এসে পড়ল। উঠানের উপরে কেউ নেই। কিন্তু ভাঙা দালান দিয়ে খানিক ছুটেই পাওয়া গেল একটা সরু লম্বা পথ—দু-ধারেই তার সারি সারি কয়েকখানা ঘর।

বিমল বললে, 'কুমার, তুমি ও-ধারের ঘরগুলো খোঁজো, আমি খুঁজি এ-ধারের ঘরগুলো !'

প্রথম ঘরটায় উঁকি মেরে বিমল দেখলে, কেউ নেই। আসবাব-হীন ঘুপ্‌সী ঘর—দেখলেই বোঝা যায়, বহুকাল তার মধ্যে কেউ বাস করেনি—এককোণে পড়ে রয়েছে কেবল একটা বড়ো কুপো।

দু-ধারে পাঁচখানা করে ঘর ছিল—সব ঘরই দুর্দশাগ্রস্ত, বাসের অযোগ্য। কোন ঘরেই অবলাকে পাওয়া গেল না।

শেষ-ঘর ও গলির পরেই তারা দু-জনে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানেও আর একটা ছোট্ট উঠানের মতো আছে বটে, কিন্তু তার সমস্তটাই ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ। সেই পুঞ্জীভূত ইষ্টকের রাশি ও রাবিশের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে নানান রকম আগাছার চারা। সেখান দিয়ে কারুর পক্ষে পালানো অসম্ভব এবং সেখানে সাপ টিক্‌-টিকি ছাড়া কোন বড়ো জীবেরই লুকোবার উপায় নেই।

বিমল হতাশভাবে বললে, 'ফিরে চলো কুমার, আজ আমাদের কপাল খারাপ !'

কুমার বললে, 'উঃ, রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে ! হতভাগাকে যদি একবার ধরতে পারতুম !'

—'ধরতে তাকে নিশ্চয়ই পারতুম, হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গিয়েই তো সব আমি মাটি করলুম। কিন্তু সে গেল কোন্‌দিকে ?···কুমার, কাছেই দুম করে কি একটা শব্দ হলো না ?'

—'হ্যাঁ, বিমল, আমিও শব্দটা শুনেছি! কি যেন একটা পড়ে গেল !'

—'শব্দটা এসেছে এই গলির দিক থেকেই', বলেই বিমল দৌড়ে আবার সেইদিকে গেল।

কিন্তু গলির ভিতরে কেউ নেই। তারা দু-জনে আবার তাড়াতাড়ি দু-দিকের ঘরে উঁকি মারতে মারতে এগিয়ে চলল।

গলির প্রান্তে এসে শেষ-ঘরে উঁকি মেরে বিমল চকিত স্বরে বললে, 'এ কি !'

—'কি বিমল ?'

—'কুপোটা দেখে গিয়েছিলুম ঘরের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে, কিন্তু এখন দেখছি সেটা মেঝের উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে !···কুমার, অবলা ঠিক কথাই বলেছে—আমি হচ্ছি একটি আস্ত গাধা। শতধিক আমাকে, হাতে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিলুম !'

কুমার ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, 'তাহলে সে কি ঐ কুপোর ভিতরে ঢুকে বসেছিল ?'

—'কুপোর ভিতরে কি তার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু একটু আগে সে নিশ্চয়ই ছিল এই ঘরে ! হঠাৎ নিজে নিজেই জ্যান্ত হয়ে ঘরময় গড়াগড়ি দিতে পারে, এমন আশ্চর্য কুপোর কাহিনী পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি ! কুপোটাকে কেউ ফেলে দিয়েছে, আর অবলা ছাড়া সে অন্য কেউ নয়।'

—'কিন্তু সে—'

কুমারের মুখের কথা মুখেই রইল, খানিক দূর থেকে হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে বিষম আর্তনাদ উঠল—'বাবা রে, মরে গেছি রে, সেপাই ! সেপাই !'

—'শীগগির এস কুমার, শীগগির ! এ যে সুন্দরবাবুর গলা !'

তারা দ্রুতপদে আবার আগেকার উঠানে এসে পড়ল।

কুমার বললে, 'উঠোনে তো কেউ নেই ! সুন্দরবাবু কোথা থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন ?'

—'সেপাই, সেপাই ! জল্‌দি আও—হামকো মার ডালা !'

বিমল একদিকে ছুটতে ছুটতে বললে, 'সুন্দরবাবু চ্যাচাচ্ছেন, বাগান থেকে। এই যে, ওদিকে যাবার পথ !'

ধ্বংসস্তূপের মাঝখান দিয়ে বুনো গাছের জঙ্গল মাড়িয়ে বিমল ও কুমার উঠান থেকে বেরিয়েই দেখলে, একটা বটগাছের তলায় মাটির উপরে ভুঁড়ি ফুলিয়ে চিত হয়ে পড়ে সুন্দরবাবু ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মতো

ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়ছেন এবং বাগানের নানা দিক থেকে ছুটে আসছে সাত-আটজন পাহারাওয়ালা !

বিমল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হয়েছে সুন্দরবাবু ? অত চ্যাচালেন কেন ? এত হাত-পা ছুঁড়ছেন কেন ?'

কুমার তাঁকে দু-তিনবার চেষ্টার-পর টেনে তুলে বসালে।

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'চ্যাঁচাব না ? হাত-পা ছুঁড়ব না ? বলেন কি মশাই ? হুম্, আমি পেটে খেয়েছি ভয়ানক এক ঘুষি, গালে খেয়েছি বিষম এক চড়। আমার দম বেরিয়ে গেছে, আমি চক্ষে সর্ষে-ফুল দেখছি !'

—'কে আপনাকে ঘুষি-চড় মারলে ? ভালো করে খুলে বলুন।'

—'দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান ! ভালো করে খুলে বলবার আগে ভালো করে হাঁপ ছেড়েনি।···হ্যাঁ, শুনুন এইবার ! আপনারা তো দিব্যি দড়ি বেয়ে 'সর্ট-কাট্' করে ফেললেন, কিন্তু আপনাদের খোঁজে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে দস্তুরমত সাত-ঘাটের জল খেয়ে ! বাবা রে বাবা, এটা কি বাড়ি না গোলকধাঁধা ? আমি—'

বিমল বিরক্ত স্বরে বাধা দিয়ে বললে, 'অত ব্যাখ্যা শোনবার সময় নেই ! কে আপনাকে মেরেছে তাই বলুন ! সে কোথায় গেল ?'

—'আরে মশাই, রাগ করেন কেন ? কে আমাকে মেরেছে আমি কি ছাই তাকে চিনি ? সে কোথায় গেল তা দেখবার সময় কি আমি পেয়েছি ? আমি দেখেছি খালি সর্ষে-ফুল। আসামীকে খোঁজবার জন্যে সেপাইদের এদিক-ওদিকে পাঠিয়ে আমি নিজে এলুম এইদিকে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা দৈত্যের মত লোক ছুটে এসে আমার পেটে মারলে গুম্ করে ঘুষি আর গালে মারলে ঠাস্ করে চড়—সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে আমি ধড়াম্ করে পড়ে গেলুম !'

—'দৈত্যের মত লোক ? তাহলে নিশ্চয় সে অবলাকান্ত !'

—'হুম্ অবলাকান্ত ? কখখনো তার নাম অবলাকান্ত নয়—

তাহলে প্রবলাকান্ত বলব কাকে ?···আরে, আরে—ঐ দেখুন মশাই, ঐ দেখুন ! ও বাবা, বেটা এতক্ষণ ঐ ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে ছিল নাকি ? এই সেপাই, সেপাই ! পাকড়ো, আসামী ভাগতা হ্যায় ।'

হ্যাঁ, অবলাই বটে ! ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়েই সে আবার বাগান ছেড়ে ছুটলো ভাঙাবাড়ির ভিতর দিকে এবং তার অনুসরণ করতে বিমল ও কুমার একটুও দেরি করলে না—যদিও তারা ছিল অনেকটা পিছিয়ে !

আবার সেই পোড়ো উঠান ! বিমল ভিতরে ঢুকেই দেখলে, খানিক আগে সে যে দড়ি ধরে উঠানে নেমেছে সেই দড়ি অবলম্বন করেই অবলা আবার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে ! অত বড়ো দেহে ক্ষিপ্রতা সত্যসত্যই বিস্ময়জনক !

বিমল বেগে ছুটে গিয়ে নীচে থেকে দড়ি ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান মারতে মারতে চিৎকার করে বললে, 'একটা রিভলবার ! একটা রিভলবার ! কার কাছে একটা রিভলবার আছে ? সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু !'

পাহারাওয়ালারা সবাই এসে পড়ল, কিন্তু তাদের কারুর কাছেই রিভলবার ছিল না ! কুমার আর কিছু না পেয়ে ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে লাগল। সুন্দরবাবু যখন হাঁসফাঁস করতে করতে আবির্ভূত হয়ে রিভলবার বার করলেন, অবলা তখন তেতলার জানলার আড়ালে হয়েছে অন্তর্হিত !

বিমল তিক্তস্বরে বললে, 'নাঃ, আর পারা যায় না, এই একঘেয়ে লুকোচুরি খেলা আজকেই শেষ করতে হবে ! অবলা আবার তার গর্তে ঢুকলো ! সুন্দরবাবু, পাঁচ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রীটের সদর দরজায় পাহারাওয়ালা আছে তো ?'

—'আছে বৈকি, দু-জন ।'

—'আচ্ছা, আপনি বাকী পাহারাওয়ালাদের নিয়ে আবার পাঁচ নম্বরকে আক্রমণ করুন-গে যান !'

—'হুম, আচ্ছা ধড়িবাজ আসামীর পাল্লায় পড়েছি রে বাবা, প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল !'

—'যান, যান—দেরি করবেন না !'

—'আপনারা ?'

—'আমরা আক্রমণ করব এইদিক দিয়ে, নইলে অবলা আবার পালাতে পারে'—বলেই বিমল দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলে !

সুন্দরবাবু পাহারাওয়ালাদের নিয়ে অদৃশ্য হলেন। কুমার নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিমল রজ্জুপথে যখন দোতলা পার হয়েছে তখন হঠাৎ জাগল সেই খন্‌খনে গলায় মেয়েলী হাসি ! সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—'ওরে হাঁদারাম বিমল, আর তোর রক্ষে নেই—মর্, মর্, মর্ !—'

কুমার সভয়ে দেখলে, তেতলার জানলার ভিতর থেকে সড়াৎ করে একখানা হাত বেরিয়ে ধারালো ভোজালি দিয়ে বিমলের অবলম্বন-রজ্জুর উপরে আঘাত করলে একবার, দুইবার, তিনবার !

—এবং দড়িটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গেই যেন দপ্ করে নিবে গেল কুমারের চোখের আলো !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কচুরির দুর্ভাগ্য

চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার নিয়ে কুমার যখন দাঁড়িয়ে রয়েছে আচ্ছন্নের মত, তখন হঠাৎ ওপর থেকে শোনা গেল আবার সেই চিরপরিচিত, নির্ভীক, আনন্দময় কণ্ঠের উচ্চ হাস্যধ্বনি !

বিমল হাসছে !

কুমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না, কারণ সেই মুহূর্তেই তার দুই কান প্রস্তুত হয়েছিল একটা গুরুভার দেহের বিষম পতনধ্বনি শোনবার জন্যে !

অন্ধকারের আবরণের ভিতর থেকে নিজের চোখ দুটোকে প্রাণপণে মুক্ত করে নিয়ে কুমার প্রথমে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলে।—সেখানে ভোজালি দিয়ে কাটা দড়িগাছা পড়ে আছে বটে, কিন্তু কোন যন্ত্রণাকর দৃশ্যের বা মানুষের রক্তাক্ত দেহের অস্তিত্ব নেই, আকস্মিক পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে পরমুহূর্তেই উপর-পানে চোখ তুলে সে দেখলে, একটা বৃষ্টির জল বেরুবার লোহার মোটা নল ধরে তার বন্ধু বিমল নীচের দিকে নেমে আসছে ! তাহলে তার কান ভুল শোনেনি—দুরাত্মা শত্রু এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুকে উপহাস করে এইমাত্র হেসে উঠেছিল তার বন্ধুই ?

বিপুল আনন্দে চিৎকার করে কুমার ডেকে উঠল, 'বিমল, ভাই বিমল !'

বিমল নামতে নামতে বললে, 'ভয় নেই কুমার, আমার-আয়ু এখনো ফুরোয়নি।'

কুমার আরো উপর দিকে তাকিয়ে দেখলে। তেতলার জানলা

থেকে অবলা এবং তার ভোজালি অদৃশ্য হয়েছে, ঝুলছে খালি কাটা দড়ির খানিকটা। তেতলার ছাদ থেকে জল বেরুবার পাইপটা জানলার পাশ দিয়ে দেয়াল বয়ে নেমে এসেছে প্রায় ভূমিতল পর্যন্ত। এটা কুমার বরাবরই দেখে এসেছে, যত বড় বিপদ যত অকস্মাৎই দেখা দিক্, বিমল উপস্থিত বুদ্ধি হারায় না কখনো। অবলার অস্ত্রাঘাতে দড়ি ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বা ঠিক তার পূর্ব-মুহূর্তেই বিমল খপ্ করে হাত বাড়িয়ে তার পাশের পাইপটা চেপে ধরে খুব সহজেই আত্মরক্ষা করেছে।

নল ত্যাগ করে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে বিমল হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে, 'ভাই কুমার, মৃত্যু আমাকে গ্রহণ করলে না। বোধহয় এত সহজে মরবার জন্যে ভগবান আমাকে সৃষ্টি করেননি।'

কুমার বললে, 'কিন্তু পাইপটা ওখানে না থাকলে কি যে হোত, তাই ভেবেই আমার গা এখনো শিউরে উঠছে। বিমল, তুমি আজ বেঁচে গেছো দৈবগতিকে।'

বিমল বললে, 'বন্ধু, পাইপটা না পেলেও আমি বোধহয় মরতুম না। দড়ি ছেঁড়বার আগেই দড়ি ছেড়ে দোতলার কার্নিশ ধরে ঝুলতে পারতুম। আর দৈবের কথা বলছ? দৈবের সুযোগ তারাই নিতে পারে, বুদ্ধি যাদের অন্ধ নয় আর সাহস যাদের সর্বদাই সজাগ। দেখ, অবলা যে দুরাত্মা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র সাহসী আর বুদ্ধিমান বলেই বারবার বেঁচে যাচ্ছে সে দৈবের মহিমায়।··· যাক্, এখন আর এ-সব আলোচনার সময় নেই। তুমি এখন এক কাজ কর কুমার। দৌড়ে এই বাড়ির সদর দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখগে যাও, সুন্দরবাবুরা অবলাকে ধরতে পারলেন কিনা। যে-জানলা দিয়ে অবলা তেতলার ঘরে ঢুকেছে, ঐ জানলা থেকেই তুমি আমাকে সব খবর দিও।'

কুমার বললে, 'খবর দেব মানে? তুমি কি এইখানেই থাকবে?'

—'নিশ্চয়। নইলে অবলা যদি আবার ঐ জানলা দিয়ে বেরিয়ে চম্পট দেয়?'

—'কিন্তু তার পালাবার উপায় তো আর নেই। দড়ি তো সে নিজের হাতেই কেটে দিয়েছে।'

বিমল একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'আঃ, কুমার! যা বলি, শোনো। ওটা হচ্ছে অবলার নিজের বাসা। আর একগাছা নতুন দড়ি সংগ্রহ করতে তার বেশিক্ষণ লাগবে না। যাও, আর দেরি করো না, আমি এখানে পাহারায় রইলুম।'

কুমারের মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল, তবু আর কিছু না-বলে সে অগ্রসর হল।

উঠান থেকে বেরিয়ে জঙ্গলময় বাগানের ভিতরে গিয়ে দেখলে, বড় বড় গাছের ছায়া হেলে পড়েছে পূর্বদিকে। আন্দাজে বুঝলে, বেলা হয়েছে প্রায় দুটোর কাছাকাছি। কোন্ সকালে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, পেটে এখনো অন্ন-জল পড়েনি। বিশেষ, তার এত তৃষ্ণা পেয়েছিল যে বাগানের সেই পানায় সবুজ পুকুরের দিকেই সে কয়েক পা এগিয়ে না গিয়ে পারলে না। কিন্তু তারপরেই তার মনে হল বিমলের কথা। কাল থেকে সে অন্ন-জলের স্পর্শ পায়নি, তবু এখনও সমস্ত কষ্ট সহ্য করে আছে অম্লান মুখে! নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হয়ে কুমার আবার ফিরে এসে পাঁচ নম্বরের বাড়ির খিড়কির দরজা খুঁজতে লাগল।

সুন্দরবাবু ঠিক বলেছেন। এটা কি বাড়ি না গোলকধাঁধা! রাবিশের পাহাড়, ঝোপঝাপ, জঙ্গল ও কাঁটাবনের ভিতর থেকে আসল পথটি বার করে নিতে তার বেশ কিছুক্ষণ লাগত, কিন্তু একজন পাহারাওয়ালা তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকবার পথ বাত্‌লে দিলে।

ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সে দেখলে, দোতলার বারান্দায় সুন্দরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে শুকনো মুখে চুপ

করে বসে আছেন এবং তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পুতুলের মতন জন-চারেক পাহারাওয়ালা।

কুমার শুধোলে, 'কি খবর সুন্দরবাবু? এখানে বসে কেন?'

সুন্দরবাবু হাসবার জন্যে বিফল চেষ্টা করে বললেন, 'আপনাদের পথ চেয়ে বসে আছি আর কি!'

—'তার মানে?'

—'আমি জানি সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত দড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে আপনারা আবার নীচে নেমে আসবেন। তারপর আপনাদের নামতে দেরি হচ্ছে দেখে চারজন সেপাইকে ওপরে পাঠিয়ে আমি এইখানেই বসে অপেক্ষা করছি। কিন্তু আপনি একলা এদিক দিয়ে এলেন কেন?'

—'সে কথা পরে বলছি। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, আপনি কি এখনো অবলার খোঁজ করেননি?'

সুন্দরবাবু শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'হুম্, করেছি বৈকি কুমারবাবু, করেছি বৈকি! দোতলা একতলা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি—কোথাও অবলা হতভাগা নেই! সদর-দরজার সেপাইদের মুখে শুনলুম, এ-বাড়ি থেকে জনপ্রাণী বাইরে বেরোয়নি। কিন্তু বিমলবাবু কোথায়? তিনি তো এতক্ষণে তেতলায় উঠেছেন?'

কুমার খুব সংক্ষেপে বিমলের খবর জানালে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'হুম্। এমন ত্যাঁদোড় আসামীর কথা তো আমি জীবনে কখনো শুনিনি। এই একখানা বাড়ির ভিতরেই বসে এতগুলো মানুষকে নিয়ে সে যা-ইচ্ছে-তাই করছে? কি দুর্দান্ত লোক রে বাবা! যান কুমারবাবু, শীগ্‌গির তেতলায় যান, ওপরে চারজন সেপাই আছে—আপনার কোন ভয় নেই। আমি এইখানেই ঘাঁটি আগলে বসে রইলুম!'

—'আপনিও আমার সঙ্গে এলে ভালো হোত না?'

সুন্দরবাবু করুণ স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে

মাপ করুন ভায়া, একে ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করে মরছি, তার ওপরে তেষ্টার চোটে প্রাণ করছে টা-টা! এখন উঠে দাঁড়ালে আমি হয়তো মাথা ঘুরেই পড়ে যাব। এক ঠোঙা খাবার আনতে পাঠিয়েছি, কিঞ্চিৎ জলযোগ না করলে আমি তো আর নড়তে পারছি না!'

এমন কাঁচুমাচু মুখে সুন্দরবাবু কথাগুলো বললেন যে, কুমার কোন প্রতিবাদ করতে পারলে না। কেবল বললে, 'আমি যাচ্ছি, কিন্তু আপনার রিভলবারটা একবার আমাকে দেবেন কি?'

সুন্দরবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে 'বেল্ট' থেকে রিভলবারটা খুলে নিয়ে কুমারের হাতে সমর্পণ করলেন।

কুমার তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গিয়ে দেখে, ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে চারজন পাহারাওয়ালা।

জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা কি ঐ ঘরগুলো খুঁজে দেখেছ?'

তারা জানালে, খুঁজে দেখেছে বটে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

কুমার বললে, 'অসম্ভব। আসামী তেতলাতেই লুকিয়ে আছে।'

সে ছুটে গিয়ে আগেই চোর-কুঠরীর ভিতরে ঢুকল। ঘরে কেউ নেই।

তারপর এগিয়ে গিয়ে গরাদে-হীন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই সচমকে দেখলে, বাইরের হুকে ঝুলছে দুইগাছা দড়ি—তার একগাছা ছেঁড়া এবং আর একগাছা নেমে গিয়েছে প্রায় নীচেকার উঠান পর্যন্ত।

তাহলে বিমলের সন্দেহই সত্যে পরিণত হল? নতুন দড়ি ঝুলিয়ে অবলা আবার সরে পড়েছে?

কিন্তু সে পালাবে কেমন করে? উঠানের উপরে পাহারা দিচ্ছে যে বিমল নিজে!

কুমার বুক পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে উঠানের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। সেখানে বিমল বা অবলার কারুর কোন চিহ্নই নেই!

কুমার আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, বিমলের সাবধানী চোখকে

ফাঁকি দিয়ে অবলা নিশ্চয়ই নামতে পারেনি; আর এ-বিষয়েও একতিল সন্দেহ নেই যে, প্রাণ থাকতে বিমল কখনোই তাকে পালাতে দেবে না! তবে?···তবে কি এরি মধ্যে বিমলের সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়ে গেছে? আর জয়ী হয়েছে অবলাই? না, এটাও সম্ভব নয়। বিমলের মত বলবান লোক বাংলাদেশে বেশী নেই, এত শীঘ্র সে কাবু হবার ছেলে নয়! কিন্তু অবলার সঙ্গে সঙ্গে সেও অদৃশ্য কেন? তবে কি বিমল আবার শত্রুর পিছনে পিছনে ছুটেছে?

কুমার চিৎকার করে অনেকবার বিমলের নাম ধরে ডাকলে, কিন্তু কোন সাড়া পেলে না!

ভীত, চিন্তিত মুখে সে দ্রুতপদে আবার দোতলায় নেমে এসে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'সুন্দরবাবু সুন্দরবাবু। অবলা নতুন দড়ি বেয়ে ফের নীচে নেমে অদৃশ্য হয়েছে, বিমলেরও দেখা নেই।'

খাবারের ঠোঙা থেকে একখানা কচুরি নিয়ে সুন্দরবাবু তখন সবে প্রথম কামড় বসাবার জন্যে মুখব্যাদান করেছেন; কিন্তু খবর শুনেই তাঁর পিলে চমকে গেল রীতিমত! মহা বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কি রকম জাঁহাবাজ আসামী রে বাবা! এ যে পারার ফোঁটার মত হাতের মুঠোর ভেতরে থেকেও ধরা দেয় না! হুম্, আমাকে হাল ছাড়তে হল দেখছি।'

কুমার ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'তাহলে হাল ছেড়ে খাবারের ঠোঙা নিয়ে আপনি এইখানেই বসে থাকুন, আমি একলাই চললুম আমার বন্ধুর সন্ধানে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আ হা হা, চটেন কেন মশাই? সব সময়ে কি মুখের কথাই সত্যি কথা হয়? আমার কি কর্তব্যজ্ঞান নেই? এই রইল আমার খাবারের ঠোঙা—আর রইল আমার মুখের কচুরি, কোথায় যেতে হবে চলুন—হুম্!'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়ন্ত ও মানিকের প্রবেশ

আবার সেই পোড়ো-বাড়ির জঙ্গল-ভরা উঠান !

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঐ অলক্ষুণে পাঁচ নম্বরের বাড়ি আর এই হতচ্ছাড়া উঠান ! আমাদের কি আজ এরি মধ্যে লাট্টুর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরে মরতে হবে ?'

কুমার কোন কথা না বলে একেবারে উঠানের সেইখানে গিয়ে হাজির হল, খানিক আগে সে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল বিমলকে।

সেখানে ভিজে মাটির উপরে রয়েছে অনেকগুলো পায়ের দাগ এবং আরো নানারকম চিহ্ন। কুমার সেগুলোর দিকে তাকিয়ে নতুন কোন সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করছে, এমন সময়ে উঠানের ভিতরে প্রবেশ করলে আর দুজন নতুন লোক।

কিন্তু নতুন লোক হলেও তারা আমাদের অচেনা নয়। কারণ তাদের একজন হচ্ছে বিখ্যাত শখের ডিটেক্‌টিভ জয়ন্ত এবং আর একজন তার বন্ধু মানিক।

সুন্দরবাবু আনন্দে নেচে উঠে বললেন, 'আরে আরে—হুম্। কোথায় ছিলে হে তোমরা ? কেমন করে আমাদের খোঁজ পেলে ? ভারী আশ্চর্য ত !'

জয়ন্ত বললে, 'কিছুই আশ্চর্য নয়। আমরা গিয়েছিলুম বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে রামহরির মুখে সব শুনে সিধে এখানে চলে এসেছি। ব্যাপার কি বলুন দেখি ? আসামী কি ধরা পড়েছে ? বিমলবাবুকে দেখছি না ?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আসামীরও খোঁজ নেই, বিমলবাবুও অদৃশ্য! ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'কুমারবাবু, সংক্ষেপে আমাকে ব্যাপারটা বলতে পারবেন?'

কুমার খুব অল্প কথায় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো বর্ণনা করলে।

সমস্ত শুনে জয়ন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, 'বলেন কি কুমারবাবু? কিন্তু আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছেন?'

—'মাটির ওপরের এই দাগগুলো পরীক্ষা করছি।'

মানিক নিচের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাই তো, এখানে যে অনেক রকম দাগ রয়েছে! জয়ন্ত, তোমাকে সবাই তো পদচিহ্ন-বিশারদ বলে জানে, এখানকার মাটি দেখে কিছু আবিষ্কার করতে পারো কিনা দেখ না!'

জয়ন্ত তখনি মাটির উপরে বসে পড়ল। তারপর মিনিট-পাঁচেক ধরে নীরবে সমস্ত পরীক্ষা করে বললে, হুঁ, কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে বটে। কুমারবাবু, এই একজোড়া পদচিহ্ন দেখুন। খুব স্পষ্ট, নিখুঁত চিহ্ন, আর বেশ গভীর। কেউ এখানে খানিকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর সেই জন্যেই ছাপ এমন স্পষ্ট উঠেছে। আমার বিশ্বাস, এ পায়ের দাগ হচ্ছে আমাদের বন্ধু বিমলবাবুর।'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ, বিমল ঐখানেই ছিল বটে।'

—'তারপরেই দেখছি অনেকখানি ঠাঁই জুড়ে একটা লম্বা-চওড়া দাগ। আর ঐ ভাঙাবাড়ির দিক থেকে দু-জোড়া পায়ের দাগ এই লম্বা-চওড়া দাগের কাছে এসে থেমেছে। ব্যাপারটা বুঝছেন? লম্বা-চওড়া দাগটা দেখে অনুমান করছি, একটা মানুষের দেহ এখানে আছাড় খেয়েছে! আর ঐ দু-জোড়া দাগের আকার দেখে বেশ বোঝা যায়, ওগুলো হচ্ছে ছুটন্ত লোকের পায়ের ছাপ। হুঁ, দুজন লোক ভাঙাবাড়ির দিক থেকে ছুটে এসেছে একজন ভূপতিত লোকের কাছে! কেবল তাই নয়, দেখুন কুমারবাবু, দেখুন! ঐ

ঝুলন্ত দড়ির তলা থেকেও আর একজোড়া পায়ের দাগও এইখানে এসে থেমেছে। আন্দাজ বলতে পারি, এ হচ্ছে অবলার পদচিহ্ন। তাহলে হিসাবে কি পাই? একজন ভূতলশায়ী লোক আর তিনজন দণ্ডায়মান লোক! না, তারা কেবল দাঁড়িয়েই ছিল না, এখানে হাঁটু গেড়ে বসেও পড়েছিল। এই দেখুন, ভিজে মাটির উপরে তিনজোড়া হাঁটুর চিহ্ন! আমার সন্দেহ হচ্ছে, বিমলবাবু পড়ে গিয়েছিলেন, আর তিনজন লোক এসে তাঁকে মাটির ওপরে চেপে ধরেছিল!'

কুমার রুদ্ধশ্বাসে কাতরভাবে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আর কিছু বুঝতে পারছেন?'

জয়ন্ত ভূতলে দৃষ্টি সংলগ্ন রেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'পারছি বৈকি! এই দেখুন, তিনজোড়া পায়ের দাগ চলেছে আবার ঐ ভাঙাবাড়ির দিকে, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে মাটির ওপর দিয়ে একটা ভারী দেহ টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন।......সবই তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। কুমারবাবু, আপনার বন্ধু বিপদে পড়েছেন! এই দাগ ধরে আমি অগ্রসর হই, আপনারা সবাই আসুন আমার পিছনে পিছনে!'

জয়ন্ত এগুলো। কিন্তু গেল-বারে বিমলের সঙ্গে কুমার ভাঙা-বাড়ির ডানদিকে গিয়েছিল, এবারে জয়ন্ত সে দিকে গেল না। বাঁ-দিকে এগিয়ে ছাদ-ভাঙা দালানে উঠল। পাশাপাশি খানকয় ঘর—একটা ঘর ছাড়া সব ঘরই দরজা খোলা।

বন্ধ-দ্বারের উপরে করাঘাত করে জয়ন্ত বললে, 'এ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ কেন?' বলেই সে জীর্ণ দরজার উপরে পদাঘাত করলে সজোরে এবং পরমুহূর্তে অর্গল ভেঙে খুলে গেল দ্বার সশব্দে।

জয়ন্ত, কুমার, মানিক ও সুন্দরবাবুর সঙ্গে পাহারাওয়ালারা বেগে ভিতরে প্রবেশ করলে। ঘর কিন্তু শূন্য।

সে-ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটা ঘরে যাবার দরজা এবং সে-দরজাও বন্ধ।

এবারের দরজাটা তেমন জীর্ণ ছিল না বটে, কিন্তু মহা-বলবান জয়ন্তের ঘন ঘন পদাঘাত সহ্য করবার শক্তি তার বেশীক্ষণ হল না। আবার গেল তারও হুড়কো ভেঙে।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য!

প্রায়-অন্ধকার ঘর, প্রথমটা ভালো করে নজরই চলে না। কেবল এইটুকুই আবছা আবছা বোঝা গেল, একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক স্থিরমূর্তি।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি রিভলবার বার করে বললে, 'কে তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে?'

সাড়া নেই।

—'জবাব দাও, নইলে মরবে!'

তবু সাড়া নেই।

পাহারাওয়ালারা দুটো জানালা খুলে দিলে।

একটা পুরানো তেপায়ার উপরে দাঁড়িয়ে আছে বিমল। তার মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা।

কুমার দৌড়ে তার কাছে গেল।

জয়ন্ত ভীতকণ্ঠে বললে, 'এ কি ভয়ানক! দেখ মানিক, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দেখ!

কড়িকাঠের একটা কড়ায় বাঁধা একগাছা রজ্জু এবং সেই রজ্জুর অপর প্রান্ত সংলগ্ন রয়েছে বিমলের কণ্ঠদেশে! বিমলের হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা এবং তার দুই পায়েও দড়ির বাঁধন!

কুমার বিভ্রান্তের মতন বলে উঠল, 'বিমল! বন্ধু! তোমার গলায়—'

জয়ন্ত দুই হাতে বিমলের দেহ ধরে নামিয়ে বললে, 'কার পকেটে ছুরি আছে? শীগগির বিমলবাবুর গলার আর হাত-পায়ের দড়ি কেটে দাও।'

সুন্দরবাবু কথামত কাজ করলেন। মানিক দিলে মুখের বাঁধন খুলে।

জয়ন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'সর্বনাশ! বিমলবাবু,

গলায় ফাঁস পরে আপনি যে শূন্যে দোলও খেয়েছেন দেখছি! দেখুন সুন্দরবাবু, গলার চারিদিকে রাঙা টক্‌টকে দড়ির দাগ!'

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'হুম্!'

বিমল মুখ টিপে একটু হাসলে বটে, কিন্তু তার দুই চোখ তখন অশ্রুসজল।

কুমার ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল, কারণ বিমলকে সে কাঁদতে দেখেনি কখনো!

বিমল বললে, 'তুমি অবাক হয়ে গেছ কুমার? ভাবছ আমার চোখে কান্নার জল? না বন্ধু, না! এ কান্নার অশ্রু নয়, এ হচ্ছে রুদ্ধ ক্রোধ আর নিষ্ফল আক্রোশের অশ্রু। অবলা ঠিক কলের পুতুলের মতন আমাদের নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে ধরব কি, তার হাতে বারবার ধরা পড়ছি আমি নিজেই! আর এবারে খালি ধরাই পড়িনি—চক্ষের সামনে দেখেছি নিশ্চিত মৃত্যুর ঘোর অন্ধকার!'

কুমার বললে, 'কিন্তু কি করে তুমি বন্দী হলে? অবলা তো ছিল তেতলায়!'

বিমল বললে, 'হ্যাঁ। অবলা ছিল তেতলায়। আমি দাঁড়িয়েছিলুম উঠোনের ওপরে। আমার দৃষ্টি তেতলার জানলা ছেড়ে আর কোন দিকে তাকায়নি, কারণ এখানে অবলা ছাড়া দ্বিতীয় কোন শত্রু থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা আমার মনে জাগেনি!·········দাঁড়িয়ে আছি, আচমকা পিছন থেকে 'ল্যাসো'র মতন দড়ির একটা ফাঁস্‌কল এসে পড়ল আমার গলার ওপর। কিছু বলবার আগেই অদৃশ্য হাতের বিষম এক হ্যাঁচ্‌কা টানে পরমুহূর্তেই দড়াম্ করে মাটির ওপরে পড়ে গেলুম। আঘাত পেয়ে দু-এক মিনিট অজ্ঞানের মত হয়ে রইলুম।···সাড় হতে দেখি, আমি এই ঘরের ভিতরে রয়েছি—আমার মুখ, হাত, পা সব বাঁধা আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবলার সঙ্গে আরো দুজন লোক। আমি—'

হঠাৎ বাধা দিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'বিমলবাবু! এতক্ষণ লক্ষ করে দেখিনি, কিন্তু আপনার গলায় ওটা কি ঝুলছে?'

—'জেরিণার কণ্ঠহার।'

—'জেরিণার কণ্ঠহার ?'

—'হ্যাঁ, অবলার উপহার !'

—'বলেন কি মশাই, বলেন কি ? যে মহামূল্যবান হীরের হারের জন্যে এত কাণ্ড, অবলা সেইটেই আপনাকে উপহার দিয়েছে ?'

—'আমাকে নয়, আপনাদের। কারণ অবলা জানে, কড়িকাঠের দড়িতে এখন আমার মৃতদেহ আড়ষ্ট হয়ে ঝুলছে !'

কুমার অধীর কণ্ঠে বললে, 'বিমল, ও কথা রেখে এখন আসল কথা বল।'

—'তাই বলি ! অবলা খিলখিল করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললে 'এই যে, বাছাধনের যে জ্ঞান হয়েছে দেখচি ! বামন হয়ে চাঁদ ধরবার লোভ করেছিলে, এখন লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু হবে বৈকি ! বড্ড বেশী লেগেছে বুঝি ? কি করব খোকাবাবু, আমার যে মোটেই সময় নেই, নইলে আদর করে দু-দণ্ড তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতুম ! যাক্, আর বেশীক্ষণ তোমাকে কষ্ট দেব না, এবারে একেবারে সব জ্বালা তোমার জুড়িয়ে দিচ্ছি !······ ওরে ভোঁদা, কড়িকাঠের কড়ায় দড়িটা বাঁধা হল ?······হয়েছে ? আচ্ছা।' এই বলে সে নিজের পকেট থেকে একছড়া হীরের হার বার করলে। তারপর হারছড়া আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, 'এই নাও ছোকরা জেরিণার কণ্ঠহার পরো। শুনে অবাক হচ্ছ ? অবাক হয়ো না। কারণ এটি হচ্ছে নকল জেরিণার কণ্ঠহার। বিজয়পুরের মহারাজা ভারী চালাক, আমাদের জন্যে লোহার সিন্দুকে এই নকল হারছড়া রেখে, আসল জিনিস সরিয়ে রেখেছেন অন্য কোথাও ! আর এই কাঁচের নকল হার বোকার মত চুরি করে এনে আমরা বিপদ-সাগরে নাকানি-চোবানি খেয়ে মরছি ! ও হার তোমার গলায় রইল, এখনি পুলিস এসে ওটাকে উদ্ধার করবে অখন ! আমাকে এখন যেতে হবে, কিন্তু তার আগে তোমার একটা ব্যবস্থা

করে যেতে চাই !……ওরে ভোঁদা, ওরে উপে ! চেয়ারখানা এদিকে টেনে নিয়ে আয় তো ! হ্যাঁ, এইবারে ছোকরাকে ওর ওপরে তুলে দাঁড় করিয়ে দে।' তারা হুকুম তামিল করলে। তারপর আমার গলায় পরিয়ে দিলে দড়ির ফাঁস। অবলা বললে, 'বিমলভায়া, চোখে ধোঁয়া দেখবার আগে মনে মনে ভগবানকে ডেকে নাও। যদিও তুমি আমাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছ, তবু তোমার মত ক্ষুদ্র জীবকে বধ করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু জানো তো, মাঝে মাঝে পিঁপড়ের মতন তুচ্ছ প্রাণীকেও না মারলে চলে না ? আমি আবার বিজয়পুরের মহারাজার অনাহুত অতিথি হতে চাই, এবারে আসল জেরিণার কণ্ঠহার না নিয়ে আর ফিরব না ! কিন্তু তুমি বেঁচে থাকলে আবার আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে ! তাই—' ঠিক এই সময়ে বাহির থেকে আর-একজন লোক ছুটে এসে বললে, 'বাবু, পুলিসের লোক আবার উঠোনের ওপর এসেছে' ! অবলা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ভোঁদা, যা-যা, শীগগির ছুটে গিয়ে মোটরখানা বার করে 'স্টার্ট' দে, আর এ-বাড়িতে নয় !' তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, 'বিমল, আরো মিনিট তিন-চার তোমার সঙ্গে গল্প করব ভেবেছিলুম, কিন্তু তা আর হল না। শুনেছি তুমি নাকি 'অ্যাড্ভেঞ্চার' ভালোবাসো—এইবার তোমার চরম অ্যাড্ভেঞ্চারের পালা ! যাও, এখন 'দুর্গা' বলে পরলোকের পথে যাত্রা কর।' সে একটানে চেয়ারখানা আমার পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে বেগে দৌড়ে চলে গেল ! ঝপাং করে আমার দেহ ঝুলে পড়ল—গলায় লাগল বিষম হ্যাঁচকা টান। সেই মুহূর্তেই হয়তো আমার দফারফা হয়ে যেত, কিন্তু আমি আগে থাকতেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম, গলার সমস্ত মাংসপেশী ফুলিয়ে শক্ত আর আড়ষ্ট করে প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলুম—যদিও ভয়ানক যন্ত্রণায় প্রাণ হল বেরিয়ে যাবার মত ! তুমি জানো কুমার, আমার মত যারা নিয়মিতভাবে খুব বেশী ব্যায়াম অভ্যাস করে, তারা শরীরের যে কোন স্থানের মাংসপেশী ইচ্ছা করলেই লোহার মতন

কঠিন করে তুলতে পারে, তখন মুগুরের আঘাতও অটলভাবে সহ্য করা অসম্ভব হয় না! কাজেই গলায় দড়ির চাপ কোনরকমে সামলে নিলুম—যদিও এ উপায়ে বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারতুম না। বেশীক্ষণ এভাবে থাকবারও দরকার হল না, কারণ আগেই দেখে নিয়েছিলুম ঐ তেপায়াটা! পুলিসের ভয়ে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পালাতে হল বলে অবলা ওর দিকে ফিরে চাইবার সময় পায়নি, নইলে নিশ্চয়ই ওটাকে সরিয়ে ফেলত। বার-দুয়েক ঝাঁকি মেরে দোল খেয়ে আমি কোনরকমে ওর ওপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর খানিকক্ষণ যে কী ভাবে কেটেছে, তা জানেন খালি আমার ভগবান! পুরনো, নড়বড়ে তেপায়া, আমার ভারী দেহের ভারে টলমল ও মচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হয়—এই বুঝি পটল তুলি! এক এক সেকেণ্ডকে মনে হয় এক এক ঘণ্টা! সে যেন মরণাধিক যন্ত্রণা! তারপর—তারপর আর কি, ঘটনাস্থলে তোমাদের আবির্ভাব, যমালয়ের দ্বার থেকে আমার প্রত্যাবর্তন!'

সুন্দরবাবু সহানুভূতি-মাখা স্বরে বললেন, 'হুম্‌, বিমলবাবু, হুম্‌! না-জানি আপনার কতই লেগেছে! কিন্তু বিজয়পুরের মহারাজাটা তো ভারী বদ লোক দেখছি! চোরে যে নকল হীরের হার চুরি করেছে এ-কথাটা আমাদেরও কাছে প্রকাশ করেনি!'

কুমার বললে, 'ও-সব কথা পরে হবে, এখন আমাদের কি করা উচিত? বিমলের কথায় বোঝা গেল, অবলা তার দলবল নিয়ে মোটরে চড়ে এখান থেকে সরে পড়েছে!'

বিমল বললে, 'এর পর তার দেখা পাব আমরা বিজয়পুরের মহারাজার ওখানেই। জেরিণার কণ্ঠহার ছেড়ে সে অন্য কোথাও নড়বে না। সেইখানেই আর একবার তার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করব!······ হ্যাঁ, ভালোকথা! জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু! আপনারাও এখানে যে?'

জয়ন্ত বললে, 'এখন বাড়ির দিকে চলুন! চুম্বক কেন যে লোহাকে টেনেছে, পথে যেতে যেতে সে কথা বলব অখন!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নৈশ অভিনয়

বিজয়পুরের মহারাজা বাহাদুর যে বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছেন, ঠিক তার সামনেই একখানা ছোট তেতলা বাড়ি।

বাড়ির উপর-তলার রাস্তায় ধারে এক ঘরে জানলার কাছে বসেছিল একজন বিপুলবপু পুরুষ। তার দেহখানা এত বড় যে দেখলেই মনে হয়, ঐ চেয়ারখানা ভার সইতে না পেরে এখনি মড়্মড়্ করে ভেঙে পড়বে।

এইমাত্র ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত করে সে 'স্ট্রপে'র উপরে ক্ষুর ঘষতে ঘষতে ডাকলে, 'উপে!'

দরজা ঠেলে একজন লোক ঘরের ভিতরে ঢুকেই চমকে উঠল।

ক্ষুরখানা খাপের ভিতরে ঢুকিয়ে মেয়ে-গলায় খিলখিল করে হেসে উঠে প্রথম লোকটি বললে, 'কি রে, আমাকে দেখেই চমকে উঠলি বড় যে?'

উপে বললে, 'আজ্ঞে, দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছেন বলে আপনাকে এখন সহজে আর চেনা যাচ্ছে না!'

—'হুঁ, তাই তো আমি চাই! আমাকে দেখে চিনতে পারলে পুলিস অবলা বলে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু মুশকিলে পড়েছি আমার এই প্রকাণ্ড দেহখানা নিয়ে। গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু বড় চেহারা তো ছেঁটেছুটে ছোট করা যায় না! আমার বেয়াড়া দেহটা দেখলেই যে লোকে ফিরে-ফিরে তাকায়, আর আমার হতচ্ছাড়া মেয়েলী গলার আওয়াজ! এ গলা যে একবার শোনে সে আর ভোলে না। উপে রে, একটু চালাক লোক হলেই আমার ছদ্মবেশ ধরে ফেলতে পারবে!'

উপে বললে, 'কর্তা, আপনি রাজবাড়ির এত কাছে এসে ভালো করেননি। পুলিস এখন ভারী সাবধান, চারিদিকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

অবলা বললে, 'হ্যাঁ, খুঁজে বেড়াচ্ছে বটে, তবে রাজবাড়ির এত কাছে নয়। ঐ ভুঁদো সুন্দর-দারোগাকে আমি খুব চিনি, তার নজর থাকবে এখন টালিগঞ্জের দিকেই। আমরা যে ভরসা করে রাজবাড়ির এত কাছে আসব, এ সন্দেহ কেউ ভুলেও করতে পারবে না। এখানেই আমরা বেশী নিরাপদ। কিন্তু সে কথা এখন থাক। শ্যামা এসে রাজবাড়ির কোন খবর দিয়ে গেছে?'

—'হ্যাঁ কর্তা! শ্যামা এইমাত্র এসে বলে গেল, আসল কণ্ঠহার আছে রাজার শোবার ঘরে, ড্রেসিং টেবিলের ডানদিকের টানায়।'

—'হুঁ, বিজয়পুরের রাজা দেখছি মহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি! তিনি নকল হার রাখেন সিন্দুকে লুকিয়ে, আর আসল জিনিস রাখেন প্রায় প্রকাশ্য জায়গায়! তিনি বেশ জানেন যে, সাধারণ লোকের চোখ আগেই খোঁজে লোহার সিন্দুক। চমৎকার ফন্দি।'

—'শ্যামা আরো বললে, 'রাজার শোবার ঘরের ঠিক সামনে দিন-রাত একজন বন্দুকধারী সেপাই মোতায়েন থাকে।'

অবলা বললে, 'ও সেপাই-টেপাইকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। তাদের চোখে ধুলো দিতে বেশী দেরি লাগবে না।'

—'কিন্তু কর্তা, শ্যামা যে আজই রাজবাড়ির কাজ ছেড়ে দিতে চায়। তাকে নাকি সকলে সন্দেহ করছে।'

—'তা এখন কাজ ছাড়লে আমার কোন ক্ষতি নেই। যে-কারণে তাকে রাজবাড়িতে কাজ নিতে বলেছিলুম আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তবে আজকের দিনটা সবুর করতে বলিস।

ঠিক এই সময়ে দড়াম্ শব্দে ঘরের দরজা খুলে একটা লোক ভিতরে ঢুকেই উৎফুল্ল স্বরে বলে উঠল, 'কেল্লা ফতে বাবু, কেল্লা ফতে।'

অবলা বললে, 'কি রে ভোঁদা, ব্যাপার কি ?'

—'বিমল বেটা পটল তুলেছে !'

—'ঠিক বলছিস তো ?'

—'বাবু, বেঠিক কথা বলবার ছেলে আমি নই। একেবারে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে আমি খবর নিয়ে এসেছি। বিমলকে অজ্ঞান অবস্থায় কাল দুপুরে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই তার জ্ঞান হয়নি। আজ ভোরবেলায় সে মারা পড়েছে।'

অবলা তার মস্ত বড় মুখে এক-গাল হেসে বললে, 'তাহলে আমার মুখ থেকে বিমল যেটুকু শুনেছিল, নিশ্চয়ই তার কিছুই প্রকাশ করতে পারেনি। বহুৎ আচ্ছা, এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ভোঁদা তোড়জোড় সব ঠিক কর্। বিমল যখন পরলোকে হাওয়া খেতে গেছে, তখন আজ রাত্রে আবার আমরা তারই বাগান দিয়ে রাজবাড়ি আক্রমণ করব।'

—'কিন্তু বাবু, ও-বাড়িতে সেই রামহরি বুড়ো তো এখনো আছে ?'

—'সে বেটা আজ বিমলের শোকে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, পাঁচিল টপ্‌কে কখন আমরা বাগানের ভেতরে গিয়ে ঢুকব, এটা জানতেও পারবে না। এখন কি করতে হবে শোন ভোঁদা।'

—'বলুন কর্তা।'

—'জন-ছয়েক লোক নিয়ে আমরা রাজবাড়িতে ঢুকব। রাজবাড়ির পশ্চিম দিকের রাস্তায় রাত্রে লোকজন বড় চলে না, সেইখানে আমাদের একখানা মোটরগাড়ি থাকবে। শ্যামার মুখে খবর পেয়েছি, পূর্বদিকে রাজার শোবার ঘরে আসল কণ্ঠহার আছে। ও-বাড়ির অন্ধি-সন্ধি সব আমার জানা। রাজবাড়িতে ঢুকে তোকে নিয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকব। বাকি লোকদের নিয়ে উপে বারান্দা দিয়ে যাবে পশ্চিম দিকে। আগে গাছকয় দড়ি বারান্দা থেকে ঝুলিয়ে দেবে। তারপর এমন আওয়াজ করে কোন দরজা-টরজা ভাঙবার চেষ্টা করবে, যাতে-করে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর চোর এসেছে

বলে সবাই যখন ব্যস্ত হয়ে পশ্চিম দিকে ছুটে যাবে, আমার লোকেরা দড়ি বেয়ে নিচে নেমে মোটরে চড়ে লম্বা দেবে—বুঝেছিস ?'

ভোঁদা আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, 'বুঝেছি কর্তা, বুঝেছি ! বাড়ির সবাই যখন চোর ধরতে ছুটবে, তখন আমরা দুজনে ঢুকব রাজার শোবার ঘরে।'

উপে তারিফ করে বললে, 'উঃ, আমার কর্তার কি বুদ্ধির জোর ! বলিহারি !'

অবলা বললে, 'ঐ বিমল ছোকরা কিছু করতে না পারুক, আমাদের বড়ই জ্বালিয়ে মারছিল। পথের কাঁটা এখন সাফ। প্রথমটা আমি তাকে মারতে চাইনি। কিন্তু যে নিজে মরতে চায়, ভগবানও তাকে বাঁচাতে পারে না, আমি কি করব ?'

সে-রাত্রির সঙ্গে চাঁদের সম্পর্কে ছিল না—অবশ্য কলকাতা শহরও আজকাল আর চাঁদের মুখাপেক্ষী নয়। গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিকের সঙ্গে মিতালি করে কলকাতা আজ চাঁদের গর্ব চূর্ণ করেছে। তবু এখানে চাঁদের আলো জাগে বটে, কিন্তু সে যেন বাহুল্য মাত্র।

রাত তখন দুটো বাজে-বাজে। পথে পথে লোকজন আর চলছে না। পাহারাওয়ালারা রোয়াকে ঘুমিয়ে পড়ে কণ্ঠকে নীরব, কিন্তু নাসিকাকে জাগিয়ে সরব করে তুলেছে। তাদের নাসাগর্জনে ভয় পেয়ে ঝিঁঝিপোকারা একেবারে চুপ মেরে গেছে।

হঠাৎ বিজয়পুরের মহারাজার অট্টালিকার পাশের এক রাস্তার কয়েকটা গ্যাসের আলো যেন অকারণেই নিবে গেল। তারপরই জাগল একখানা মোটরগাড়ির আওয়াজ। গাড়িখানা অন্ধকার রাস্তার ভিতরে ঢুকে খানিক এগিয়েই থেমে পড়ল।

কিছুক্ষণ সমস্ত চুপচাপ।···মিনিট পনেরো কাটল।

তারপরেই আচম্বিতে চারিদিকের স্তব্ধতাকে যেন টুকরো টুকরো করে দিয়ে চীৎকার উঠল—'চোর, চোর ! ডাকাত ! এই সেপাই !

এই দরোয়ান !' মুহূর্তের মধ্যে বহু কণ্ঠের কোলাহলে ও বহু লোকের পদশব্দে বেধে গেল এক মহা হুলুস্থুল।

বলা বাহুল্য, এই গোলমালের জন্ম বিজয়পুরের মহারাজার বাড়িতেই। পাড়াসুদ্ধ সকলের ঘুম ভেঙে গেল, এবং ছুটে গেল রোয়াকের পাহারাওয়ালার কত সাধের সুখস্বপ্ন! দেখতে দেখতে রাজপথের উপরে বৃহৎ এক জনতার সৃষ্টি হল।

কোথায় চোর, কারা চীৎকার করছে, সে-সব কিছু বোঝবার আগেই সকলে শুনতে পেলে দ্রুতগামী এক মোটরের শব্দ।···

রাজবাড়ির দোতলার একটা ঘুপসি জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়ে অবলা চুপিচুপি বললে, 'ভোঁদা, এইবার আমাদের পালা।'

দুজনে দ্রুতপদে, কিন্তু নিঃশব্দে পূর্বদিকে এগিয়ে গেল।

অবলা বললে, 'এই ঘর। যা ভেবেছি তাই। সেপাই গেছে চোর ধরতে। ঘরের দরজা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে? ভোঁদা, একবার উঁকি মেরে ভেতরটা ছাখ্ তো।'

ভোঁদা উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বললে, 'ঘরের ভেতরে কেউ নেই।'

—'হুঁ, তাহলে রাজাবাহাদুরও চোর-ধরা দেখতে গেছেন। বহুৎ আচ্ছা। চল্।'

দুজনে সিধে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝারি ঘর। একদিকে একখানা বড় খাট। আর একদিকে দুটো আলমারি এবং আর একদিকে একটা আয়নাওয়ালা ড্রেসিং-টেবিল।

অবলা তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে ডানদিকের একটা টানা জোর করে টেনে খুলে ফেললে। ভিতর থেকে একটা ছোট বাক্স বার করে তার ডালা খুলেই আনন্দে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল।

ইতিমধ্যে একটা আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অভাবিত দুই মূর্তি।

তাদের একজনের হাতে রিভলবার। সে বললে, 'কি দেখছ অবলাকান্ত? জেরিণার কণ্ঠহার?'

অবলা চমকে দুই পা পিছিয়ে গেল। তার মুখের ভাব বর্ণনাতীত।

—'কি অবলা, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন হে? আমাদের চেনো না বুঝি? তাহলে শুনে রাখো, আমার নাম জয়ন্ত আর এর নাম মানিক। আমারা হচ্ছি শখের গোয়েন্দা—অর্থাৎ ঘরের খেয়ে তোমাদের মতন বনের মোষ তাড়াই। আমরা জানতুম, আজ হোক কাল হোক, তোমরা এখানে আসবেই। তাই তোমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যেই আমরা এখানে অপেক্ষা করছিলুম।···ওকি, ওকি, তুমি বন্ধুর পিছনে স'রে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ কেন? আমার রিভলবার দেখে ভয় হচ্ছে বুঝি?'—বলতে বলতে জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগুতে লাগল।

অবলা হঠাৎ পিছন থেকে ভোঁদাকে মারলে প্রচণ্ড এক ধাক্কা। ভোঁদা ঠিকরে একেবারে হুড়মুড় করে জয়ন্তের দেহের উপরে এসে পড়ল। জয়ন্ত এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, টাল সামলাতে না পেরে সেও ভোঁদাকে নিয়ে পড়ে গেল মাটির উপরে।

মানিক তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে জয়ন্তকে তুলতে গেল। জয়ন্ত নিজেকে ভোঁদার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করতে করতে বললে, 'আমাকে নয়—আমাকে নয় মানিক, তুমি ধর অবলাকান্তকে।'

কিন্তু অবলা তখন ঘরের বাইরে। সে চোখের নিমেষে দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে বাইরের দিকে ঝুলে পড়ল। তারপর রেলিং ছেড়ে অবতীর্ণ হল পাশের বাগানের পাঁচিলের উপরে। এবং সেখান থেকে একলাফে বাগানের ভিতরে। সে হচ্ছে বিমলের বাগান।

বাগানের চারিদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো। অবলা লাফ মেরে বসে পড়েই উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে দেখলে, একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে আবার দুই মূর্তি।

মূর্তি দুটো এগিয়ে এল। তাদের দুজনেরই হাতে কি চক্‌চক্ করছে? রিভলবার!

একটা মূর্তি হেসে উঠে বললে, 'আমাদের চিনতে পারছ অবলা? আমরা হচ্ছি বিমল আর কুমার। হ্যাঁ। তোমার মায়া কাটাতে পারলুম না, তাই আমি যমালয় থেকেই ফিরে এলুম।'

—'হুম্। বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার বধিব ঘুঘু তোমার পরাণ। হুম্। হুম।' বলতে বলতে আর একদিক থেকে আবির্ভূত হলেন সুন্দরবাবু।

তারপরেই নানা দিক থেকে দেখা দিতে লাগল পাহারাওয়ালার পর পাহারাওয়ালা।

নবম পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর পুনরাগমন

মিথ্যা আর পলায়নের চেষ্টা! এটা বুঝে অবলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পাথরের মূর্তির মত।

কুমার বললে, 'সুন্দরবাবু, অবলার মত ধড়িবাজকে কিছু বিশ্বাস নেই। শীগগির ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিন।'

—'ঠিক বলেছেন। এই অবলা, হুম্। বার কর হাত, পরো লোহার বালা। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।'

ইতিমধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটনাস্থলে জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব হল। অবলাকে বন্দী অবস্থায় দেখে জয়ন্ত আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'যাক্, পালের গোদাটা তাহলে পালাতে পারেনি। উঃ, সত্যি বিমলবাবু, এ হচ্ছে ভয়ানক ধড়িবাজ, আর একটু হলে আমারও চোখে ধুলো দিয়েছিল।'

মানিক বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত, অবলার সঙ্গের লোকটা কোন্ ফাঁকে লম্বা দিয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'উপায় কি, আমরা যে অবলাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ছিলুম।'

হঠাৎ মেয়ে-গলায় খন্‌খন্ করে হেসে উঠে অবলা বললে, 'আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবার দিন এখনো তোমাদের ফুরোয়নি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, তার মানে?'

—'মানে? মানে-টানে আমি জানি না। বললুম একটা কথার কথা।'

—'চুপ করে থাকো রাস্কেল। তোমার ছোট মুখে অত কথার কথা আমি শুনতে চাই না।'

—'ওহে সুন্দর-দারোগা, কি বলব, আমার হাত বাঁধা, নইলে আমাকে রাস্কেল বলার ফল এখনি পেতে! তোমার মত ক্ষুদ্র জীবের হাতে ধরা পড়লে এতক্ষণে আমি হয়তো লজ্জাতেই মারা পড়তুম! কিন্তু আমি ধরা পড়েছি বিমলের হাতে, এতে আমার অগৌরব নেই। তার ওপরে দেখছি আমার অজান্তে বিমল আর কুমারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ডিটেকটিভ জয়ন্তও। এতগুলো মাথাকে কেমন করে সামলাই বল! কিন্তু আমি ধরা পড়েছি একটিমাত্র ভুলেই। আগে যদি জানতুম বিমল এখনো বেঁচে আছে, তাহলে তোমরা কেউই আজ আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারতে না।'

বিমল হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ অবলা, তোমার কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে মরতে হয়েছিল যে তোমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যেই! তুমি আমাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছ। সত্যি কথা বলতে কি, এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কেউই আমাকে এত বেশী জ্বালাতন করতে পারেনি। তোমার বুদ্ধির তারিফ করি। কিন্তু এও জেনে রাখো অবলা, শেষ-পর্যন্ত অসাধুতার জয় কখনো হয় না।'

অবলা বললে, 'বৎস বিমল, তোমার হিতোপদেশ বন্ধ কর, ও-সব বুলি আমারও অজানা নেই। এখন আমাকে নিয়ে যা করবার হয়, কর।'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, তোমার কাছ থেকে জেরিণার কণ্ঠহার আদায় করা।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁঃ! অবলা-নচ্ছার কণ্ঠহারটা এরি-মধ্যে চুরি করতে পেরেছে নাকি!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, কণ্ঠহার চুরি করবার পরেই আমরা দেখা দিয়েছি।'

অবলা হাসিমুখে বললে, 'না, কণ্ঠহার আমার কাছে নেই।'

—'নেই?'

—'না। তোমাদের দেখে আমি যখন ভোঁদার পিছনে সরে দাঁড়াই, কণ্ঠহারটা তখনি লুকিয়ে তার পকেটে ফেলে দিয়েছি।'

—'তুমি বলতে চাও, ভোঁদা কণ্ঠহার নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে ?'

—'হ্যাঁ। তোমরা আমাকে ধরলেও কণ্ঠহার পাবে না। আমার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।'

সুন্দরবাবু ও জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে অবলার জামা কাপড় তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন। কিন্তু কণ্ঠহার পাওয়া গেল না।

অবলা বললে, 'দেখছ তো, হেরেও আমি জিতে গেলুম ?'

সুন্দরবাবু রাগে গস্‌গস্ করতে করতে বললেন, 'হতভাগার বাদুড়ে মুখখানা থাব্‌ড়া মেরে ভেঙে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে !'

অবলা বললে, 'ওহে ক্ষুদে দারোগা, আর এখানে দাঁড়িয়ে বীরত্ব দেখিয়ে কোনই লাভ নেই। কণ্ঠহারের আশা ছেড়ে এখন আমায় থানায় নিয়ে চল দেখি ! আমার ঘুম পেয়েছে।'

সুন্দরবাবু ধাক্কা মেরে অবলাকে পাহারাওয়ালাদের দিকে ঠেলে দিতে গেলেন, কিন্তু তাকে এক ইঞ্চিও নড়াতে পারলেন না।

অবলা খিলখিল করে হেসে বললে, 'ওহে পুঁচকে বীরপুরুষ ! তোমার নিজের শক্তি দেখছ তো ? এখন যদি আমার হাত খোলা থাকত তোমায় কি অবস্থা হ'ত বল দেখি ?'

সুন্দরবাবু রাগে অজ্ঞানের মত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'হুম্, হুম্ ! এই সেপাই, ছুঁচোটাকে ধাক্কা মারতে মারতে ওখান থেকে নিয়ে চল দেখি ! হুম্ !'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, লোকটা সুবিধের নয়, আমরাও আপনার সঙ্গে থানা পর্যন্ত যাব নাকি ?'

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্য ভরে বললেন, 'সঙ্গে সেপাই রয়েছে, অবলারও হাত বাঁধা, তোমাদের সাহায্যের দরকার নেই। মোটরে উঠে থানায় পৌঁছতে ছ-সাত মিনিটের বেশী লাগবে না।'

সুন্দরবাবু অবলাকে নিয়ে চলে গেলেন।

জয়ন্ত ফিরে দেখলে, সামনের দিকে তাকিয়ে বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেও সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর হাসিমুখে বললে, 'বিমলবাবু, আপনি কি ভাবছেন হয়তো আমি তা বলতে পারি।'

—'বলুন দেখি।'

—'আপনি ভাবছেন, অবলা এইমাত্র কণ্ঠহারের যে কাহিনী বললে, হয়তো সেটা সত্য নয়।'

—'ঠিক। তারপর?'

—আপনি আরো ভাবছেন, অবলা এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে অনেক ফুলগাছ আর হাস্নুহানার বড় ঝোপ রয়েছে। ওখানটা একবার ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার।'

—'বাহাদুর জয়ন্তবাবু, আপনি আমার মনের কথা ঠিক ধরতে পেরেছেন। অতএব কুমার, বাড়ির ভেতর থেকে তুমি একটা পেট্রলের লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে এস।'

কুমার তাড়াতাড়ি ছুটল এবং পেট্রলের লণ্ঠন নিয়ে ফিরে এল।

বিমলের সন্দেহ মিথ্যে নয়। অল্পক্ষণ খোঁজবার পরেই হাস্নুহানার ঝোপের ভিতরেই পাওয়া গেল জেরিণার কণ্ঠহার!

কুমার সানন্দে বললে, 'অবলা গ্রেপ্তার—কণ্ঠহার উদ্ধার! ব্যস্ আমরাও নিশ্চিন্ত!'

ঠিক সেই সময়ে মহাবেগে সুন্দরবাবুর দ্বিতীয় আবির্ভাব! বিষম চীৎকার করতে করতে তিনি বলছেন, 'সর্বনাশ হয়েছে! অবলা আবার পালিয়েছে।'

দশম পরিচ্ছেদ

শেষ-রাতে

বিমল অত্যন্ত আশ্চর্য স্বরে বললে, 'অবলা আবার পালিয়েছে! বলেন কি সুন্দবাবু?'

সুন্দরবাবু প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'আর কিছু বলবার মুখ আমার নেই ভায়া। তোমরা অনায়াসেই আমার এক গালে চুন আর এক গালে কালি মাখিয়ে দিতে পারো। আমি একটুও আপত্তি করব না।'

জয়ন্ত বললে, 'অবলার হাত বাঁধা, আপনার সঙ্গে ছিল সার্জেন্ট আর পাহারাওয়ালা, তবু সে পালাল কেমন করে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, কেমন করে? সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ভাই, অদ্ভুত কাণ্ড! পুলিসের ওপর ডাকাতি—অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার!'

—'কি বলছেন আপনি!'

—'তাহলে শোনো। অবলাকে নিয়ে আমরা তো মোটরে উঠে থানার দিকে চললুম—গাড়িতে আমার সঙ্গে ছিল একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টার, একজন সার্জেন্ট, আর দুজন পাহারাওয়ালা। খানিক দূর এগিয়েই দেখলুম, পথ জুড়ে আড়াআড়ি ভাবে একখানা মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর একটা লোক তার মেশিনের ঢাক্‌না খুলে কি যেন পরীক্ষা করছে। পথ জোড়া দেখে আমার ড্রাইভারও বাধ্য হয়ে গাড়ি থামিয়ে ফেললে, আর তার পরমুহূর্তেই তোমাদের বলব কি ভাই, চোখে-কানে কিছু দেখবার শুনবার আগেই, কোত্থেকে কারা এসে বিপুল বিক্রমে আমাদের এমন আক্রমণ করলে যে, আমরা কেউ একখানা হাত তোলবারও অবকাশ পেলুম না! চারিদিকে দেখলুম সর্ষে-ফুলে ভরা ঘোর অন্ধকার, সর্বাঙ্গে খেলুম কিল-চড় আর ডাণ্ডার

গুঁতো, তার পরের সেকেণ্ডেই অনুভব করলুম আমি চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি রাস্তার ধুলোয় !···একখানা গাড়ি ছুটে চলে যাওয়ার শব্দ শুনে ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসে দেখি, অচেনা মোটরখানা অদৃশ্য, আমাদের মোটরখানা দাঁড়িয়ে আছে, আর আমার সঙ্গীরা রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে দিতে আর্তনাদ করছে !'

—'হুঁ, অবলার দলের সবাই দেখছি খুব কাজের লোক, কেউ কম যায় না। এরি মধ্যে তারা রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে আবার তাদের দলপতিকে উদ্ধার করবার জন্যে চমৎকার এক 'প্ল্যান্‌' ঠিক করে ফেলেছে ! বাহাদুর !'

—'হুম্‌, ওদের তো বাহাদুরি দিচ্ছ জয়ন্ত, কিন্তু আমার অবস্থাটা কি হবে বল দেখি ? কালকেই তো খবরের কাগজের রিপোর্টাররা আমাকে নিয়ে যা তা ঠাট্টা শুরু করে দেবে !'

—'আপনিও মোটরে উঠে তাদের পিছনে ছুটলেন না কেন ?'

—'সে-চেষ্টাও কি করিনি ভাই ? কিন্তু মোটর চালাতে গিয়ে দেখা গেল, তার চাকার 'টায়ার'গুলো হতভাগারা ছ্যাঁদা করে দিয়ে গেছে !'

—'এই ভয়েই তো আপনার সঙ্গে আমরাও যেতে চেয়েছিলুম সুন্দরবাবু !'

—'বেঁচে গিয়েছ ভায়া, বেঁচে গিয়েছ—আমার সঙ্গে থাকলে তোমাদেরও চোরের মার খেয়ে মরতে হ'ত !'

মানিক বললে, 'আজ্ঞে না মশাই ! আমরা গাড়িতে থাকলে আপনার মত ঘুমিয়ে পড়তুম না !'

সুন্দরবাবু মহা চটে বললেন, 'হুম্‌, এ হচ্ছে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা। মানিক, তুমি কি আমার চাকরিটি খাবার চেষ্টায় আছ ? ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মানে ?'

—'মানে হচ্ছে এই যে, অত রাত্রে রাস্তা জুড়ে একখানা সন্দেহজনক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আপনি সাবধান হতে

পারেননি। তা যে পারবেন না, এ তো জানা কথাই। কারণ যখন কারুর নাক ডাকে তখন কেউ কি সাবধান হতে পারে?'

সুন্দরবাবু অভিযোগ করে বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! মানিকের আজকের ঠাট্টা আমি কিন্তু সহ্য করতে পারব না! এ বড় 'সিরিয়াস্' ঠাট্টা!'

মানিক বললে, 'দাঁড়ান না, আমার ঠাট্টাই আপনার গায়ে লাগছে, কিন্তু কাল কাগজওলারা যখন 'ঘুমন্ত পুলিসের কাণ্ড' শিরোনাম দিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ রচনা করে ফেলবে, তখন বুঝতে পারবেন কত ধানে কত চাল!'
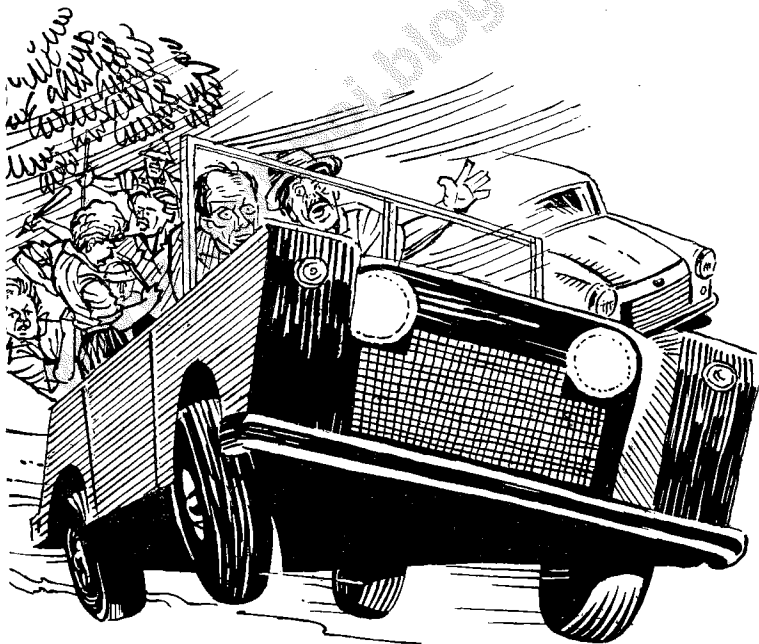
সুন্দরবাবু করুণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ক্ষীণস্বরে বললেন, 'তা যা বলেছ ভাই! তুমি তো ঘরের লোক—ঠাট্টাও কর, ভালোও বাসো। কিন্তু ঐ কাগজওলার দল, ওদের আমি ঘৃণা করি!'

বিমল সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার এত বেশী মুষড়ে পড়ার কারণ নেই। যার জন্যে এত গণ্ডগোল সেই আসল জেরিণার কণ্ঠহার আমরা আবার উদ্ধার করতে পেরেছি।'

সুন্দরবাবু ভয়ানক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হুম্, বল কি!'

বিমলবাবু সব কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করে বললে, 'কণ্ঠহারটা কি আপনি এখনি নিয়ে যেতে চান?'

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'বাপ রে, ক্ষেপেছ? এই রাত্রে ঐ সর্বনেশে কণ্ঠহার নিয়ে পথে বেরুলে কি রক্ষে আছে? যে

আশ্চর্য ক্রিমিনালের পাল্লায় পড়েছি, সে সব করতে পারে।'

বিমল যেন কি ভাবতে ভাবতে বললে, 'হ্যাঁ, অবশ্য যে অসাধারণ ব্যক্তি, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। হয়তো এই মুহূর্তেই সে আমার বাড়ির আশে-পাশে ঘোরাফেরা করছে!'

সুন্দরবাবু একবার চমকে উঠেই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'নাঃ, এতটা সাহস তার হবে না। কারণ সে বিলক্ষণই জানে, এবারে ধরা পড়লে আমি তার একখানা হাড়ও আস্ত রাখব না। যে কিল-চড়-ডাণ্ডা খেয়েছি, তার শোধ নিতে হবে তো! হুম্, পুলিসকে ধরে ঠ্যাঙানো, এত বড় আস্পর্ধা!'

বিমল বললে, 'যাক, যা হবার হয়ে গেছে, এইবার রাত থাকতে থাকতে আপনারা যে যার বাসায় ফিরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন গে, যান।' বলে সে বাগানের ঘাস-জমির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

জয়ন্ত বললে, 'ওকি, আপনি ওখানে জমি নিলেন কেন? বাড়ির ভেতরে যাবেন না?'

—'না, আমি আর কুমার, এইখানেই খোলা হাওয়ায় খানিক বিশ্রাম করতে চাই। কি বল কুমার, রাজী আছ?'

—'আল্‌বত।' বলেই কুমার বিমলের পাশে গিয়ে স্থান গ্রহণ করলে।

জয়ন্ত হেসে কি বলতে গিয়ে আর বললে না, ফিরে হন্‌হন্ করে বাগানের ফটকের দিকে এগিয়ে চলল এবং তার পিছু নিলেন মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুও।

পথে বিমলের বাড়ি ছাড়িয়ে মিনিট খানেক অগ্রসর হবার পরেই পাওয়া গেল একটি সরকারী পার্ক।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে তো পাহারাওলা রয়েছে, থানায় একলা যেতে হবে না। অতএব আমি আর মানিক এইখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি।'

—'এখান থেকে বিদায় নেবে কেন? তোমাদের বাসা তো থানা ছাড়িয়ে!'

—'বিমলবাবুদের মত আমরাও পার্কের এই খোলা হাওয়ায় খানিক বিশ্রাম করব।'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন ভঙ্গী করে বললেন, 'আমি প্রায় দেখি, তোমাদের আর বিমলবাবুদের মাথায় কেমন একরকম ছিট আছে। বাড়িতে অপেক্ষা করছে বিছানার আরাম, তবু হাটে বাটে যেখানে-সেখানে বিশ্রাম! না, তোমরা যতটা ভাবো আমি ততটা হাঁদা নই! হুম্, নিশ্চয়ই এর কোন মানে আছে!'

—'মানেটা যে কি, বাসায় ফিরে সেইটে আবিষ্কার করে ফেলুন গে'—হাসিমুখে এই কথা বলতে বলতে মানিকের হাত ধরে জয়ন্ত পার্কের ভিতর প্রবেশ করল।

একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে আশ্রয় নিয়ে জয়ন্ত বলল, 'মানিক পথ থেকে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু এখান থেকে আমরা পথের সবাইকেই দেখতে পাব।'

মানিক কৌতূহলী হয়ে বললে, 'এই শেষ-রাতে পথে তুমি কাকে দেখবার আশা করো?'

—'অবলাকে।'

—'কি বলছ হে?'

—'হ্যাঁ। বিমলবাবুও জানেন, অবলা আজ রাত্রেই আবার ঘটনাস্থলে আসতে বাধ্য। সেইজন্যেই তিনি আজ বাগান ছেড়ে নড়তে রাজী নন।'

—'ও, বুঝেছি! তোমরা বলতে চাও, সেই হাস্নুহানার ঝোপের ভেতর থেকে কণ্ঠহারছড়া উদ্ধার করবার জন্যে আবার হবে অবলার আবির্ভাব?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখানে তার পুনরাবির্ভাব যদি হয়, আজ রাত্রেই হবে। কারণ অবলার যুক্তি হবে এই: কণ্ঠহার ঐ ঝোপেই

আছে, বিমল বা অন্য কেউ এখনো তার সন্ধান পায়নি। কিন্তু আজকের রাতটা পুইয়ে গেলে কাল সকালের আলোয় কণ্ঠহারটা নিশ্চয়ই অন্য কারুর চোখে পড়ে যাবে। অতএব হারছড়াটাকে যদি উদ্ধার করতে হয়, আজ রাত্রেই করতে হবে। ও হারের ওপরে অবলার যে বিষম লোভ, এমন সুযোগ সে ছাড়বে বলে মনে হয় না। তার বিশ্বাস, আমরা সবাই এখন যে যার বিছানার শুয়ে স্বপ্ন দেখছি, বাগান একেবারে নিষ্কণ্টক!'

গ্যাসের আলোয় দেখা যাচ্ছে, বিজন রাজপথ—অত্যন্ত স্তব্ধ। পনেরো মিনিটের মধ্যে একজনও পথিকের সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক বললে, 'আর একটু পরেই গ্যাসের আলো নিববে, ধীরে ধীরে শহর জেগে উঠবে।'

জয়ন্ত চিন্তিত মুখে বললে, 'তবে কি অবলা প্রাণের ভয়ে কণ্ঠহারের আশা ত্যাগ করলে! উঁহু, সে তো কাপুরুষ নয়!'

মানিক আগ্রহ-ভরে বললে, 'দেখ, দেখ। ঐ একটা লোক আসছে! লোকটা চোরের মত ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অগ্রসর হচ্ছে।'

—'কিন্তু মানিক, লোকটাকে চেনবার উপায় নেই। ওর মাথা থেকে নাক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা! তবে লোকটা খুব জোয়ান আর ঢ্যাঙা বটে!'

—'ও যে বিমলবাবুদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে গেল!'

—'এইবারে আমাদেরও পার্কের আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে। চল, কিন্তু সাবধান!'

পার্ক থেকে বেরিয়ে দুজনে উঁকি মেরে দেখলে, লোকটা পথের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে!

জয়ন্ত নস্যদানী বার করে এক টিপ নস্য নিয়ে খুশি-গলায় বললে, 'এত তাড়াতাড়ি যখন অদৃশ্য হয়েছে, লোকটা তখন নিশ্চয়ই বিমল-বাবুদের বাগানের ভেতরেই ঢুকেছে!'

—'আমরাও এগুব নাকি ?'

—'নিশ্চয় ।'

কিন্তু কয়েক পা এগুতে না এগুতেই শেষ-রাত্রের স্তব্ধতা ভেঙে গেল উপর-উপরি তিনবার রিভলবারের গর্জনে। জয়ন্ত ও মানিক বেগে ছুটতে আরম্ভ করলে।

বিমলদের বাড়ির কাছে পৌঁছেই তারা দেখলে, বাগানের পাঁচিল টপ্‌কে ঠিক সামনেই লাফিয়ে পড়ল একটা লোক।

জয়ন্তও তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মত, লোকটা কোন বাধা দেবার আগেই প্রচণ্ড দুই ঘুষি খেয়ে মাটির উপরে ঘুরে পড়ে গেল।

মানিক হেঁট হয়ে দেখে বললে, 'একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

পরমুহূর্তে পাঁচিলের উপর থেকেই পথে অবতীর্ণ হল বিমল ও কুমার।

জয়ন্ত বললে, 'ঐ দেখুন বিমলবাবু, আপনার আসামীকে।'

বিমল সচকিত কণ্ঠে বললে, 'আপনারা! তাহলে আপনারাও জানতেন, অবলা আজ আবার আসবে ?'

—'নইলে ঘর থাকতে বাবুই ভিজবে কেন ? এই রাতে পথ আশ্রয় করব কেন ? কিন্তু বিমলবাবু, যাকে ধরেছি সে অবলা নয়, ভোঁদা।'

—'ভোঁদা ?' বিমলের মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

—হ্যাঁ বিমলবাবু। অবলা এত সহজে ধরা পড়বার ছেলে নয়। চালাকের মতন ভোঁদাকে সে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে।'

—'যাক্, উপায় কি ? ভোঁদাও বড় কম পাত্র নয়, অবলার ডান হাত।'

—'এখন একে নিয়ে কি করা যাবে ?'

—'সে কথা সকালে ভাবব। আজ তো ওকে আমার বাড়িতে বন্দী করে রেখে দি'। কি বলেন ?'

—'বেশ।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনাহুত অতিথি

কাল শেষ-রাত পর্যন্ত ঘুমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আজ সকালে তাই বেলা ন'টার আগে বিমলের ঘুম ভাঙল না।

সে বিছানা ছেড়ে উঠেই শুনলে, কুমারের নাসিকা-বাঁশরি এখনো তান-ছাড়া বন্ধ করেনি।

চেঁচিয়ে ডাকলে, 'বলি কুমার! ওহে কুমার! এখন নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন করো। প্রভাতের পরমায়ু ফুরোতে আর দেরি নেই।'

কুমার এপাশ থেকে ওপাশে ফিরলো। তারপর দুই চোখ মুদেই বললে, 'নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন তো করব, কিন্তু উপকরণ কই?'

—'অর্থাৎ এক পেয়ালা গরম চা?'

—'নিশ্চয়। আগে চা আসুক, তবে আমি চোখ খুলব।'

বিমল ডাকলে, 'রামহরি! ওগো রামহরি! বলি তুমিও ঘুমচ্ছো নাকি? স্টোভের ওপরে গরম জল ভরা কেট্‌লির সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি না কেন?'

রামহরি বিশেষ চিন্তিত মুখে ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, 'থামো খোকাবাবু, অত আর চ্যাঁচাতে হবে না। ওদিকে কি কাণ্ডটা হয়েছে শুনলে তোমাদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।'

কুমার চোখ মেলে বললে, 'চক্ষুস্থির হোক আর না হোক, তোমার কথা শুনে এই আমি চক্ষু উন্মীলিত করলুম। কি কাণ্ড হয়েছে রামহরি?'

—'তোমাদের সেই ভোঁদা বেটা লম্বা দিয়েছে।'

বিমল কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে বললে, 'তাই নাকি?'

কুমার খালি বললে, 'ও।'

—'তোমাদের কি মনে নেই, একতলার যে-ঘরে ভোঁদাকে বন্ধ করে রেখেছিলে, তার একটা জানালার একটা গরাদে ভাঙা ? ভোঁদা সেইখান দিয়েই পালিয়েছে !'

বিমল বললে, 'তাই নাকি ?'

কুমার বললে, 'ও !'

রামহরি বিস্মিত স্বরে বললে, 'তোমরা দুজনে কাল কি সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু খেয়েছ ?'

—'কেন ?'

—'নইলে অত কষ্ট করে যাকে ধরলে, সে পালিয়েছে শুনেও তোমাদের টনক নড়ছে না কেন ?'

বিমল খিলখিল করে হেসে উঠল।

কুমার বললে, 'আমাদের টনক সহজে নড়ে না। যাও রামহরি চা নিয়ে এস !'

রামহরি হতভম্বের মতন তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল ও কুমার সমস্বরে গর্জন করে উঠল, 'চা ! চা ! চা !'

রামহরি নড়ল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তারপর হঠাৎ সমুজ্জ্বল মুখে বললে, 'ওঃ-হো, বুঝেছি !'

—'ঘোড়ার ডিম বুঝেছ !'

—'ঘোড়ার ডিম নয় গো খোকাবাবু, ঠিক বুঝেছি ! এতকাল একসঙ্গে ঘর করলুম, তোমাদের মতন মানিক-জোড়কে চিনতে আর পারব না ?'

—'বটে ?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ ! ভোঁদাকে তোমরা ইচ্ছে করেই পালাতে দিয়েছ !'

—'কি করে বুঝলে ?'

—'ও ঘরে জানলার গরাদে ভাঙা, সেটা তো তোমরা জানতেই ! আর জেনে-শুনেই তোমরা যখন ভোঁদাকে ঐ ঘরেই বন্ধ করেছিলে,

তখন তোমাদের নিশ্চয় মনের বাসনা ছিল, সে যেন এখান থেকে সরে পড়ে!'

বিমল বললে, 'তাই নাকি?'

কুমার বললে, 'ও!'

রামহরি বললে, 'আর ন্যাকামি করতে হবে না, যাও! সত্যি করে বল দেখি, আমি ঠিক বুঝেছি কিনা?'

বিমল বললে, 'আমি স্বীকার করছি রামহরি, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ। এখন দয়া করে চট্‌পট্ চা এনে দাও দেখি!'

রামহরি গোঁ ধরে মাথা নেড়ে বললে, 'উঁহু, তা হবে না। আগে বল, কেন ভোঁদাকে ধরেও ছেড়ে দিলে?'

—'আহা, তুমি জ্বালালে দেখছি! এতটা যখন বুঝেছ তখন এটুকু আর বুঝতে পারছ না যে, ভোঁদাকে ছেড়ে দিয়েছি পালের গোদাকে ধরব বলে!'

—'কেমন করে?'

—'জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু তার পিছনে আছেন। আমরা অবলার এখনকার ঠিকানা জানি না। ভোঁদা পালিয়ে নিজেদের আড্ডা ছাড়া আর কোথাও যাবে না। সেই আড্ডার সর্দার হচ্ছে অবলা।'

—'খোকাবাবু, বুদ্ধি খেলিয়েছ ভালো! কিন্তু ভোঁদা তো জয়ন্তবাবুদের চেনে, তাঁরা পিছু নিলে সে সন্দেহ করবে না?'

—'রামহরি, তুমি আমাকে খোকাবাবু বলে ডাকো বটে, কিন্তু সত্যিই তো আমি আর খোকা নই! ও-কথা কি আমরাও ভাবিনি? জয়ন্তবাবুরা ভোঁদার পিছনে যাবেন না, যাবে তাঁদের চর।'

—'চর?'

—'হ্যাঁ। তুমি তো জানো না, কাজের সুবিধে হবে বলে জয়ন্তবাবু আজকাল একদল চর পুষছেন। তারা হচ্ছে পথের ছেলে—অনেকেই আগে ছিল ভিখারী। বয়সে তারা ছোকরা বটে, কিন্তু জয়ন্তবাবুর

হাতে পড়ে সবাই খুব চালাক হয়ে উঠেছে। তাদের দিয়ে জয়ন্তবাবু এখন অনেক কাজ পান—তারা প্রত্যেকেই নাকি এক-একটি ছোট্ট-খাটো গোয়েন্দা! ভোঁদার পিছু নেবে তাদেরই কেউ। আমরা এখন জয়ন্তবাবুর জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ির উপরে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কুমার বললে, 'নিশ্চয় জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু আসছেন! রামহরি, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, চায়ের ব্যবস্থা কর-গে যাও।'

—'চা? তা দু-এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না।' বলতে বলতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একমুখ হাসি নিয়ে স্বয়ং অবলা এবং তার পিছনে পিছনে ভোঁদা। তাদের দুজনেরই হাতে রিভলবার।

বিমল, কুমার ও রামহরির মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, তাদের চোখের সামনে যেন প্রেত-মূর্তির আবির্ভাব হয়েছে।

খিলখিল করে মেয়ে-হাসি হেসে অবলা বললে, 'হে গর্দভরাজ বিমল, আমাদের দেখে তুমি কি বড়ই আশ্চর্য হয়েছ? কেন বল দেখি? তোমরা তো আমাকেই খুঁজছিলে। সেইজন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম।'

হতভম্ব বিমলের মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরুলো না, অবলার দুর্জয় সাহস দেখে বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে গেল।

অবলা রিভলবারটা বাগিয়ে ধরে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'ভোঁদা, তুই ওপাশে গিয়ে দাঁড়া। এরা কেউ একটা আঙুল নাড়লেই গুলি করবি।······বিমল, এখনো তোমার বিশ্বাস বোধহয় যে, সূক্ষ্মবুদ্ধি আর বিচারশক্তিতে তুমি হচ্ছ একটি অদ্বিতীয় জীব? আর আমি হচ্ছি একটি আস্ত হাঁদারাম? যে-ঘরের জানলা ভাঙা সে-ঘরে ভোঁদাকে বন্ধ করার মানেই যে তাকে ছেড়ে দেওয়া, এ-কথাটাও আমি বুঝতে পারব না? তোমরা ভেবেছিলে ভোঁদার পিছু নিলেই আমার ঠিকানা জানতে পারবে? বেশ, এই তো আমি নিজেই এসেছি, আমাকে নিয়ে কী করতে চাও, বল।'

কুমার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'তুমি চোর, তুমি ডাকাত, তুমি খুনে। তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে চাই।'

—'ওরে বাপ রে, কী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই তো আমি হাজির, গ্রেপ্তার করবার হুকুম হোক্।'

বিমল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কুমার অত্যন্ত অসহায়ের মত অবলার ও ভোঁদার রিভলবারের দিকে তাকিয়ে দেখলে। রামহরি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কি বকতে লাগল।

অবলা বললে, 'আমাকে গ্রেপ্তার করবি? আস্পর্ধার কথা শোনো একবার! তোদের মত চুনোপুঁটির হাতে ধরা পড়বার জন্যে আমার জন্ম হয়নি, বুঝেছিস? পদে পদে আমার কাছে নাকাল হচ্ছিস, তবু তোদের চৈতন্য হল না?'

ভোঁদা বললে, 'কর্তা, মিছে কথা বলে কাজ নেই, যা করতে এসেছেন চটপট সেরে ফেলুন।'

অবলা বললে, 'কেন রে ভোঁদা, তাড়াতাড়ির দরকার কি? জয়ন্ত আর মানিক তাদের চ্যালা-চামুণ্ডা নিয়ে আমাদের খালি-বাসার ওপরে যত খুশি পাহারা দিক না, আমরা তো সেখানে নেই—সেখানে আর ফিরেও যাব না, তবে তোর ভয় কিসের বল্ দেখি?'

ভোঁদা বললে, 'ওরা যদি পুলিসে খবর দেয়?'

—'যদি নয় রে ভোঁদা, নিশ্চয় এতক্ষণে পুলিস খবর পেয়েছে। কিন্তু খবর পেয়েই তো মোট্‌কা গোয়েন্দা সুন্দরলাল আমাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসতে পারবে না। ইংরেজদের যতই দোষ থাক্, তাদের আইন ভারী চমৎকার রে। সুন্দরকে আগে তার কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, তারপর আমাদের এই নতুন বাসা 'সার্চ' করবার জন্যে আলাদা হুকুম নিতে হবে। কাজে-কাজেই আমি এখন খানিকক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে বিমলের সঙ্গে গল্প করতে পারি—কি বল বিমলভায়া, তাই নয় কি? তুমি বোধ করি ভাবছ যে, জয়ন্তের

ঈগল-চক্ষুর পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে কেমন করে আমি এখানে এলুম ? গুপ্তদ্বার ভায়া, গুপ্তদ্বার ! জয়ন্ত জানে না, আমার নতুন বাসার পিছন দিয়ে পালাবার জন্যে একটা লুকানো পথ আছে !'

বিমল এতক্ষণ পরে বললে, 'অবলা, তোমার সাহস দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।'

চেয়ারে বসে পা নাচাতে নাচাতে অবলা বললে, 'হুঁ, তোমার বিস্মিত হওয়াই উচিত! সাহস তো আমার আছেই, তার উপরে আছে মৌলিকতা ! আমি কাজ করি নতুন পদ্ধতিতে—অন্য লোক যেখানে দেখে অসম্ভব সব বাধা, আমি সেখানে অনায়াসেই সহজ পথ আবিষ্কার করতে পারি। দেখ না, নইলে সোজা লম্বা না দিয়ে আজ কি আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসতে পারতুম ? কি বিমল, মাঝে মাঝে আড়চোখে ঐ টেবিলটার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ বল দেখি ? ওর কোন টানায় রিভলবার-টিভলভার কিছু আছে বুঝি ? ভাবছ, একটু ফাঁক পেলেই ঐদিকে হাত বাড়াবে ? কিন্তু ও-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো, ফাঁক তুমি পাবে না—নড়েছ কি গুলি করেছি !··· হুঁ, ভালোকথা ! ঐ টেবিলের টানায় সেই কণ্ঠহারটা তুমি লুকিয়ে রাখোনি তো ?'

বিমল বললে, 'কণ্ঠহার আমি সুন্দরবাবুর হাতে দিয়েছি।'

—'কখন ? কাল রাত্রে ? আমার হাত থেকে ঠ্যাঙানি খাবার পরও সুন্দর এখানে এসে কণ্ঠহার নিয়ে গেছে ?'

—'হুঁ।'

—'আমি এ-কথা বিশ্বাস করি না। সে-অবস্থায় কণ্ঠহার নিয়ে যাবার সাহস নিশ্চয় তার হয়নি। আর অত রাত্রে হার-ছড়া হাত-ছাড়া করবে, তুমিও এমন বোকা নও।······ভোঁদা, এদের ওপরে আমি নজর রাখছি, তুই টেবিলের টানাগুলো খুলে ছাখ্ তো !'

ভোঁদা হুকুমমত কাজ করলে। কোন টানাই চাবি-বন্ধ ছিল না। সেগুলো হাতড়ে একটা রিভলবার বের করে নিয়ে সে বললে,

'এখানে কণ্ঠহার নেই, কিন্তু এটা ছিল।'

—'রিভলবার ? আমি আগেই জানতুম, বিমলের হাত ওটা নেবার জন্যে নিশ্‌পিশ্‌ করছে ! কিন্তু বাপু, তুমি কার পাল্লায় পড়েছ, জানো তো ? এখন যা চাই, বার কর দেখি ! কোথায় সেই কণ্ঠহার ?'

—'সুন্দরবাবুর কাছে।'

—আবার ধাপ্পা ? সাবধান বিমল, আগুন নিয়ে খেলা করো না। ঐ কণ্ঠহারের জন্যে আমি প্রাণ পর্যন্ত পণ করেছি, এখানে আমি এত বিপদ মাথায় নিয়ে ছেলেখেলা করতে আসিনি ! যদি দরকার হয়, এখনি তোমাদের তিনজনকে খুন করেও আমি কণ্ঠহার নিয়ে যাব।'

বিমল অবহেলা-ভরে বললে, 'খুন করতে তোমার যে হাত কাঁপে না, তা আমি জানি। এখনো আমার গলায় দড়ির দাগ মিলোয়নি।'

সকৌতুকে অবলা হাসতে লাগল এবং সে হাসির সঙ্গে নীরবে যোগ দিলে যেন তার একটিমাত্র চক্ষুও। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'সেবারে দৈবগতিকে গলার দড়িকে ফাঁকি দিয়েছ বলে মনে করো না যেন, এবারেও আমার হাতের রিভলবারকে ফাঁকি দিতে পারবে ! আমি এখানে এসেছি কণ্ঠহার নিয়ে যাবার জন্যে।'

বিমল বললে 'কিন্তু আমার কথা তো শুনলে। কণ্ঠহার আমার কাছে নেই।'

অবলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভোঁদা, তোর রিভলবারটাও আমাকে দে। এই আমি তু'হাতে তুটো রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, তুই আগে বিমল আর কুমারের জামাকাপড়গুলো ভালো করে খুঁজে ছাখ্‌ !'

হঠাৎ বাইরের রাস্তা থেকে কে খুব জোরে তিনবার শিস্‌ দিলে।

অবলা ও ভোঁদা তুজনেই চমকে উঠল !

ভোঁদা সভয়ে বললে, 'মোনা শিস্‌ দিলে ! পুলিস আসছে !'

—'অ্যাঃ, আমার হিসেব গুলিয়ে গেল ? পুলিস কি করে এত

শীঘ্র খবর পেলে?'—বলতে বলতে অবলা একলাফে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে ভোঁদাও। পরমুহূর্তে তারা অদৃশ্য এবং সিঁড়ির উপরে দ্রুত পদশব্দ!

বিমলও একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'শীঘ্র এস কুমার! অবলাকে যদি ধরতে হয় তবে আজকেই ধরতে হবে!'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বন্যা

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতেই বিমল ও কুমার শুনতে পেলে, একখানা মোটরগাড়ি ছোটার আওয়াজ।

মানিক বললে, 'অবলা আবার ভাগল!'

বিমল ছুটে সদর দরজা থেকে বেরিয়েই ডানদিকে তাকিয়ে দেখলে, একখানা লাল রঙের মোটর যেন ঝড়ো হাওয়ার আগে উড়ে চলেছে!

বাঁ-দিকেও গাড়ির শব্দ শুনে তারা ফিরে তাকালে। আর একখানা মোটর ঠিক সেইখানেই এসে থামল এবং গাড়ির হুইল্ ছেড়ে নিচে লাফিয়ে পড়ল জয়ন্ত।

তাকে কোন কথা বলবার সময় না দিয়ে বিমল বললে, 'ঐ লালগাড়িতে অবলা পালাচ্ছে!'

আর কিছু বলতে হল না। জয়ন্ত আবার এক লাফে ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গে বিমল ও কুমারও গাড়ির ভিতরে উঠে পড়ল। মানিকও সেখানে ছিল। গাড়ি ছুটল তীরবেগে।

বিমল বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি কেমন করে অবলার খবর পেলেন?'

গাড়ি চালাতে চালাতে সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে জয়ন্ত বললে, 'ভাগ্যিস আমার এক ছোকরাকে এইখানে পাহারায় রেখে গিয়েছিলুম! সেই-ই আমাকে ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছে!'

মানিক বললে, 'উঃ, কী জোরে অবলাদের গাড়ি ছুটছে! অ্যাক্সিডেন্ট্ হল বলে!'

কিন্তু তাদের, না অবলাদের গাড়ি—কাদের গাড়ি ছুটছে বেশী

বেগে ? দুখানা গাড়িই যেন পাগলা হয়ে জনাকীর্ণ রাজপথে বিষম বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করলে। প্রথম গাড়িখানা এড়াতে না এড়াতেই দ্বিতীয় গাড়িখানা পথিকদের উপরে এসে পড়ে হুড়মুড় করে! কেউ পথের উপরে আছাড় খেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, কেউ ভয়ে চিৎকার করে, কেউ রেগে গালাগালি দেয়, বিস্মিত কুকুররা ঘেউ-ঘেউ রবে প্রতিবাদ করতে থাকে, অন্যান্য গাড়িগুলো কোন-রকমে পাশ কাটিয়ে নিজেদের সামলে নেয়। এক জায়গায় একটা পাহারাওয়ালা লাল গাড়িখানাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবামাত্র মোটরের ভিতর থেকে হল রিভলবারের গুলিবৃষ্টি! পাহারাওয়ালা 'বাপ রে বাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠে লম্বা দৌড় মেরে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করলে।

দুখানা গাড়ির মধ্যে ব্যবধান ছিল যথেষ্ট। জয়ন্ত অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যবধান কমাতে পারলে না। সে তিক্তস্বরে বললে, 'ও গাড়িখানাকে যদি আরো একটু কাছে পাই, তাহলে গুলি করে ওর 'টায়ার' ছ্যাঁদা করে দিতে পারি।'

লালগাড়ি একটা তেমাথায় গিয়ে হঠাৎ মোড় ফিরে অদৃশ্য হল।

কয়েক মুহূর্ত পরে জয়ন্তও মোড় ফিরে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'দেখুন বিমলবাবু! মোড় ফিরেই আমরা অবলাদের কত কাছে এসে পড়লুম!'

সকলে দেখলে সত্যি-সত্যিই দুখানা গাড়ির মধ্যে ব্যবধান অনেকটা কমে গিয়েছে।

বিমল উত্তেজিত ভাবে বললে, 'তার মানে হচ্ছে, মোড় ফিরে আমাদের চোখের আড়ালে এসেই অবলাদের গাড়ি নিশ্চয় একবার থেমে দাঁড়িয়েছিল!'

কুমার বললে, 'আর সঙ্গে সঙ্গে অবলাও গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়েছে। খাসা ফন্দি! আমরা ছুটব লালগাড়ির পিছনে, আর অবলা দেবে সোজা লম্বা!'

বিমল বললে, 'আর বাসায় ফিরে গর্দভরাজ বিমলের কথা ভেবে হেসে লুটিয়ে পড়বে !'

জয়ন্ত বললে, 'অবলা যে পালিয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সে গেল কোন্ দিকে ? ডাইনে তো একটা সরু গলি দেখছি !' বলেই সে নিজের গাড়ি থামিয়ে ফেললে।

বিমল গলির মোড়ের একটা দোকানের দিকে তাকিয়ে হাঁকলে, 'ওহে দোকানী, এখুনি একখানা লালগাড়ি এখানে দাঁড়িয়েছিল ?'

—'হ্যাঁ বাবু ! সর্বনেশে গাড়ি ! যেন তুফান মেল ! আপনারাও তো কম যান না দেখছি ! আজ কি শহরের রাস্তায় মোটরের রেস চলেছে ?'

বিমল অধীর স্বরে বললে, 'লালগাড়ি থেকে কেউ এখানে নেমেছে ?'

—'হ্যাঁ ! মস্ত লম্বা একটা জোয়ান লোক গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ঐ গলির ভেতরে ছুটে চলে গেল !'

ততক্ষণে জয়ন্তের গাড়ি থেকেও সবাই নিচে নেমে পড়েছে !

কুমার বললে, 'দোকানী, এ গলিটা দিয়ে বেরুনো যায় ?'

—'না বাবু !'

জয়ন্ত গলির দিকে ছুটল।

বিমল বললে, 'সাবধান জয়ন্তবাবু ! রিভলবারটা বার করে গলির ভেতরে ঢুকুন। অবলা সশস্ত্র !'

মানিক বললে, 'আমিও রিভলবার এনেছি। আপনারা ?'

—'আমরা নিরস্ত্র।'

—'তাহলে আপনারা এইখানেই অপেক্ষা করুন।'

—'বলেন কি ! শত্রুর রিভলবারের ভয়ে পশ্চাৎপদ হবার মতন বুদ্ধিমান আমরা নই ! চলুন—আর দেরি নয় !'

সকলে অতি সতর্কভাবে আশেপাশে আনাচে-কানাচে তাকাতে তাকাতে এগুতে লাগল। সেই সাপের মতন পাকখাওয়া গলিটা প্রায় দেড়-শো ফুট লম্বা। দু-তিনজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল,

একজন ঢ্যাঙা লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গলির ভিতর দিকে চলে গিয়েছে।

কিন্তু সারা গলি খুঁজেও অবলার কোন পাত্তাই মিলল না।

মানিক সন্দেহ প্রকাশ করলে, 'এ গলির ভেতরেও হয়তো অবলার কোন আড্ডা আছে।'

কুমার বললে, 'অসম্ভব নয়। কিংবা সে কোন অচেনা বাড়ির ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে আছে!'

কুমারের কথা শেষ হতে-না-হতেই একখানা বাড়ির মধ্যে উঠল মেয়ে-পুরুষ নানা কণ্ঠে বিষম গণ্ডগোল:—'ওমা কি হবে গো!' 'পুলিস, পুলিস!'—'ডাকাত, গুণ্ডা!'

জয়ন্ত বললে, 'গোলমালটা আসছে ঐ বাড়ির ভেতর থেকে! নিশ্চয় ওখানে অবলার আবির্ভাব হয়েছে!'

সকলে দৌড়ে একখানা তেতলা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

উঠানের পাশে একতলার দালানে তিন-চারজন মেয়ে ও দুজন পুরুষ দাঁড়িয়ে ভীত, উত্তেজিত স্বরে ক্রমাগত চীৎকার করছে!

বিমল বললে, 'ব্যাপার কি, ব্যাপার কি?'

একজন উত্তর দিলে, 'গুণ্ডা মশাই, ডাকাত। দু-হাতে তার দুটো পিস্তল!'

—'কোথায় সে?'

'তেতলার সিঁড়ি দিয়ে ছাদের ওপরে উঠেছে!'

—তেতলার সিঁড়ির সার দেখা যাচ্ছিল। সর্বাগ্রে বিমল, তার পিছনে আর সবাই সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠতে লাগল।

একেবারে তেতলার ছাদে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই।

জয়ন্ত গলির দিকে ছাদের শেষে ছুটে গিয়ে মুখ বাড়ালে। এবং সেই মুহূর্তেই দেখলে, ছাদ থেকে বৃষ্টির জল বেরুবার যে লোহার পাইপটা নিচে পর্যন্ত চলে গিয়েছে, তার শেষ-প্রান্ত ত্যাগ করে অবলা আবার নেমে পড়ল গলির মধ্যেই!

গলি ভরে গিয়েছে তখন কৌতুহলী জনতায়। জন-কয় লোক

অবলার দিকে এগিয়ে আসতেই সে ফস্ করে বার করলে রিভলবার ! একে তার প্রকাণ্ড মূর্তি দারুণ ক্রোধে ফুলে আরো বড় হয়ে উঠেছে, তার উপরে আবার মারাত্মক রিভলবার আবির্ভাবে জনতার সাহস একেবারে উপে গেল—যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। দুই-তিন সেকেণ্ডেই পথ সাফ ! অবলা আবার বড় রাস্তার দিকে দৌড় দিলে।

ততক্ষণে বিমল, জয়ন্ত, কুমার ও মানিক আবার গলিতে নেমে এসেছে।

গলির মুখেই ছিল জয়ন্তের মোটরখানা। অবলা লাফ মেরে তার ভিতরে গিয়ে বসল।

জয়ন্ত চীৎকার করলে, 'পাক্ড়ো, পাক্ড়ো !'

আর পাক্ড়ো ! গাড়ি অদৃশ্য !

তারাও বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

জয়ন্ত প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগল, 'ট্যাক্সি ! ট্যাক্সি !'

ট্যাক্সি নেই ! কিন্তু একখানা বড় ফোর্ড গাড়ির দেখা পাওয়া গেল।

বিমল রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'দিকে দুই হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'ড্রাইভার, গাড়ি থামাও !'

গাড়ি দাঁড়াল ! ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা বাবু বিরক্ত স্বরে বললে, 'কে আপনারা ? আমার গাড়ি থামালেন কেন ?'

তিনি কোন জবাব পেলেন না। বিমল, কুমার ও মানিক বিনা-বাক্যব্যয়ে গাড়ির দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে বসে আসল মালিককে একেবারে কোণ-ঠাসা করে ফেললে।

জয়ন্ত ড্রাইভারের পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করে বললে, 'চালাও গাড়ি ! খুব জোর্‌সে !'

ড্রাইভার অসহায় ভাবে ফিরে তার মনিবের মুখের পানে তাকালে !

জয়ন্ত পকেট থেকে রিভলবার বার করে বললে, 'আমার হাতে কি, দেখছ ?'

ড্রাইভার দেখেই চমকে উঠল। আর মনিবের হুকুমের দরকার হল না। সে প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে দিলে।

তখন সামনের দিকে অবলার স্বহস্তে চালিত জয়ন্তের গাড়িখানাকে আর দেখাও যাচ্ছিল না।

কুমার বললে, 'বিমল, আর অবলার আশা ছেড়ে দাও। সে খালি দুর্দান্ত সুকৌশলী সুচতুর নয়, ভাগ্যদেবীও তার প্রতি সদয়।'

মানিক বললে, 'এই তো আমরা স্ট্রাণ্ড রোডে এসে পড়লুম। এর পরেই গঙ্গার ধার। অবলা কোন্ দিকে গিয়েছে জানতে হলে আমাদের নামতে হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু মোড়ের মাথায় অত ভিড় কেন ? একখানা লরির পাশে পড়ে রয়েছে একখানা ভাঙা মোটর!' অ্যাক্সিডেন্ট্ নাকি ? আরে, আরে, এ যে আমারই গাড়ি দেখছি ! কিন্তু—'

এক এক লাফে সবাই আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

হ্যাঁ, এখানা জয়ন্তেরই গাড়ি বটে ! তার এক অংশ লরির সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বললে, 'লরির ড্রাইভারের কোন দোষ নেই মশায় ! মোটরখানা যে চালাচ্ছিল নিশ্চয় সে পাগল ! কিন্তু খুব তার পরমায়ুর জোর, আশ্চর্য-রকম বেঁচে গিয়েছে ! তার মাথা ফেটে গিয়েছে বটে—'

বাধা দিয়ে বিমল বললে, 'কিন্তু সে গেল কোথায় ?'

—'গঙ্গার দিকে তীরের মত ছুটে পালালো।'

সেখান থেকেই গঙ্গা দেখা যাচ্ছিল। তারা আর কিছু শোনবার জন্যে দাঁড়াল না—প্রচণ্ড বেগে দৌড় দিলে গঙ্গার দিকে।

এই তো গঙ্গার ধার ! কিন্তু কোথায় অবলা ? ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড়, কিন্তু তাদের মধ্যে অবলা নেই।

তারা সকলকে প্রশ্ন করতে লাগল। একজন বললে, 'হ্যাঁ মশাই, একটা রক্তমাখা লোককে দেখেছি বটে! সে তাড়াতাড়ি ঘাটের সিঁড়ি বয়ে জলে গিয়ে পড়ল···ঐ দেখুন, ঐ সে সাঁতার কাটছে!'

সকলে আগ্রহ-ভরে দেখলে, তীর থেকে খানিক দূরে একটা লোক সাঁতার কেটে বেগে এগিয়ে চলেছে!

বিমল চীৎকার করে বললে, 'শীগগির একখানা নৌকা ভাড়া কর।'

দুর্ভাগ্যক্রমে ভাড়া যাবার মত কোন নৌকাই পাওয়া গেল না।
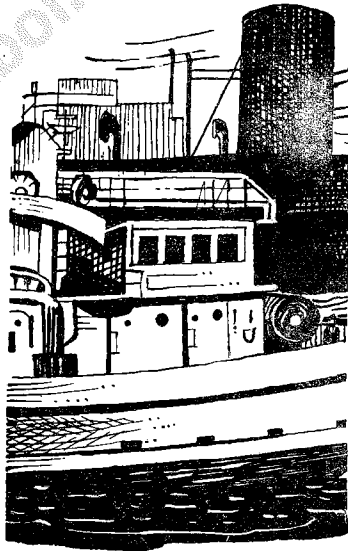
জয়ন্ত মালকোঁচা মেরে বললে, 'তাহলে আমাদেরই সাঁতার কাটতে হবে!'

একজন লোক শুনতে পেয়ে বললে, 'এখন সাঁতার কাটবেন কি মশাই? দেখছেন না, জল থেকে সবাই তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসছে?'

'কেন?'

—'এখনি বান ডাকবে। আজ খুব জোর বান আসবার কথা। আসবে কি—ঐ বান এসেছে।'

চারিদিকে চীৎকার উঠল—'বান, বান!' 'সাবধান!' 'সবাই
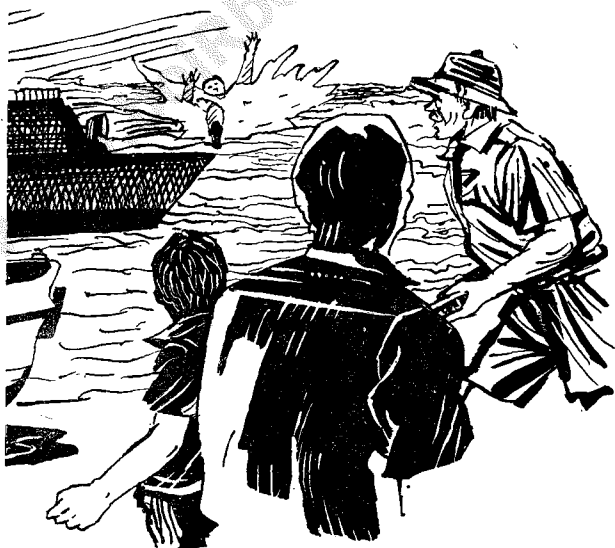
ওপরে উঠে এস—সবাই ওপরে উঠে এস !'

তারপরেই শোনা গেল চতুর্দিক পরিপূর্ণ করে সমুদ্রগর্জনের মতন সুগম্ভীর এক জল-কোলাহল ! দেখা গেল, সাগর-তরঙ্গের মতই উত্তাল এক সুদীর্ঘ তরঙ্গ-রেখা প্রায় সারা গঙ্গা জুড়ে পাকের পর পাক খেতে খেতে ছুটে আসছে—এবং তারই মধ্যে অসংখ্য ক্রুদ্ধ অজগরের মত ঢেউ-এর দল শূন্যে ছোবল আর ছোবল মারছে ! ফেনায়িত গঙ্গা যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগল ।

বানের কবলে পড়ে অবলা সকলের চোখের আড়ালে চলে গেল ।

বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক একদৃষ্টিতে বন্যা-তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

বান যখন বহু দূরে চলে গেল, বিমল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কুমার, এত করেও অবলাকে ধরতে পারলুম না—শেষটা বান হল আমাদের প্রতিবাদী ! আমার বিশ্বাস, অবলা মরবে না !'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ বিমলবাবু, আমারও সেই বিশ্বাস ! এই হল আমার প্রথম পরাজয় !'

বিমল ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে বারংবার এত বিপদেও কখনো পড়িনি, আর শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে আমাকে বোকা বানিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালাতেও কেউ পারেনি ! অদ্ভুত লোক ঐ অবলা !'

কুমার বললে, 'অবলা অদ্ভুত লোক হতে পারে, কিন্তু জিতেছি আমরাই । বিমল, ভুলে যেও না, জেরিণার কণ্ঠহার আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি !'

বিমল বললে, 'হুঁ, ঐটুকুই যা সান্ত্বনা !'

অবশিষ্ট

এক রাত্রের বিভীষিকা

এক

জায়গাটির নাম নাই-বা শুনলে! আমার সঙ্গীটির আসল নামও বলব না, কারণ তাঁর আপত্তি আছে। কারণ বোধ হয়, এই নৈশ নাটকে আমাদের কেউই বীরের ভূমিকায় অভিনয় করেনি। তবে এইটুকু শুনে রাখো, আমার সঙ্গীটি হচ্ছেন কলকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার। আমি তাঁকে সুবোধ বলে ডাকব।

এত লুকোচুরি কেন জানো? গল্পটি অমূলক নয়।

অনেকদিন আগেকার কথা। সুবোধ তখন সবে ডাক্তারি পাস করেছে, কিন্তু কোমর বেঁধে রোগী-বধকার্যে নিযুক্ত হয়নি।

ছেলেবেলা থেকেই ভাঙা-চোরা সেকেলে মন্দির প্রভৃতি দেখবার শখ ছিল আমার অত্যন্ত। ভারতবাসীর অধিকাংশ নিজস্বতা খুঁজতে গেলে এই সব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সেদিনও আমরা দুজনে একটি পুরানো মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। তার গর্ভ থেকে দেবতার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তার গা থেকে কারুকার্যের সৌন্দর্য এখনো কেউ মুছে দিতে পারেনি। সেই সব কারিকুরি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল আমার নয়ন-মন।

কিন্তু সুবোধ হল নিরাশ। বিরক্তস্বরে বললে, 'বনজঙ্গল মাঠের ভেতর দিয়ে পথে-বিপথে সাত মাইল পেরিয়ে এই দেখাতে আমাকে এখানে নিয়ে এলে? এ যে পর্বতের মুষিক-প্রসব!'

আমি বললুম, 'মেডিকেল কলেজে মড়ার সঙ্গে বাস করে করে

তোমার মনও মরে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সুবোধ! নইলে এমন শিল্প-চাতুরী দেখবার পরেও মুখ-ভার করতে পারতে না!'

সুবোধ বললে, 'আরে রেখে দাও তোমার শিল্প-চাতুরী! রোদ পড়ে আসছে, সামনে আছে সাত মাইল দুর্গম পথ। এ-সময়ে শিল্প-চাতুরী নিয়ে তর্ক না করে বাসার দিকে পা চালাবার চেষ্টা কর। পথে আসতে আসতে শুনেছ তো, এখানকার বনে-জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের অভাব নেই? তারা শিল্প-রসিকের মর্যাদা রাখে না।'

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম। সূর্যের ছুটি নেবার সময় হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেক পরেই অন্ধকারের কালো রাজত্ব শুরু হবে। শুনেছি এ-অঞ্চলে মাঝে মাঝে ডাকাতের ভয়ও হয়।

সুবোধ আগেই অগ্রসর হল। আমিও তাকে অনুসরণ করলুম।

দুই

কিন্তু বরাত ভালো ছিল না।

একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খোলা মাঠের উপরে পড়েই দেখলুম, আকাশের একপ্রান্ত আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে কালির মতন কালো মেঘে মেঘে।

সেইদিকে আঙুল তুলে সুবোধ বললে, 'দেখেছ?'

—'হুঁ, দেখেছি। মিশকালো মেঘ, ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা।'

সুবোধ বললে, 'মাঠের ওপর দিয়ে আমাদের প্রায় দু-মাইল হাঁটতে হবে। আসবার সময় দেখেছি, মাঠের ও-পাশে তিন-চারখানা কুঁড়েঘর আছে। কিন্তু সেখানে যাবার অনেক আগেই ঝড় আমাদের নাগাল ধরে ফেলবে। এখন উপায়?'

—'উপায় খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেওয়া!' বলেই আমি প্রায় ছুটতে শুরু করলুম।

কিন্তু মাইল-খানেক এগুতে-না-এগুতেই মেঘের দল এগিয়ে এল একেবারে আমাদের মাথার উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে কি ঝড়ের তোড়! সুবোধের মাথায় ছিল টুপি, ঝড়ের ছোঁয়া পেয়েই সে পক্ষী-ধর্ম অবলম্বন করে ফুড়ুক্ করে আকাশে উড়ে গেল। চারিধারে হু-হু গোঁ-গোঁ গর্জন, পিছন থেকে ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা এবং রাশি রাশি কাঁকর ছুটে এসে আমাদের গায়ে বিঁধতে লাগল, ছররা গুলির মত। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মেঘের কালিমা মিলে আমাদের দৃষ্টি করে দিলে প্রায় অন্ধের মত। ভাগ্যে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, নইলে নিশ্চয়ই আমরা পথ হারিয়ে ফেলতুম।

কোনরকমে মাঠ পার হলুম বটে, কিন্তু গায়ে পড়ল বড় বড় কয় ফোঁটা জল।

সুবোধ বললে, 'ওহে, এইবার বৃষ্টির পালা আরম্ভ হবে। সামনে একটা ঘরের মতন কি দেখা যাচ্ছে, ঐদিকে চল—ঐদিকে চল!'

হ্যাঁ, পাশাপাশি দু-তিনখানা কুঁড়েঘরই বটে। একটা দাওয়ার উপরে উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই ঝম্‌ঝম্ করে নামল মুষলধারে বৃষ্টি।

খানিকক্ষণ ধরে হাঁপ ছাড়বার পর সুবোধ তেঁতো হাসি হেসে বললে, 'বন্ধুবর, শিল্প-চাতুরী এখন কেমন লাগছে?'

—মন্দ কি?

ঝর-ঝর বরষা,
নাহি কোন ভরসা।

এও একটা নূতনত্ব ভেবে অনায়াসেই উপভোগ করা যেতে পারে।'

—'ভবিষ্যতে তোমার ভাবুকতার ফাঁদে আর কখনো পড়ব না। এখান থেকে আমাদের বাসা এখনো চার মাইলের কম হবে না। এই বৃষ্টি আর অন্ধকারে সেখানে যাওয়াও অসম্ভব, এখানে থাকাও অসম্ভব।'

—'থাকা অসম্ভব কেন?'

—'সারা রাত উপোস করব? হিন্দু বিধবার মত উপোস করবার শক্তি আমার নেই। আমার এত ক্ষিদে পেয়েছে যে, আমি যদি বাঘ হতুম, তোমাকে ধরেই গপ্ করে খেয়ে ফেলতুম, বন্ধু বলে মানতুম না।'

ফিরে দেখলুম, আমাদের পিছনে একটা দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর লাইন দেখা যাচ্ছে। আমি সেই দরজায় ধাক্কা মারলুম। দরজাটা খুলে গেল। হারিকেন লণ্ঠন হাতে করে একজন স্ত্রীলোক আমাদের দেখেই বিস্মিতভাবে দু-পা পিছিয়ে গেল।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী বিস্মিত হলুম আমরা।

বাবা, এত বৃহৎ স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখিনি! যেমন লম্বায়,

তেমনি চওড়ায়! দেখলেই তাকে পালোয়ানের মতন জোয়ান বলে মনে হয়। এবং কি কালো আর কি কুৎসিত! বলতে কি, সে স্ত্রীলোক হলেও তাকে দেখে আমার বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল।

স্ত্রীলোকটা ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বললে, 'তোমরা কে গো বাবুজী?'

—'আমরা এদিকে বেড়াতে এসেছিলুম গো। ফেরবার পথে এই ঝড়-বৃষ্টি! আমাদের বাসা এখান থেকে অনেক দূরে। আজ রাতটা এখানে থাকবার ঠাঁই হবে?'

সে বললে, 'বাবুজী, আমরা ভারী গরিব। এই নোংরা ঘরে তোমরা থাকতে পারবে কি?'

—'খুব পারব গো, খুব পারব। অবিশ্যি কাল সকালে তোমাকে ভালো করে বখশিশ না দিয়ে যাব না।'

স্ত্রীলোকটা খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তারপর বললে, 'আচ্ছা, এস।' আমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বললে, 'আমার সঙ্গে চল।'

চললুম। সে-ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে স্ত্রীলোকটা বললে, 'বাবুজী, এই ঘরে তোমাদের থাকতে হবে।'

চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। মাঝারি আকারের ঘর। মেঝেময় ছাগলের বিষ্ঠা, মেটে দেওয়াল, উপরে খড়ের ছাউনি। একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটা সস্তা দামের আলমারি দাঁড় করানো রয়েছে, কিন্তু তার পাল্লায় কাঁচ নেই এবং ভিতরেও তাক নেই। আর একদিকে একখানা দড়ির খাটিয়া। সারাঘরে এমন বোঁটকা দুর্গন্ধ যে নাকে কাপড় চাপা দেবার ইচ্ছা হল।

স্ত্রীলোকটা বললে, 'বাবুজী, রাতে তোমরা খাবে কি?'

সুবোধ বললে, 'আমিও তোমাকে ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম! রাতে খাব কি? তোমাদের বাড়িতে খাবারটাবার কিছু নেই?'

—'দুটি চাল আছে, আর কিছু নেই। বাবুজী, আমরা বড় গরিব।'

সুবোধ ম্রিয়মাণ ক্ষীণস্বরে বললে, 'বেশ, আজ ঐ চালেই আমাদের চলবে।'

স্ত্রীলোকটা বললে, 'বাবুজী, তোমরা মোরগ খাও?'

—'মোরগ? অর্থাৎ ফাউল? নিশ্চয়ই খাই।'

—'আমার মোরগ আছে, বাবুজী!'

সুবোধ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললে, 'য়্যাঃ, তোমার মোরগ আছে? তবে কে বলে তুমি গরিব? মোরগ তো রাজভোগ! আচ্ছা, এখন এই একটা টাকা নাও, কাল সকালে তোমাকে আরো তিন টাকা বখশিশ দিয়ে যাব।' বলেই সে ফস্ করে পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করলে।

স্ত্রীলোকটার দুই চোখ হঠাৎ জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল। তার সেই লোলুপ দৃষ্টির অনুসরণ করে দেখলুম, সুবোধ তার ব্যাগ খুলেছে এবং ব্যাগের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে কয়েকখানা নোট।

ঠিক সেই সময়ে দরজার কাছ থেকে কর্কশ হেঁড়ে গলায় কে বললে, 'মণিয়া, এরা কারা?'

চমকে ফিরে দেখি, দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে আর একখানা বীভৎস মুখ! কালো পাথরের থালার মতন গোল মুখে দুটো ভাঁটার মত চোখ, থ্যাব্ড়া নাক, ঝাঁটার মত খোঁচা খোঁচা গোঁফ এবং হিংস্র জন্তুর মত বড় বড় দাঁত! যেন মা-দুর্গার অসুর!

মণিয়া—অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোকটা তাড়াতাড়ি বললে, 'বাবুজীরা আজ এখানে থাকবে। চল, তোকে সব বলছি।'

তিন

সেই দুই অদ্ভুত ও ভয়াবহ মূর্তি অদৃশ্য হবার পর আমি বিরক্ত স্বরে বললুম, 'সুবোধ, এই স্ত্রীলোকটার সামনে কে তোমাকে ব্যাগ খুলতে বললে?'

—'কেন ভাই, কিছু অন্যায় হয়েছে নাকি?'

—'অন্যায় হয়েছে কিনা আজ রাতেই হয়তো বুঝতে পারব! একে তো এই অজানা জঙ্গুলে জায়গা, ঝড়-বাদলের রাত, আর আমাদের এই অসহায় অবস্থা, তার উপরে কৃতজ্ঞতার খাতির রেখেও বলতে হচ্ছে, আমাদের আশ্রয় দিয়েছে যারা তাদের চেহারা হচ্ছে দানব-দানবীর মত! রক্ষক শেষটা ভক্ষক হয়ে না দাঁড়ায়!

সুবোধ ভীতভাবে ফ্যাল্ফ্যাল্ করে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

খানিক পরেই দেখি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সেই দুশমনের মতন পুরুষটা। দরজার কাছেই ছিল হ্যারিকেন লণ্ঠনটা। তার ম্লান আলোতেও স্পষ্ট দেখলুম, লোকটার হাতে চক্চক্ করছে একখানা প্রায় একহাত লম্বা ছুরি—না, ছুরি না বলে তাকে ছোট তরবারি বললেই ঠিক হয়! লোকটা একবার আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী হাসি হাসলে, তারপর দাওয়া থেকে উঠানে নেমে অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

সুবোধও দেখেছিল। চোখ কপালে তুলে সে বললে, 'সর্বনাশ! এই রাতে অতবড় ছুরি নিয়ে ও কি করবে? ও আমাদের পানে তাকিয়ে অমন করে হাসলে কেন?'

পাশের ঘর থেকে স্ত্রী-পুরুষের গলার আওয়াজ এল।

আমি বললুম, 'আমরা এখানে এসে প্রথমে দেখেছিলুম

মণিয়াকে। তারপর দেখলুম আর একটা লোককে। এখন দেখছি এ বাড়িতে আরো পুরুষও আছে! তাদের চেহারাও বোধহয় কার্তিকের মতন নয়!'

সুবোধ ধপাস্ করে খাটিয়ার উপরে শুয়ে পড়ে বললে, 'এক মণিয়া-রাক্ষসী আক্রমণ করলেই আমরা দুজনেই হয়তো কাবু হয়ে পড়ব, তার উপরে আবার পুরুষ-সঙ্গীর দল! নাঃ, আমাদের আর কোনই আশা নেই!'

ঘণ্টা দুয়েক পরে মোটা লাল চালের ভাতের সঙ্গে এল গরম ফাউলের ঝোল। কিন্তু ফাউল খাবার জন্যে সুবোধ আর কোন আগ্রহই দেখালে না। তার মুখের ভাব দেখলে মনে পড়ে বলির পাঁঠার কথা। আমার নিজের মুখের ভাব কি রকম হয়েছিল, জানি না।

চার

রাতে শোবার আগে ঘরের দরজা ভিতর থেকে খুব সাবধানে বন্ধ করে দিলুম। হ্যারিকেনের লণ্ঠনটা সেই কাঁচ ও তাক-হীন আলমারির মাথায় এমনভাবে রেখে দিলুম, যাতে ঘরের সবটা দেখতে পাওয়া যায়।

সুবোধ বললে, 'এরা কি জাত, বোঝা গেল না! এরা মুরগি পোষে, মুরগি রাঁধে, কিন্তু এদের মুসলমান বলে মনে হচ্ছে না।'

খাটিয়ার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললুম, 'আমার বিশ্বাস, এরা সাঁওতাল কি ঐ রকম কোন বুনো জাত!'

সুবোধ ত্রস্ত স্বরে বললে, 'কি হে, ঘুমোবে নাকি? আমি কিন্তু সারারাতই জেগে বসে থাকব। এখানে ঘুম মানে মৃত্যু বা আত্মহত্যা।'

—'তুমি যদি পাহারা দিতে রাজী হও, তা হলে আমি আর জেগে মরি কেন?' বলেই চোখ মুদে ফেললুম।

বাইরে তখনো ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি হচ্ছে। থেকে থেকে গাছে গাছে ঝোড়ো হাওয়ার কান্নাও শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে শুনলুম একটা ছাগলও চিৎকার করছে প্রাণপণে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছি জানি না, কিন্তু হঠাৎ সুবোধের প্রচণ্ড ঠেলাঠেলির চোটে ভেঙে গেল আমার ঘুম।

ধড়মড় করে উঠে বসলুম, 'কি, কি, ব্যাপার কি?'

সুবোধ প্রায় কান্নার স্বরে বললে, 'বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা মারছে! তারা আসছে—তারা আসছে!'

—'কি বলছ? কারা আসছে?'

—'যারা আমাদের গলা কাটতে চায়! আর রক্ষে নেই।'

সভয়ে দরজার দিকে তাকালুম।

সুবোধ থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'ও-দরজায় নয়, অন্য কোন দরজায়! ঐ শোনো।'

সত্য, ঘটাঘট্ করে একটা দরজার শব্দ হল। শব্দটা জাগছে এই ঘরের ভিতরেই, অথচ এখানে একটা ছাড়া দরজা নেই!

সুবোধ কান পেতে শুনে বললে, 'শব্দটা আসছে যেন ঐ ভাঙা আলমারির পেছন থেকেই।'

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আলমারিটা একটু টেনে সরিয়ে তার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখলুম, সত্য-সত্যই আলমারির পিছনে রয়েছে আর একটা দরজা!

সুবোধ বললে, 'ভাই, আমরা পাকা ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি! ঐ দরজাটা লুকোবার জন্যেই ওখানে ওরা আলমারি রেখেছে!'

হাত বাড়িয়ে দেখলুম, সে-দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করবার কোন উপায় নেই।

বুঝলুম, একটু জোরে ধাক্কা মারলেই এই ভাঙা আলমারিটা এখনি উল্‌টে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে মেঝের উপরে। কিন্তু শত্রুরা জোরে ধাক্কা মারছে না কেন? আমাদের ঘুম ভেঙে যাবার ভয়ে? খুব সম্ভব তাই।

আলমারিটাকে আবার যথাস্থানে সরিয়ে রেখে তার গায়ে খাটিয়াখানা ঠেলে দিলুম। তারপর খাটিয়ায় বসে পড়ে ঘড়ি বার করে দেখলুম, রাত সাড়ে তিনটে।

পাঁচ

কিন্তু আমাদের প্রাণ এবং সুবোধের নোটগুলো এ-যাত্রা বেঁচে গেল, কারণ রাত্রে সন্দেহজনক আর কিছু ঘটল না।

সকালে ঘরের দরজা খুলেই দেখি, মণিয়া দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

সে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবুজী, রাতে ঘুম হয়েছিল তো ?'

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বললুম, 'সারারাত তোমরা যদি দরজা ঠেলাঠেলি কর, তাহলে ঘুম হয় কেমন করে ?'

মণিয়া আবার হেসে বললে, 'ও, বুনি বুঝি ওদিকের ভাঙা দরজাটা ঠেলেছিল ? হ্যাঁ বাবুজী, বুনির ঐ স্বভাব। ও দরজার খিল নেই, বুনি তা জানে। তার জ্বালাতেই তো দরজার সামনে আলমারিটা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

—'বুনি কে শুনি ?'

—'আমাদের বক্‌রী, বাবুজী !'

ছাগলী ! একটা ছাগলীর ভয়ে কাল রাতে আমরা—

হঠাৎ সুবোধ একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

উঠানের মাঝখানে রয়েছে একরাশ মুরগির পালক প্রভৃতি এবং তার পাশেই দেখা যাচ্ছে মস্ত একখানা একহাত লম্বা ছুরি।

তাহলে কাল রাতে সেই লোকটা এই ছুরিখানা নিয়ে বেরিয়েছিল মুরগি কাটবার জন্যেই ?

বিদেশ-বিভুঁই, ঝড়-বাদল, নিশুতি রাত, অচেনা মানুষের বিকট চেহারা, বৃহৎ ছুরি, লুকানো দরজা, ছাগলী বুনির গৃহপ্রবেশ-চেষ্টা প্রভৃতি একসঙ্গে মিলে আমাদের মনের ভিতরে যে ঘোরতর বিভীষিকার জগৎ সৃষ্টি করেছিল, সকালের সূর্যালোকে তা উড়ে গেল কুয়াশার মত।

নিজেদের মনে-মনে লজ্জাও যে হচ্ছিল না এমন কথা বলতে পারি না।

এবং অনুতাপও হচ্ছিল যথেষ্ট। হতে পারে মণিয়া আর তার সঙ্গীদের চেহারা অপ্সর-অপ্সরীদের মতন নয়। কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে গহন বনে আমাদের মতন অনাহুত অতিথিদের আশ্রয় ও আহার্য দিয়ে তারা যে যত্নাদরটা করেছে, তার মর্যাদা না দিয়ে আমরা যে তাদের উপরেই অকৃতজ্ঞের মতন হীন সন্দেহ করেছি, এই অপ্রিয় সত্যটাই আমাদের মনকে আঘাত দিতে লাগল বারংবার।

বলা বাহুল্য, সুবোধের অঙ্গীকৃত তিন টাকা বখশিশ পরিণত হল পঞ্চ মুদ্রায়। এই অভাবিত সৌভাগ্যে মণিয়ার কালো মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল মিষ্ট হাসির তরঙ্গ।

সাহিত্যিক
শরৎচন্দ্র

ভূমিকা

শরৎচন্দ্রের এই জীবনী লেখা হল অবালবৃদ্ধবনিতার উপযোগী করে।

শরৎচন্দ্রের এর চেয়ে বড় জীবনী লেখবার মালমসলা হাতে ছিল, কিন্তু প্রকাশক চেয়েছেন অল্পমূল্যের একখানি ছোট্ট জীবনচরিত প্রকাশ করতে, কাজেই বিস্তৃতভাবে কিছুই বলবার জায়গা হল না। পাঠকরা আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টাকে রেখাচিত্র বলেই গ্রহণ করবেন। এর মধ্যে বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মূর্তিটাই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। তাই মানুষ শরৎচন্দ্রের সাধারণ জীবনের আরো অনেক কথা ও কাহিনী জানা থাকলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সেগুলিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

যাঁরা নানা পত্র-পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের জীবন-কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে যেখানে সাহায্য পেয়েছি যথাস্থানেই উল্লেখ করেছি। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম।

এই সুযোগে দুটি কথা বলে নি'। প্রথম, এই জীবনীর ভিতরে ১৩২০ সালের 'যমুনা'য় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের আটটি রচনার নাম করা হয়েছে। কিন্তু তার উপরেও আর একটি গল্প বেরিয়েছিল, তার নাম 'আলো ও ছায়া'। দ্বিতীয়, শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশে প্রথমে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন যথাস্থানে তাঁদের নাম করা হয়েছে বটে, কিন্তু ভ্রমক্রমে তাঁদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করা হয়নি। তাঁরও নাম উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্রের পূর্বজীবন সম্বন্ধে যাঁদের কথার উপর নির্ভর করেছি, তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য কম নয়। সুতরাং বর্তমান আলোচনাতেও আমার অজ্ঞাতসারেই অল্পস্বল্প ভ্রম থেকে গিয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। ভ্রমগুলি কেউ দেখিয়ে দিলে ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টা করব। ছবিগুলি দিয়ে উপকার করেছেন 'বাতায়ন' সম্পাদক। তাঁকেও ধন্যবাদ। ইতি—

নিবেদক
হেমেন্দ্রকুমার রায়

কলিকাতা
২৩০।১, আপার চিৎপুর রোড
ফাল্গুন, ১৩৪৪

গাছ হঠাৎ জন্মায় না। জন্মের পরেও গাছের বাড় ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে সারালো জমির উপরে।

শরৎচন্দ্রও হঠাৎ বড় সাহিত্যিকরূপে জন্মগ্রহণ করেননি। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের জন্যে আগেকার সাহিত্যিকরা জমি তৈরি ও বীজ বপন করে গেছেন। আগে তারই একটু পরিচয় দি'।

পৃথিবীর সব দেশেই একশ্রেণীর সাহিত্য দেখা দিয়েছে যাকে বলে 'রোমান্টিক' সাহিত্য। বিলাতের স্যর ওয়াল্টার স্কটের, ফরাসী দেশের ভিক্টর হুগো ও আলেকজান্দার ডুমাসের এবং বাংলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস ঐ 'রোমান্টিক' সাহিত্যের অন্তর্গত।

ওঁদের উপন্যাসে অসাধারণ ঘটনার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ওঁরা যে-সব চরিত্রের ছবি এঁকেছেন, সাধারণত সেগুলি অতিরিক্ত রঙচঙে। ওঁরা যে অস্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তা নয়; কিন্তু ওঁরা প্রায়ই রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়ে চরিত্রগুলিকে দেখেছেন। তাই চরিত্রগুলির উপরে যে-রঙ পড়েছে তা তাদের স্বাভাবিক রঙ নয়।

পৃথিবীতে এখন যে-শ্রেণীর সাহিত্যের বেশি চলন তাকে বলে বাস্তব-সাহিত্য। বাংলাদেশে বিশেষভাবে এই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথ। যদিও বঙ্কিম-যুগে—অর্থাৎ বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ-প্রভাবের সময়ে 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরানীর হাট' রচনাকালে তিনিও 'রোমান্টিক' সাহিত্যকে অবলম্বন করেছিলেন।

বাস্তব-সাহিত্যের লেখকরা মানুষকে যেমন দেখেন তেমনি আঁকেন। তাঁরা অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী নন এবং অসাধারণ ঘোরালো

ঘটনারও উপরে বেশী ঝোঁক দেন না। রোজ আমরা যে-সংসারকে দেখি, তারই ছোটখাটো সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে সোজা ভাষায় সহজভাবে তাঁরা বড় বড় উপন্যাস লিখতে পারেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও আগে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রোমান্টিক' সাহিত্যের পূর্ণ-প্রতিপত্তির দিনেই, আর একজন বাঙালী লেখক বাস্তব-সাহিত্য রচনা করে নাম কিনেছিলেন। তাঁর নাম স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'স্বর্ণলতা' হচ্ছে বাংলা-সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত উপন্যাস।

ঘরোয়া সুখ-দুঃখের হুবহু ছবি আঁকার দরুন তারকনাথের যশ শরৎচন্দ্রের মতই হঠাৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'স্বর্ণলতা'র সংস্করণের পর সংস্করণ হতে থাকে। বঙ্কিম-যুগে আর কোন লেখকের বই এত কাটেনি।

'স্বর্ণলতা'র কাটতি দেখে বহু লেখক তারকনাথের নকল করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের অনুকরণ 'স্বর্ণলতা'র মতন সফল হয়নি, কারণ নকলকে কেউ আসলের দাম দেয় না।

তারকনাথ আরো কিছু লিখে গেছেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র বিস্তৃত ও শক্তি বড় ছিল না। বঙ্কিম-যুগে তাঁর প্রতিভা স্ফুলিঙ্গের মতই আমাদের চক্ষে পড়ে।

সেইজন্যেই আমরা বলেছি, বাংলাদেশে বিশেষভাবে বাস্তব-সাহিত্য এনেছেন রবীন্দ্রনাথই। ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে তাঁর বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বাস্তব-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিশক্তি তিনি বিস্তৃত করে তুলেছেন। কেবল নিত্য-দেখা সংসারকেই তিনি তুলে এনে আবার সাহিত্যের ভিতরে দেখাননি, তার সাহায্যে নব নব ভাব ও আদর্শকে খুঁজেছেন। তারকনাথ এ-সব পারেননি।

শরৎচন্দ্র যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলাদেশে সত্যিকার বড় আর কোন ঔপন্যাসিককেই দেখা যেত না। রবীন্দ্রনাথও কেবল উপন্যাস নিয়ে কোনদিনই নিযুক্ত থাকেননি।

কারণ তিনি কেবল ঔপন্যাসিক নন, একাধারে তিনি মহাকবি, নাট্যকার, গীতিকার, ছোটগল্প লেখক, সন্দর্ভকার ও সমালোচক এবং প্রত্যেক বিভাগেই নব নব রসের স্রষ্টা। হিসাব করলে দেখা যাবে, তাঁর নানাশ্রেণীর রচনার মধ্যে উপন্যাস খুব বেশী জায়গা জুড়ে নেই।

কাজেই বাস্তব-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বাংলার ঘরোয়া আলো-ছায়ার ছবি আঁকতে পারেন এবং কথাসাহিত্যের সাধনাই হবে যাঁর জীবনের প্রধান সাধনা, দেশের তখন এমন একজন লোকের দরকার হয়েছিল। দেশের সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তিনি একান্তভাবেই ঔপন্যাসিক।

শরৎচন্দ্রের উপরে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল কতটা 'ভারতী'তে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশের সময়েই সেটা জানা গিয়েছিল। গোড়ার দিকে 'বড়দিদি' বেরুবার সময়ে লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু পাঠকেরা লেখা পড়ে ধরে নেন যে, রবীন্দ্রনাথই নাম লুকিয়ে ঐ উপন্যাস লিখছেন। কেউ কেউ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কোন কোন গল্প ও উপন্যাসের বিষববস্তু দেখলে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে পড়বেই। কিন্তু বলেছি, রবীন্দ্রনাথ বাস্তব-সাহিত্যের ক্ষেত্রসীমা ও দৃষ্টিশক্তি বিস্তৃততর করে তুলেছিলেন, তাই পরবর্তী যুগের লেখক শরৎচন্দ্রও তারকনাথকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন ঢের বেশীদূর।

এখানে আর একটা কথাও বলে রাখা দরকার। শরৎ-সাহিত্যের খানিক অংশ রবীন্দ্রনাথ প্রভাবগ্রস্ত বটে, কোন কোন স্থলে তার বিষয়বস্তু তারকনাথকেও স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু তার অনেকটা অংশই একেবারে আনকোরা। সেখানে শরৎচন্দ্র নিজস্ব মহিমায় বিরাজ করছেন এবং সেটা হচ্ছে তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ নূতন দান। এই নূতনত্বের জন্যেই শরৎচন্দ্রের নাম অমর হয়ে রইল।

এইবারে আর একটি বিষয় নিয়ে কিছু বলব। 'স্টাইল' বা রচনাভঙ্গির কথা। যে লেখকের নিজের রচনাভঙ্গি আছে, লেখার তলায় তাঁর নাম না থাকলেও লোকে কেবল লেখা দেখেই তাঁকে চিনে নিতে পারে।

আজ পর্যন্ত এমন বড় বা ভাল লেখক জন্মাননি, যাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গি নেই। ফরাসী দেশে ফ্লবেয়ার নামে একজন লেখক ছিলেন, তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত তাঁর রচনাভঙ্গির গুণেই।

এক-একজন বড় লেখকের রচনাভঙ্গি আবার এতটা বিশিষ্ট ও শক্তিশালী যে, তা সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ যুগকে প্রকাশ করে। কারণ সেই যুগের অন্যান্য লেখকদেরও উপরে তাঁদের রচনাভঙ্গির প্রভাব দেখা যায় অল্পবিস্তর।

বাংলাদেশে দুইজন প্রধান লেখকের রচনাভঙ্গি সাহিত্যের দুইটি বিশেষ যুগকে চিনিয়ে দেয়। তাঁরা হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আলোচনায় প্রায়ই 'বঙ্কিম-যুগ'ও 'রবীন্দ্র-যুগে'র কথা শোনা যায়, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গির প্রাধান্যের জন্যেই ঐ দুই যুগের নামকরণ হয়েছে। বঙ্কিম-যুগের অধিকাংশ লেখকের রচনাভঙ্গির উপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের কম-বেশী ছাপ পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-যুগ সম্বন্ধেও ঐ কথা। এখনকার কোন লেখকই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির প্রভাবের ভিতরে না গিয়ে পারেন না। কেউ কেউ পুরোদস্তুর নকলিয়া। সাহিত্যে তাঁদের ঠাঁই নেই।

কোন লেখকই গোড়া থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনাভঙ্গির অধিকারী হতে পারেন না, কারণ বহু সাধনার ফলে ধীরে ধীরে নিজস্ব রচনাভঙ্গি গড়ে ওঠে। এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম বয়সের কবিতায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনাভঙ্গি আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী বলে রবীন্দ্রনাথ খুব শীঘ্রই বিহারীলালের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। বিহারীলালের সব শিষ্য এটা পারেননি। কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের লেখায় শেষ

পর্যন্ত বিহারীলালের রচনাভঙ্গি বিদ্যমান ছিল।

শরৎচন্দ্রের রচনাভঙ্গি কি-রকম? তাঁর রচনাভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির মতন অতুলনীয় ছিল না; সমসাময়িক যুগের অধিকাংশ লেখকের রচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যেমন আপন আপন রচনাভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, শরৎচন্দ্র সেভাবে বহু লেখককে আকৃষ্ট করে কোন নূতন যুগসৃষ্টি করতে পারেন নি। তবু তাঁর লেখবার ধরনের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই নিজের জিনিস।

শরৎচন্দ্রকে দুই যুগপ্রবর্তক বিরাট প্রতিভার আওতায় কলম ধরতে হয়েছিল। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র, তারপর রবীন্দ্রনাথ। শরৎ-চন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাভঙ্গির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। পরে বঙ্কিমের প্রভাব কমে যায় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেড়ে ওঠে। কিন্তু কি বঙ্কিমচন্দ্র আর কি রবীন্দ্রনাথ, কেহই শরৎচন্দ্রকে বিশেষ বা সমগ্রভাবে অভিভূত করতে পারেননি। যারা রঙের কারখানায় কাজ করে তারা গায়ে মুখে ও জামা-কাপড়ে নানা রঙের প্রলেপ মেখে বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু তাই বলে কেউ তাদের চিনতে ভুল করে না —কারণ তাদের আসল চেহারা অবিকৃতই থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কারখানায় গিয়ে শরৎচন্দ্র যে প্রথমে শিক্ষানবিসি করেছিলেন, তাঁর রচনাভঙ্গির ভিতরে কেবল সেই চিহ্নই আছে—জগতে এমন কোন লেখক নেই, পূর্ববর্তী ওস্তাদ-লেখকের কাছ থেকে যিনি শিক্ষা গ্রহণ করেননি; আসলে শরৎচন্দ্রের সংলাপ, চরিত্র-চিত্রণ ও বর্ণনা-পদ্ধতির ভিতরে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবই বেশী। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের যে কোন রচনা না জানিয়ে রেখে দেওয়া হোক; যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে সে শরৎচন্দ্রের রচনাকে বেছে নিতে ভুল করবে না।

শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' 'ভারতী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল লেখকের অজ্ঞাতসারেই। কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তারও

কয়েক বছর পরে, ১৩১৩ অব্দে।

সে সময়ে মাসিক-সাহিত্যের মধ্যে প্রধান ছিল 'ভারতী' 'সাহিত্য' 'প্রবাসী' 'নব্যভারত' ও 'মানসী'। কথাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথের বাস্তব-উপন্যাসগুলির বিপুল প্রভাব। নাট্যসাহিত্যে তখন গিরিশ-চন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী চলেছে; বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি নিয়ে তখন যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। কাব্যসাহিত্যে প্রধানদের মধ্যে রবীন্দ্র-নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও গোবিন্দ-চন্দ্র দাস এবং নবীনদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। নানা শ্রেণীর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে লিপিকুশলতা, রচনাভঙ্গি ও চিন্তা-শীলতার জন্যে তখন খ্যাতি অর্জন করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের মত শরৎচন্দ্রেরও আবির্ভাব মাসিক সাহিত্যক্ষেত্রে এবং ও-ক্ষেত্রে সম্পাদকরূপে তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম খুব বেশী। সুরেশচন্দ্র মিষ্ট ভাষা ও বিশিষ্ট রচনা-ভঙ্গির জন্যেও বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থায়ী সাহিত্যের জন্যে তিনি বিশেষ কিছু রেখে যাননি।

খুব সংক্ষেপেই তখনকার সাহিত্যের অবস্থার ও তার সঙ্গে শরৎ চন্দ্রের সম্পর্কের কথা নিয়ে আলোচনা করা হল। আমাদের স্থান অল্প, তাই এখানে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা শোভনও হবে না। তবে আমাদের ইঙ্গিতগুলি মনে রাখলে শরৎচন্দ্রকে বোঝা হয়তো সহজ হবে।

শৈশব-জীবন (১৮৭৬-১৮৮৬)

হুগলী জেলার একটি গ্রামের নাম হচ্ছে দেবানন্দপুর। যদিও এক সময়ে দেবানন্দপুরের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তবু একালে এ গ্রামটির নাম কিছুকাল আগে খুব কম লোকেরই জানা ছিল। কিন্তু এখন শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে দেবানন্দপুর আবার বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সব দেশ, নগর ও গ্রাম বড় হয় মানুষেরই মহিমায়। কোন বিশেষ দেশে জন্মেছে বলে কোন মানুষ বড় হতে পারে না। অনেকে বড় হবার জন্যে বড় বড় দেশে যান। কিন্তু সত্যিকার প্রতিভাবান মানুষ নিজেই বড় হয়ে নিজের দেশকে বড় করে তোলেন।

এই দেবানন্দপুরে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মতিলাল ধনী ছিলেন না, ছিলেন তার উল্টোই;—অর্থাৎ গরিব। মতিলাল ছিলেন সেকালকার অনেক ব্রাহ্মণেরই মতন নিষ্ঠাবান, কারণ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বেশী বিস্তৃত হতে পারেনি। এখন বিলাতী শিক্ষায় অনেকেই ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্যের কথা ভুলে যান, কিন্তু মতিলাল নাকি এ-দলের লোক ছিলেন না। শরৎচন্দ্রের কথায় জানতে পারি, মতিলালের আর একটি গুণ ছিল তা হচ্ছে সাহিত্য-প্রীতি।

মতিলালের সহধর্মিণীর নাম ভুবনমোহিনী দেবী। এঁর কথা ভালো করে এখনো জানা যায়নি, শরৎচন্দ্রের উক্তি থেকেও তাঁর কথা জানা যায় না। তবে তাঁর সম্পর্কে-ভাই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ—

'তিনি বড় সাদা-মাঠা লোক ছিলেন। কিন্তু এই নিতান্ত

সাদাসিধা মানুষটির অন্তরে একটি স্নেহের সমুদ্র নিহিত ছিল। তিনি কোনদিন কাহারো সহিত সম্বন্ধের দাবির দিক দিয়া ব্যবহার করিতেন না। কর্তারা তাঁহার সেবা-ভক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং আমরা ছিলাম সেই বিশুদ্ধ স্নেহের উপাসক। আজো তাঁর কথা মনে করিতে বুকের মধ্যে চাপা ব্যথার মত বোধ হয়—চক্ষু সরস হইয়া উঠে !'

১২৮৩ সালের ভাদ্র মাসের ৩১শে (ইংরেজী ১৮৭৬ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর) তারিখে মতিলালের প্রথম পুত্রলাভ হয়। এই ছেলেটিই বাংলার আদরের নিধি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গরিব হলেও প্রথম পুত্রসন্তান লাভ করে মতিলাল ও ভুবনমোহিনী যে আনন্দের আতিশয্যে খানিকটা ঘটা করে ফেলেছিলেন, এইটুকু আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু শিশুর ললাটে সেদিন বিধাতা-পুরুষ গোপনে যে অক্ষয় যশের তিলক এঁকে দিয়েছিলেন, পিতা বা মাতা কেউ সেটা আবিষ্কার করতে পারেননি। এবং এই শিশু বড় হয়ে যখন পিতৃকুল ও মাতৃকুল ধন্য করলেন আপন প্রতিভায়, দুর্ভাগ্যক্রমে মতিলাল বা ভুবনমোহিনী সেদিন বিপুল আনন্দে পুত্রকে আশীর্বাদ করবার জন্যে সংসার-নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন না !

শরৎচন্দ্রের আরো ছয়টি ভাই জন্মেছিলেন।

মধ্যমভ্রাতার নাম প্রভাসচন্দ্র। অল্প বয়সেই সন্ন্যাস-ব্রত নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে তিনি নরনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী প্রভাসচন্দ্রের নাম হয় স্বামী বেদানন্দ। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মের দেশে দেশে ছিল তাঁর কার্যক্ষেত্র। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন, শরৎচন্দ্র তখন পাণিত্রাসে বাস করছেন। রুগ্নদেহ নিয়ে বেদানন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আবাসে গিয়ে উঠলেন এবং শরৎচন্দ্রেরই কোলে মাথা রেখে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। রূপনারায়ণের তীরে শরৎচন্দ্র স্বামী বেদানন্দের স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি সমাধিমন্দির রচনা করে দিয়েছেন এবং পাণিত্রাসে অবস্থানকালে প্রতিদিন সন্ন্যাসী-ভ্রাতার স্মৃতির তীর্থে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতেন।

বর্তমান আছেন শরৎচন্দ্রের একমাত্র সহোদর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের আগ্রহে বিবাহ করে তিনি গৃহী হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁরও প্রথম জীবনের কিছুকাল কেটেছে ভবঘুরের মত।

এবং শরৎচন্দ্রও প্রথম যৌবনে ছিলেন ভবঘুরের মত। মাঝে মাঝে গৈরিক বস্ত্র পরে বেড়াতেন, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মতিলালের বংশে সন্ন্যাসের বীজ গুপ্ত হয়ে ছিল, তাঁর পুত্রদের সংসারের বাঁধন সহ্য হোত না। এ-সবের উপরে হয়তো মতিলালের কতকটা প্রভাব ছিল।

শরৎচন্দ্রের দুই বোন—শ্রীমতী অনিলা দেবী ও শ্রীমতী মণিয়া দেবী। বড় বোন অনিলা দেবীর নাম নিয়েই শরৎচন্দ্র 'যমুনা' পত্রিকায় 'নারীর মূল্য' নামে বিখ্যাত রচনা প্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই বোনটির কাছে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই অনিলা দেবীর শ্বশুরবাড়িরই অনতিদূরে পাণিত্রাসে এসে নিজের সাধের পল্লী-ভবন স্থাপন করেছিলেন। ছোট বোন মণিয়া দেবীর শ্বশুরালয় হচ্ছে আসানসোলে।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের নাম স্বর্গীয় কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি হালিশহরের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, বিপ্রদাস ও ঠাকুরদাস। তাঁরা ভাগলপুরে প্রবাসী হয়েছিলেন। ঠাকুরদাস স্বর্গে। শরৎচন্দ্রের একমাত্র নিজের মামা বিপ্রদাস এখন পাটনায় থাকেন।

হালিশহর ও কাঁচড়াপাড়া একই জায়গার দুটি নাম। নৈহাটিও এর পাশেই। একসময় এ-অঞ্চল সাহিত্যচর্চার জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত সাহিত্যসেবকেরই জন্মভূমি হচ্ছে এই অঞ্চলে। শরৎচন্দ্রের মাতামহ-পরিবারেও যে সাহিত্যচর্চার বীজ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ওদিক থেকেও তাঁর কিছু কিছু সাহিত্যানুরাগের প্রেরণা আসা অসম্ভব নয়। প্রেরণা যে কোন্ দিক থেকে কখন কেমন করে আসে তা বলা বড় শক্ত। সকলের

অগোচরে স্ফুলিঙ্গের মত সে মানুষের মনে ঢোকে। তারপর যখন অগ্নিতে পরিণত হয়, সকলের চোখ পড়ে তার উপরে। তবে শরৎচন্দ্রের নিজের বিশ্বাস, তিনি পিতারই সাহিত্যানুরাগের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

ঠাকুরমা নাকি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত আদর দিতেন, নাতির হরেক-রকম দুষ্টামি দেখেও তাঁর হাসিখুশি একটুও ম্লান হোত না। এবং শোনা যায় বালক শরৎচন্দ্রের দুষ্টামির কিছু কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে 'দেবদাস'-এর প্রথমাংশে। নিজের বাল্যজীবনের প্রথমাংশের কথা শরৎচন্দ্র এইভাবে বলেছেন ঃ

'ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন, সেখানে আর একদফা সম্বর্ধনা লাভের পর আবার 'বোধোদয়' 'পদ্য-পাঠে' মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টু সরস্বতী কাঁধে চাপে। আবার সাগরেদি শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার আদর-আপ্যায়ন সম্বর্ধনার ঘটা। এমনি 'বোধোদয়', 'পদ্যপাঠে'ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সাঙ্গ হল।'*

এইটুকুর ভিতর থেকেই বালক শরৎচন্দ্রের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে! তিনি সুবোধ বা শান্ত বালক ছিলেন না। লেখা-পড়ায় তাঁর মন বসত না। যখন পাঠশালায় যাবার কথা, শরৎচন্দ্র

---

*শরৎচন্দ্রের ইংরেজীতে লেখা 'আত্মজীবনী'র অনুবাদ একাধিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে 'বাতায়নে'র অনুবাদ গৃহীত হল।

—লেখক

তখন পাড়ার আরো কতকগুলি তাঁরই মতন 'শিষ্ট' ছেলের সঙ্গে দুপুরের রোদে হাটে-বাটে-মাঠে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন, কখনো ঘাটে বাঁধা নৌকো নিয়ে নদীর জলে ভেসে যেতেন, কখনো খালে-বিলে ছিপ ফেলে মাছ ধরতেন, কখনো যাত্রার দলে গিয়ে গলা সাধতেন, আবার কখনো বা নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়তেন এবং গুরুজনরা দিনের পর দিন তাঁর কোন খোঁজ না পেয়ে ভেবে সারা হতেন। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যেত, ক্ষতবিক্ষত পায়ে, ধুলো-কাদা-মাখা গায়ে, উষ্কখুষ্ক চুলে দীনবেশে অপরাধীর মত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে! গুরুজনরা 'আদর-আপ্যায়নের পালা' শুরু করলেন—অর্থাৎ ধমক, গালাগালি, উপদেশ, ঘুষি চড় কানমলা—হয়তো বেত্রাঘাতও! তারপর বিদ্যালয়ে গিয়ে অনুপস্থিতির জন্যে গুরুমশাইয়ের কাছ থেকে আর একদফা 'আদর-আপ্যায়ন' লাভ! অভ্যর্থনার গুরুত্ব দেখে শরৎচন্দ্র ভয়ে ভয়ে আবার কিছুদিনের জন্যে লক্ষ্মীছেলের মতন 'বোধোদয়' খুলে বসতেন! কিন্তু মাথায় যার 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-এর ঘুর্ণি ঘুরছে, ডানপিটের উদ্দাম স্বাধীনতা একবার যে উপভোগ করেছে, এত সহজে সে-ছেলের বোধোদয় হবার নয়—ঝড়কে কেউ বাক্সবন্দী করে রাখতে পারে না! গায়ের ব্যথা মরার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন আবার উড়ু-উড়ু করে, তখন কোথায় পড়ে থাকে 'পদ্যপাঠ'-এর শুকনো কালো অক্ষরগুলো, আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় গুরুজনের রক্তচক্ষুর বিভীষিকা! ইস্কুলের ঘণ্টা বাজলে পর দেখা যায়, শরৎচন্দ্র তাঁর জায়গায় হাজির নেই! শরৎচন্দ্রের প্রথম বাল্যজীবনের এই স্মৃতি থেকেই হয়তো তাঁর অতুলনীয় কথাসাহিত্যের কোন কোন অংশের উৎপত্তি! একটি বালিকাও নাকি দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের শৈশব লীলাসঙ্গিনী ছিল এবং তার কাহিনী তিনি পরে কোন কোন বন্ধুর কাছে কিছু কিছু বলেছিলেন। কিন্তু এই বালিকাটির নাম কেউ তাঁর মুখে শোনেনি। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে পুতুলের সংসার নিয়ে এই অনামা মেয়েটির

খেলা করতে ভালো লাগত না, সেও গুরুজনদের শাসন না মেনে যাত্রা করত দুর্দান্ত ছেলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বেপরোয়া খেলার জগতে,— যেখানে প্রচণ্ড রৌদ্রে বিপুল প্রান্তর দগ্ধ হয়ে যায়, যেখানে নিবিড় অরণ্যের ভয়ভরা অন্ধকারে দিনের আলো মূর্ছিত হয়ে পড়ে, যেখানে বর্ষার ধারায় স্ফীত নদীর প্রবাহে শরৎচন্দ্রের নৌকা ঝোড়ো-হাওয়ার পাগলামির আবর্তে পড়ে দুলে দুলে ওঠে! মেয়েটির মন ছিল মেঘ-রৌদ্রে বিচিত্র,—মুখ-চোখ ঘুরিয়ে ঝগড়া করতেও জানত, আবার হেসে গায়ে পড়ে ভাব করতেও পারত। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যেও কোন কোন নারী-চরিত্রের মধ্যে নাকি এই মেয়েটির ছবি আঁকা আছে, কিন্তু কোন্ কোন্ চরিত্রে তা কেউ জানে না।

এমনি বারকয়েক পলায়ন ও প্রত্যাগমনের পর মতিলাল ছেলেকে নিয়ে গ্রাম ছাড়লেন। ভাগলপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় মাতুলালয়। এর পরে সেইখানেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর সঙ্গে আমরাও দেবানন্দপুরের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করছি। দেবানন্দপুরের জল-মাটি শরৎচন্দ্রের দেহকে যেভাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট করে তুলেছিল, তার ভিতর থেকেই ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করেন বঙ্গসাহিত্যের শরৎচন্দ্র! শিশু-শরৎচন্দ্রের কথা আরো ভালো করে জানা থাকলে তাঁর সাহিত্যজীবনের ভিত্তির কথাও আরো ভালো করে বলতে পারা যেত। কিন্তু শিশু-শরৎচন্দ্রকে সজ্ঞানে দেখেছে এমন কোন লোকও আজ বর্তমান নেই এবং গরিব বামুনের এক দুরন্ত ছেলের ভাবপ্রবণতার ভিতর থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার করবার আগ্রহও কারুর তখন হয়নি। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন।

দেবানন্দপুর থেকে বিদায় নিচ্ছি বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্রকে আবার কিছুকালের জন্যে দেবানন্দপুরে ফিরতে হয়েছিল। তখন ভাগলপুর থেকে তিনি বালকের পক্ষে অপাঠ্য পুস্তক পাঠের ঝোঁক নিয়ে এসেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন ঃ—

'কিন্তু এবারে আর 'বোধোদয়' নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ খুলে বার করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদিগের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হল আমাকে বাড়ির গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে, জানিনে। একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাস্টারমশাই একদিন স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হল শহরে। বলা ভালো, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি।'

এইখানে প্রকাশ পাচ্ছে, দ্বিতীয়বার দেবানন্দপুরে এসে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ফিরেছে সাহিত্যের দিকে। তখন দেশে শিশুপাঠ্য সাহিত্য ছিল না। তাই শরৎচন্দ্রের মত আরো বহু বিখ্যাত সাহিত্যিককেই প্রথম মনের খোরাক যুগিয়েছে ঐ 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বা ঐ-শ্রেণীরই পুস্তকাবলী। আরো দেখা যাচ্ছে, তখন কলম না ধরলেও নিষিদ্ধ পুস্তকের পাঠক বা কথক শরৎচন্দ্র গোয়াল-ঘরে কতকগুলি শ্রোতা জুটিয়েছেন। তারা কারা? হয়তো যারা স্কুলে বন্দী হওয়ার চেয়ে শরৎচন্দ্রের 'টো-টো কোম্পানি'তেই ঢুকে হাটে-মাঠে পথে-অপথে বেড়াবার জন্যে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করত। সে-দলের কারুর পাকা মাথার সন্ধান যদি আজ পাওয়া যায়, তাহলে শরৎচন্দ্রের দুর্লভ বাল্যজীবনের বহু উপকরণই সংগৃহীত হতে পারে। আশা করি, শরৎচন্দ্রের বৃহত্তর জীবনীর লেখক এ-চেষ্টা করতে ভুলবেন না।

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাস্তুভিটা এখন অন্য লোকের হস্তগত। সে ভিটার সঙ্গে তাঁর শৈশব-স্মৃতির অনেক মধুর সুখ-দুঃখ জড়িত আছে বলে পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র বাড়িখানি আবার কেনবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি।

'এলাম শহরে। একমাত্র 'বোধোদয়'-এর নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—'সীতার বনবাস', 'চারুপাঠ', 'সদ্ভাব-সদ্‌গুরু' ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।'

ভাগলপুরের বাংলা ইস্কুলে ঢুকে শরৎচন্দ্রের মনের ভাব হয়েছিল কি রকম, তাঁর উপর-উদ্ধৃত উক্তি থেকেই সেটা বোঝা যাবে। ছাত্র-বৃত্তি কেলাসে ভর্তি হয়ে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন তাঁর সহপাঠীরা তাঁর চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। কিন্তু জীবনে বা সাহিত্যে কারুর পিছনে পড়ে থাকবেন, এটা বোধ হয় তাঁর ধাতে ছিল অসহনীয়। লেখাপড়ায় তখনি তাঁর ঝোঁক হল। একাগ্র মনে বিদ্যাচর্চা করে অল্পদিনের ভিতরেই তিনি তাঁর সহপাঠীদের নাগাল ধরে ফেললেন।

স্বগ্রাম ছেড়ে এত দূরে দূরসম্পর্কীয় মামার বাড়িতে থেকে বিদ্যা-শিক্ষা করার একটা প্রধান কারণও বোধহয় শরৎচন্দ্রের দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শরৎচন্দ্রের যৌবনের অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং পরে আমরা দেখব যে, শরৎচন্দ্রের ঐ দারিদ্র্যের জন্যে বাংলা সাহিত্যও কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে!

ছাত্রবৃত্তি কেলাসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দুষ্টবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। ইস্কুলের যে ঘড়ি দেখে ছুটি দেওয়া হোত,

শরৎচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা রোজ কাঁধাকাঁধি করে দেওয়ালের উপরে উঠে সেই বড় ঘড়িটার কাঁটা এত এগিয়ে দিতেন যে, অনেক সময়ে প্রধান শিক্ষক সেই বেঠিক ঘড়িকে বিশ্বাস করে এক ঘণ্টা আগেই ইস্কুল বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। শেষে যেদিন ছেলেরা ধরা পড়ল, সেদিন কিন্তু দোষীদের দলে শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করা যায়নি। তিনি অভিমন্যু-জাতীয় বালক ছিলেন না, বিপদের মুহূর্তে ব্যূহভেদ করে সরে পড়তে পারতেন যথা সময়ে!

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের যে বাংলা ইস্কুলে ঢুকে ১৮৮৭ অব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সেটি নাকি এখনো বিদ্যমান। এর পর তিনি ওখানকারই তেজনারায়ণ জুবিলি কলিজিয়েট ইস্কুলে ভর্তি হন। ওখানে গিয়ে নাকি তাঁর পড়াশুনায় মতি হয়েছিল, কারণ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' খবর দিয়েছেন, 'তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়া উঠেন। মনোযোগী ছাত্র হিসাবে তাঁহার বেশ সুনাম ছিল।' 'ভারতবর্ষ'-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে প্রকাশ ঃ—

'এনট্রান্স পাস করিয়া সেই ইস্কুলেরই সংযুক্ত কলেজে এফ-এ পড়িতে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে মাত্র ২০ টাকা ফী দিতে না পারিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়াছিলেন।'

কুড়ি টাকার অভাবে তাঁর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার কথা আরো অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু এ-কথার প্রতিবাদও বেরিয়েছে। তিনি নাকি চাকরি করে পিতার অর্থকষ্ট দূর করবার জন্যেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ১৮৯৪ অব্দে, সতেরো বৎসর বয়সে। কলেজ ছাড়বার কিছু পরেই (১৮৯৬) তিনি মাতৃহীন হন।

ইস্কুলের কেলাসে শরৎচন্দ্রের পাঠ্য পুস্তকভীতি হয়তো দূর হয়ে

গিয়েছিল, হয়তো তিনি 'গুড বয়' খেতাবও পেয়েছিলেন। কিন্তু ইস্কুলের বাইরে খেলাধূলার উৎসাহ তাঁর কিছুমাত্র কমেনি এবং এ-বিভাগে তাঁর দক্ষতাও ছিল নাকি যথেষ্ট। দল গড়ে নিজে দলপতি হবার শক্তিও যে তাঁর হয়েছিল, সে পরিচয়ও আছে। তাঁর মাতুল-সম্পর্কীয় বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ—

'শৈশবে আমরা শরৎকে আমাদের খেলার দলের দলপতিরূপে পাইয়াছিলাম। ডাকাতের দলের সর্দারের দোষগুণ বিবৃতিতে সিক্ত হৃদয় যেমন যুগপৎ আনন্দে বিষাদে মথিত হইয়া ওঠে,—আজও আমাদের দলপতির কথা স্মরণ করিলে অন্তরের মধ্যে তেমনি হয়, ব্যথার সুর বাজিতে থাকে। একদিকে ইস্পাতের মতন কঠিন—অন্যদিকে নবনীকোমল। অন্যায়কে পদদলিত করিবার দুর্ধর্ষ সংকল্প, আবার দুর্বলের পরম কারুণিক আশ্রয়দাতা। বালক শরৎ রুদ্রতায় বজ্রের মতই কঠোর ছিল। সময় সময় মনে হইত সে হৃদয়-হীন। যাহারা সেই দিকের পরিচয় পাইল তাহারা তাহার শত্রুই রহিয়া গেল; কিন্তু অশেষ স্নেহভাজনের দলের তো অভাব নাই।'

পরের জীবনেও তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোনদিনই তিনি কোন দলে মিশে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবস্থান করাটা পছন্দ করতেন না। এমন কি যে দলে তাঁর সমবয়সীর সংখ্যাই বেশী, সেখানেও যৌবন উত্তীর্ণ হবার আগেই শরৎচন্দ্র নিজেকে 'বুড়ো' বলে মুরুব্বিআনা করতে ভালোবাসতেন এবং দলপতি হবার কোন কোন গুণও তাঁর ছিল।

ভাগলপুরে গিয়েও অন্যান্য খেলাধূলার সঙ্গে থিয়েটারের আকর্ষণও তিনি এড়াতে পারেননি। কেউ কেউ লিখেছেন, তিনি নিজেও নাকি ভালো থিয়েটারি অভিনয় করতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে তিনি নাকি একটি নারী-ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে সুনাম কিনেছিলেন। থিয়েটারে শখের অভিনয় করবার

জন্যে হয়তো শরৎচন্দ্রের আগ্রহের অভাব ছিল না, হয়তো কোন কোন দলে গিয়ে ছোটখাটো ভূমিকায় তিনি মহলাও দিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে রঙ্গমঞ্চে নেমে অভিনয় করে তিনি অতুলনীয় নাম কেনেননি নিশ্চয়ই। কারণ ও-বিভাগে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন 'রাজু'! তার কথা পরে বলব।

তাঁর নিজের মুখে আমরা এই গল্পটি শুনেছি : 'শখের থিয়েটারে স্টেজে উঠে যেদিন প্রথম কথা কইবার সুযোগ পেলুম, সেদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। আমার পার্টে কথা ছিল মোটে এক লাইন! আর-একটি ছেলের সঙ্গে আমি স্টেজে নামলুম। আগে তারই পার্ট বলবার কথা। কিন্তু সে তো নিজের পার্ট বললেই, তার উপরে আমি মুখ খোলবার আগেই আমার জন্যে নির্দিষ্ট এক লাইন কথাও অম্লানবদনে বলে গেল। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।'

দুঃসাহসী ডানপিটে ছেলের যে-সব খেলা, ভাগলপুরে গিয়ে বিদ্যাচর্চার অবকাশে সর্দার শরৎচন্দ্র তাঁর দুরন্ত ছেলের দলটি নিয়ে সেই সব খেলাতেও যে মেতে উঠতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই খেলার জগতে তিনি এক নূতন সঙ্গী ও বড় বন্ধুও লাভ করলেন। ছেলেটির নাম রাজু বা রাজেন্দ্র এবং সর্দারিতে তার আসন বোধ হয় শরৎচন্দ্রেরও উপরে ছিল। শরৎ ও রাজুর নায়কতায় যে দুষ্ট ছেলের দলটি ভাগলপুরের আকাশ বাতাস ও গঙ্গাতটকে মুখর করে তুলত, তখনকার বয়োবৃদ্ধদের পক্ষে তারা যে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছিল, এটুকু বুঝতে বেশী কল্পনাশক্তির দরকার হয় না। এই রাজু হচ্ছে একটি অত্যন্ত চিত্রাকর্ষক চরিত্র। গুণ্ডামি, ফুটবল-খেলা, ঘুড়ি-উড়ানো, সাঁতার, জিম্‌নাষ্টিক, হাতের লেখা, ছবি-আঁকা, পড়াশুনো, বাঁশী হারমোনিয়াম বাজানো, গান-গাওয়া ও অভিনয় প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে রাজু ছিল অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী। বাল্য-বয়সেই তার সাহস ও তেজের অসাধারণতা ছিল বিস্ময়কর! ভাগল-

পুরের এক সাহেবের শখের আমোদ ছিল, কালা-আদমীর পৃষ্ঠদেশে চাবুক চালনা। ইস্কুলের জনৈক মাস্টার বারংবার তাঁর বিলাতী চাবুকের আদরে কাতর হয়ে শেষটা রাজুর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজু তখনি তার দলবল নিয়ে ছুটে গিয়ে সাহেবের টমটম-সুদ্ধ ঘোড়াকে দড়ির ফাঁদে বন্দী করে সেই শ্বেতাঙ্গ অবতারকে এমন শিক্ষা দিয়ে এল যে, তারপর থেকে শখের চাবুক-চালনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র নাকি তাঁর 'শ্রীকান্ত'-এর ইন্দ্রনাথ চরিত্রে বাল্যবন্ধু রাজুকে অমর করে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এ কথা সত্য হলে মানতে হয়, রাজুর ভিতরে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না। এবং সে রাজু আজ কোথায়? ইহলোকে, না পরলোকে? তবে এইটুকু মাত্র জানা গিয়েছে যে, রাজুর মনে তরুণ বয়সেই বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। গঙ্গার তীরে নির্জন শ্মশানে গিয়ে সে ধ্যানস্থ হোত, উপবাস করত, শিশু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথাবার্তা কইত না এবং স্বচক্ষে 'ঈশ্বরের জ্যোতি' দেখে খাতায় তা এঁকে রাখত! তারপর একদিন সে ভাগলপুর থেকে অদৃশ্য হল এবং আজও তার সন্ধান কেউ জানে না। হয়তো রাজু আজ সন্ন্যাসী।

এই সময়েই বোধহয় শরৎচন্দ্র নিজের অজ্ঞাতসারেই ললিতকলার নানা বিভাগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জড় লোহা নিশ্চয়ই জানে না, চুম্বক তাকে আকর্ষণ করে। ভবিষ্যতে যে শিল্পী হবে, তরুণ বয়সে সেও নিশ্চয় শিল্পী বলে নিজেকে চিনতে পারে না। তবু তার মনের গড়ন হয় এমনধারা যে, আর্ট তার মনকে টানবেই। এমন কি আর্টের যে-সব বিভাগ পরে তার নিজের বিভাগ হবে না, সে-সব ক্ষেত্রেও সে প্রাণের সাড়া পায়; কারণ সব আর্টেরই মূলরস হচ্ছে এক।

যাত্রা-থিয়েটারের দিকে শরৎচন্দ্রের ঝোঁক ছিল, কারণ ওটা হচ্ছে আর্টেরই আসর। তিনি নিজে বিখ্যাত অভিনেতা না হলেও পরে বাংলাদেশের নাট্যকলা তাঁরই কথাসাহিত্যকে বিশেষ-ভাবে

অবলম্বন করে অল্প পুষ্টিলাভ করেনি। এবং সে-হিসাবে তাঁকে অনায়াসেই নাট্যজগতের একজন বলে ধরে নেওয়া যায়। তারপর ভাগলপুরেই হয়তো শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতকলার প্রতি অনুরাগ হয়। তিনি নিয়মিতভাবে কণ্ঠসাধনা করেছিলেন বলে প্রকাশ নেই; কিন্তু আমরা স্বকর্ণে শুনে জেনেছি যে, শরৎচন্দ্র ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় শুনে এমন গান শিখেছিলেন এবং সে গান এমন কৌশলে গাইতে পারতেন যে, শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনত। যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর হাত ছিল বলেই শুনেছি। এবং কিছু কিছু ছবি আঁকতেও পারতেন। (পাঠকরা লক্ষ্য করলে দেখবেন, রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল ছিল কতখানি!) সাহিত্যক্ষেত্রে না এলে শরৎচন্দ্র পরে হয়তো শ্রেষ্ঠ গায়ক, বাদক বা চিত্রকররূপে আত্মপ্রকাশ করতেন; কারণ যথার্থ কলাবিদের স্বভাব নয় চিরদিন আত্মগোপন করে থাকা; আর্টের কোন-না-কোন পথ বেছে নিয়ে একদিন-না-একদিন তিনি বাইরে বেরিয়ে পড়বেনই। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের মত লুকিয়ে রাখবার জিনিস নয় আর্ট।

এবং ইতিমধ্যে অতি গোপনে চলছিল সাহিত্যচর্চা। মাতুলালয়ে থেকে শরৎচন্দ্র কেবল নিজেই লেখাপড়া করতেন না, বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পড়ানোরও ভার ছিল তাঁর উপরে। এ-সবের পালা চুকিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত তাঁর সাহিত্যের অনুশীলন।

শরৎচন্দ্র পরে একাধিক বন্ধুর কাছে বলেছেন: 'আমি অনেক দলে গিয়ে মিশেছি, অনেক ভালো-মন্দ সাধারণ লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, কিন্তু কোথাও আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। সর্বদাই আমার মনে হয়েছে, আমি ওদের কেউ নই।'...এই যে মনে মনে নিজেকে আলাদা করে রাখা, এটা হচ্ছে বড় কলাবিদের লক্ষণ। দেবানন্দপুরের গরিবের ঘরের দামাল ছেলে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে এসে উচ্চতর কর্তব্যসাধনের জন্য নিজেকে যদি আলাদা করে না রাখতে পারতেন, তাহলে তাঁকেও আজ যবনিকার অন্তরালে বাস

করতে হোত। যে নদী সমুদ্রের ডাক শুনেছে, মাঝপথে নিজের শাখা-প্রশাখাকে অবলম্বন করে সমস্ত জলধারা সে নিঃশেষিত করে ফেলে না, তার প্রধান গতি হবে সমুদ্রের দিকেই। লোকে যাকে কবিতা বলে শরৎচন্দ্র তেমন কবিতা কখনো লেখেননি বটে, কিন্তু তাঁর গদ্য-রচনার মধ্যে কাব্যসৌন্দর্যের অভাব নেই কিছুমাত্র। অতি তরুণ বয়সেই—ভাগলপুরে থাকতেই—তাঁর চিত্ত যে কাব্যরসে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন বর্ণনা করতে গিয়ে তার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন ঃ

'ঘোষেদের পোড়োবাড়ীর একধারে উত্তরদিকে গঙ্গার উপরেই একটা ঘরের পিছনে কয়েকটা নিম আর দাঁতরাঙ্গা গাছে একটুখানি ছোট জায়গাকে অন্ধকারে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছিল। নিমের গোলঞ্চ মদনের কাঁটা-লতা চারিদিক হইতে এই স্থানটিকে এমনভাবে বেড়িয়া থাকিত যে, তাহার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করিতে পারে এ বিশ্বাস বড় কেহ করিতে পারিত না। এক একদিন দলপতি কোথাও উধাও হইয়া যাইত ; জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, 'তপোবনে ছিলাম।'

'হঠাৎ একদিন আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল বোধ করি। আমাকে 'তপোবন' দেখানো হইবে জানিতে পারিয়া আমার হৃদয় আনন্দে গুর্‌গুর্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে শরৎ বলিল, 'তুই যদি আর কাউকে বলে দিস ?' পূর্বদিকে ফিরিয়া সূর্য সাক্ষ্য করিয়া বলিলাম, 'কাউকে বলবো না।' কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না, বলিল 'উত্তরদিকে ফের, ফিরে গঙ্গা আর হিমালয়কে সাক্ষ্য করে বল।' তাহাও করিলাম। তখন সে আমাকে সঙ্গে করিয়া অতি সন্তর্পণে লতার পর্দা সরাইয়া একটি সুপরিচ্ছন্ন জায়গায় লইয়া গেল। সবুজ পাতার মধ্যে দিয়া সূর্যের কিরণ প্রবেশ করার জন্য একটা স্নিগ্ধ হরিতাভ আলোয় সেই জায়গা চক্ষু ও মনকে নিমেষে শান্ত করিয়া স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। প্রকাণ্ড একখানা পাথরের উপর উঠিয়া বসিয়া সে স্নেহভরে ডাক দিল—'আয়।' তাহার পাশে

বসিয়া নিচে চাহিয়া দেখিলাম—খরস্রোতা গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। দূরে—গঙ্গার ও-পারে—নীলাভ গাছপালার ধোঁয়াটে ছবি পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। শীতল বাতাস ঝিরঝির করিয়া বহিতেছিল। সে বলিল, 'এইখানে বসে বসে আমি সব বড় বড় কথা ভাবি।' উত্তরে বলিলাম,—'তাইতে বুঝি তুমি অঙ্কেতে একশোর মধ্যে একশোই পাও?' সে অবজ্ঞাভরে বলিল,—'হুৎ!'

ফিরিবার সময় সে বলিল, 'কোনদিন এখানে একলা আসিস নে—'

'কেন?'—

'ভয় আছে।'—

'ভূত?'—

সে গম্ভীর স্বরে বলিল, 'ভূত-টুত কিছু নেই।'

'তবে?'—

'এখেনে সাপ থাকে।'

এর আগেই আমরা দেখিয়েছি, ইতিমধ্যে একবার দেবানন্দপুরে গিয়ে শরৎচন্দ্র ইস্কুলের বই ফেলে লুকিয়ে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ও 'ভবানী পাঠক' (ওদের লেখক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় এক সময়ে বাঙালী পাঠকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন এবং তাঁর একটি নিজস্ব 'স্টাইল'ও ছিল) প্রভৃতি পড়তে শুরু করে সাহিত্যচর্চার একটি পিচ্ছল সোপানের উপরে উঠেছেন। তারপরের কথাও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই শুনুন ঃ

'এইবার খবর পেলুম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না! পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি তা নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।'

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মহিমায় শরৎচন্দ্রের নিজেরও লেখনী ধারণের লোভ হয়েছে! এইভাবে তরুণ বয়সে বঙ্কিমের কত পাঠক যে লেখকে পরিণত হয়েছে, তার খবর কেউ রাখে না! বঙ্কিমের লেখায় যে-যাদু আছে, শরৎচন্দ্র যে তার দ্বারা কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন সেটাও লক্ষ্য করবার ও স্মরণ রাখবার বিষয়। শেষ-জীবন পর্যন্ত বঙ্কিমের প্রভাব যে তিনি ভুলতে পারেননি, সে ইঙ্গিতও আছে। অতঃপর শুনুন ঃ

'তারপরে এল 'বঙ্গদর্শন'-এর নব-পর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির যেন একটা নূতন আলো এসে চোখে পড়ল। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে পায়, এর পূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিন শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ-কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ আমার হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?'

শরৎচন্দ্র ভাষা ও রচনা পদ্ধতির জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী বটে, কিন্তু নিজের লেখনীধারণের গুপ্তকথা এইভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন ঃ

'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল

স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারতেন না। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে-কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধহয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি লিখতে শুরু করি।'

যদি শরৎচন্দ্রের স্মৃতির উপরে নির্ভর করি তাহলে বলতে হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে, পিতার অসমাপ্ত রচনাগুলি শেষ করবার আগ্রহে সর্বপ্রথমে তিনি কলম ধরেন এবং সম্ভবত তখন তিনি ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন, কারণ শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলে প্রকাশ। শরৎচন্দ্র প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর প্রথম লেখনীধারণ ও আত্মপ্রকাশের মাঝখানে কেটে গিয়েছে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর।

যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মত জেগে একেবারে সাহিত্য-গগনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন, তাঁরা ভ্রান্ত। দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত না হলে ও সাধনা না করলে সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায় না। শরৎচন্দ্র সকলের চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করেননি, অধিকাংশ সাহিত্যিকের—এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরও সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য হচ্ছে এইখানে। এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে শরৎচন্দ্র কখনো ভেবেছেন, কখনো কলম ধরেছেন এবং কখনো কলম ছেড়ে পড়েছেন—অর্থাৎ সাহিত্যের ও আর্টের অনুশীলন করেছেন এবং সেটাও চরম আত্মপ্রকাশের জন্যে

প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়! হেটো আর বোকা লোকেই বলবে, শরৎচন্দ্র কলম ধরেই সাহিত্য-রাজ্য জয় করে ফেললেন। আসলে যা বাইরের নয়, যা অন্তরের সত্য, শরৎচন্দ্র নিজেই তা এইভাবেই প্রকাশ করেছেন ঃ

'এর পরই সাহিত্যের সঙ্গে হল আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে যে নবীন বাঙ্গলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনদিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হল বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল, কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য। এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বইই বারবার করে পড়েছি; —কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথায়ও কোন ত্রুটি ঘটেছে কিনা—এসব বড় কথা কখনও চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার এই ছিল পুঁজি।'

এইটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্র কেবল নিজের অপরিশোধ্য ঋণস্বীকারই করেননি, প্রকাশ করেছেন যে, দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও এবং লেখনী ত্যাগ করেও 'পূর্ণতর সৃষ্টি'র জন্যে মনে মনে তিনি প্রস্তুত হয়ে উঠছিলেন। ১৩১৯ সালে কেউ কেউ দৈবগতিকে তাঁর আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা না থাকলেও শরৎচন্দ্র আর বেশী দিন আত্মগোপন করতে

পারতেন না। বড় নদীর স্রোতকে কেউ চারিদিকে পাথরের পাঁচিল তুলে একেবারে রুদ্ধ করতে পারে না। যত উঁচু পাঁচিলই তোলো, দুদিন পরে নদী বাধা ছাপিয়ে উপচে পড়বেই।

রবীন্দ্র-প্রতিভাকেই আদর্শরূপে সামনে রেখে শরৎচন্দ্র স্বদেশে ও প্রবাসে সাহিত্যসাধনা করেছিলেন। এ আদর্শ তাঁর সুমুখ থেকে কখনো সরে গিয়েছিল বলে মনে হয় না, শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সেও তাঁর রচনার ভাষা ও চরিত্রসৃষ্টির উপরে রবি-করের লীলা দেখা যায়। যখন বাংলার জনসাধারণের মাঝখানে তাঁর আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যখন তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা বাইরের আলোকে এসেছে, তখনও (১৫-১১-১৯১৫) একখানি পত্রে তিনি তাঁর কোন বন্ধুকে লিখেছিলেন ঃ

'আমি আবার একটা গল্প (উপন্যাস ?) লিখছি। ...এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবু'র ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ' তবে ধরবার জো নেই।'

সুতরাং এ-কথা স্বীকার করতেই হবে, সমগ্রভাবে না হোক, আংশিক ভাবেও শরৎ-সাহিত্যের উৎস খুঁজলে রবীন্দ্র-সাহিত্যকেই দেখা যাবে।

শরৎচন্দ্র যৌবনের প্রথমেই লেখকের আসনে এসে বসলেন। সেই সময়ে বা তার কিছু আগে-পরে শরৎচন্দ্র নিজের চারিপাশে কয়েকটি তরুণকে নিয়ে একটি লেখক-গোষ্ঠী গঠন করে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের দলপতির আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকেই। তাঁদের অধিকাংশই এখন বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত হয়েছেন, যেমন —শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রভৃতি। (যদিও সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথকে ভাগলপুরের 'সাহিত্য-সভা'র নিয়মিত সভ্য না বলে 'ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতি'র সভ্য বলাই

উচিত। সৌরীন ছিলেন কলকাতার ছেলে।)

তখনকার দিনের ঐ তরুণের দল নিয়মিতভাবে যে-আসরে এসে সমবেত হতেন তার নাম ছিল নাকি 'সাহিত্য-সভা'। যাঁরা প্রথম সাহিত্য-সেবাকেই জীবনের ব্রত করে তুলতে চান, তাঁদের পক্ষে এ রকম আসরের দরকার হয় সত্য-সত্যই। এ-সব আসরে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার ফলে পাওয়া যায় সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যে নব নব প্রেরণা। উক্ত সভার মুখপত্রের মতন ছিল একখানি হাতে-লেখা মাসিকপত্র, নাম 'ছায়া'। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী আর একখানি পত্রিকার নাম করেছেন—'তরণী'। কিন্তু এই 'তরণী' আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার ভবানীপুরে। এবং তার নিয়মিত লেখক ছিলেন শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন (সেন ব্রাদার্স), ও শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। 'ছায়া' ও 'তরণী' ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। ডাকযোগে তারা কলকাতা থেকে ভাগলপুরে কিংবা ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আনাগোনা করত এবং 'ছায়া' করত 'তরণী'র লেখার উত্তপ্ত ও সুতিক্ত সমালোচনা এবং 'তরণী'তে 'ছায়া'র লেখা সম্বন্ধে যে-সব মতামত থাকত তারও তীব্রতা কম ধারালো ছিল বলে মনে করবার কারণ নেই। 'ছায়া'র সযত্নে বাঁধানো খাতা পরে 'যমুনা'র খোরাক জোগাবার জন্যে নিঃশেষে আত্মদান করেছিল। প্রতিযোগী 'তরণী' এখন আর কল্পনা-সায়রে ভাসে না বটে, কিন্তু তার কিছু-কিছু নমুনা নাকি আজও পাওয়া যায়।

হাতে-লেখা পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাগান' নামে অন্য খাতায় অন্যান্য রচনাও তোলা ছিল। কি কি রচনা, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি, নানা জনে নানা লেখার নাম উল্লেখ করেছেন, হয়তো নামের তালিকা নির্ভুল নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা এতগুলি লেখার

নাম পেয়েছি ঃ 'কাক-বাসা', 'অভিমান', ('ইস্টলিনে'র ছায়ানুসরণ), 'পাষাণ', (Mighty Atom-এর অনুসরণ), 'বোঝা', 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম', 'কোরেল', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'শুভদা', 'বালা', 'শিশু', 'সুকুমারের বাল্যকথা', 'ছায়ার প্রেম', 'ব্রহ্মদৈত্য', ও 'বামন ঠাকুর' প্রভৃতি। হয়তো এদের কোন-কোনটি ঐ হাতে-লেখা কাগজের সম্পত্তি নয়, স্বাধীন উপন্যাস বা গল্পের আকারেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন-কোনটি হয়তো শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর ত্যাগের পর লিখিত। দেখছি, শরৎচন্দ্রের তখনকার রচনার মধ্যে একাধিক অনুবাদও ছিল। কিন্তু পরের বয়সে অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মত পরিবর্তিত হয়েছিল। কারণ তাঁকে বলতে শোনা গেছে—'অনুবাদ করা আর পণ্ডশ্রম করা একই কথা। ও আমার ভালো লাগে না।' শরৎচন্দ্রের পূর্বোক্ত রচনাগুলির কয়েকটি পরে 'যমুনা' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোন-কোনটি হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেছে। সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, শরৎচন্দ্র তখন নাকি এই নাম ব্যবহার করতেন—St. C. Lara অর্থাৎ St—শরৎ ; C—চন্দ্র ; এবং Lara অর্থে শরৎচন্দ্রের ডাকনাম 'ন্যাড়া' !—অপূর্ব ছদ্মনাম !

'কাক-বাসা' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেনঃ—

'উপন্যাস লেখার এই বোধ করি আদি চেষ্টা। এখানি পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু সে-সময় এখানি লিখিতে তাহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে দেখিয়াছি। ঘন্টার পর ঘন্টা কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত—সে মহানিবিষ্ট মনে লিখিয়াই চলিয়াছে !···লেখা পছন্দ হয় নাই বলিয়া সে এই বইখানি ফেলিয়া দিয়াছিল।'

সুরেনবাবুর শেষ কথাগুলি পড়লে অধিকাংশ সাধারণ নূতন লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য বোঝা যায়। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর লেখকরা নিজেদের লেখার সম্বন্ধে হন অন্ধ, তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা যা লেখেন সবই অমূল্য রত্ন, সমজদার সুখ্যাতি না করলে তাঁদের দ্বিতীয়

রিপু হয় প্রবল! কিন্তু প্রথম বয়স থেকেই নিজের রচনার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র ছিলেন সচেতন, যা লিখতেন তাইই তাঁর মনের মত হোত না এবং পছন্দ না হলে নির্মমভাবে তাকে ত্যাগ করতেও পারতেন! এটা হচ্ছে প্রতিভাধরের লক্ষণ, তাঁর বিচারনিপুণ মন নিজের কাজেও তৃপ্ত নয়!

আজকালকার নূতন লেখকদেরও দেখি, প্রথম লিখতে শিখেই মাসিক সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে তাঁরা মহাব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সব আর্টের মতন সাহিত্যের আসরেও যে শিক্ষাকাল আছে, এটা হয়তো তাঁরা বিশ্বাস করতে রাজী নন। গত-যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিকই কোন সদ্‌গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ বা কোন বড় আদর্শকে সামনে রেখে হাতমক্স করতেন, কাগজে কালির আঁচড় কাটতে শিখেই মাসিকপত্রের আফিসের দিকে ছুটতেন না। শরৎচন্দ্রও এই নীতি মেনে চলতেন। তাই তাঁর প্রথম জীবনের প্রত্যেক রচনার দৌড় ছিল হাতে-লেখা পত্রিকার আসর পর্যন্ত। সে-সময় তিনি যে বাতিল হবার মতন লেখা লিখতেন না তার প্রমাণ, তাঁর তখনকার অনেক লেখাই বহুকাল পরে প্রকাশ্য সাহিত্যের দরবারে এসে অসাধারণ সম্মান ও জনপ্রিতয়া অর্জন করেছে।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা দেখেই যে পরে তাঁর প্রথম বয়সের রচনা 'সাহিত্যে'র মত বিখ্যাত পত্র প্রকাশ করতে রাজী হয়েছিল, তা নয়; তার মধ্যে বাস্তবিকই বস্তু ছিল। এরও প্রমাণ আছে। 'ভারতী'ও ছিল একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। 'ভারতী' যখন লেখকের অজ্ঞাতসারে যেচে 'বড়দিদি'কে গ্রহণ করেছিল, তখন শরৎচন্দ্র নামক সাহিত্যিকের অস্তিত্বও জনসাধারণের জানা ছিল না এবং প্রথমে শরৎ-চন্দ্রের নাম পর্যন্ত 'ভারতী'তে প্রকাশ করা হয়নি! তবু সাধারণ পাঠকদের উপভোগের পক্ষে 'বড়দিদি'ই হয়েছিল আশাতীতরূপে যথেষ্ট!

কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিজের বিচারে 'বড়দিদি' প্রভৃতি তাঁর আদর্শের

কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি, তাই তখনকার মত তারা হস্তলিখিত পত্রিকার মধ্যেই বন্দী হয়ে রইল, বন্ধুরা বহু অনুরোধ করেও তাদের কোনটিকে প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে হাজির করবার অনুমতি পেলেন না! এবং আত্মরচনা বিচার করতে বসে শরৎচন্দ্রের ভুল হয়েছিল বলেও মনে করি না। কারণ তাঁর আত্মপ্রকাশের যুগের রচনাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, প্রকাশভঙ্গি, রচনারীতি ও চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী গল্প বা উপন্যাসগুলি সত্য-সত্যই অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর! এ থেকেই প্রমাণিত হয়, জনসাধারণের বিচার আর শিল্পীর বিচার এক নয়!

আসল কথা, শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনের ভিতরে সাহিত্যের সৌন্দর্য তখন পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছে ; সে আর অল্পে তুষ্ট হতে পারছে না। তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে চাইছেন, তাঁর প্রাথমিক শক্তি যাকে প্রকাশ করতে অক্ষম! তাঁর সাহিত্য-সাধনার ধারা তখন যদি অব্যাহত থাকতে পারত, তাহলে অনতিকাল পরেই হয়তো বাংলাদেশে আমরা শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য আবির্ভাব দেখবার সুযোগ-লাভ করতুম। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যে দারিদ্র্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সেই দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্যের জন্যেই তাঁকে ভাগলপুর পরিত্যাগ করতে হল। তারও পরে কিছুকাল তিনি লেখনীকে একেবারে তুলে রাখেননি বটে, কিন্তু নানাস্থানী হয়ে তাঁর নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সুবিধা বোধহয় হোত না। দারিদ্র্য বহু শিল্পীর সর্বনাশ করেছে এবং শরৎচন্দ্রের দান থেকেও দীর্ঘকাল বাংলাদেশকে বঞ্চিত রেখেছে। নইলে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর আকার আরো কত বড় হোত কে তা বলতে পারে?

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে মানুষ-শরৎচন্দ্রের চরিত্রের আর একদিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে চাই। দেখি, ছেলেবেলা থেকেই তিনি কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে বেশীদিন থাকতে পারেন না। এমন কি যে-বয়সে মায়ের কোলই ছেলেদের সবচেয়ে নিরাপদ

আশ্রয়, তখনও তিনি মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছেন ! শোনা যায়, তিনি নাকি একবার পায়ে হেঁটে পুরীতেও গিয়েছিলেন ! রেঙ্গুনে পালাবার আগে তিনি যে কতবার কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছেন, কারুর কাছে তার সঠিক হিসাব আছে বলে জানা নেই। এমন কি মাঝে মাঝে তিনি দস্তুরমত সন্ন্যাসী সেজেও ডুব মেরেছেন ! রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেও তিনি তাঁর সাহিত্যিক যশের লীলাক্ষেত্র কলকাতায় দীর্ঘকাল ধরে বাস করতে পারেননি। কখনো থেকেছেন পাণিত্রাসে, কখনো থেকেছেন বেনারসে, কখনো ছুটেছেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে, শেষ-জীবনে কালাপানি লঙ্ঘন করবারও চেষ্টায় ছিলেন— বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর ঘর-পালানো মন তাঁকে 'অচলায়তনে'র মধ্যে বাঁধা পড়তে দেয়নি। এটা ঠিক প্রতিভার অস্থিরতা নয়, কারণ পৃথিবীর অনেক প্রতিভাই স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বাইরে বেরুতে রাজী হয়নি। যদিও বাংলাদেশের আর এক বিরাট প্রতিভার মধ্যে বিচিত্র অস্থিরতা দেখা যায় এবং তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

মধ্যকাল (১৮৯৭—১৯১৩)

আমরা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকেই অল্পের মধ্যে যতটা সম্ভব ভালো করে দেখতে চাই। কিন্তু এখন আমরা শরৎচন্দ্রের জীবন-নাট্যের যে-অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে দারিদ্র্যের বেদনা, মানসিক অস্থিরতা, পিতৃশোক ও জীবনের লক্ষ্যহীনতা প্রভৃতির জন্যে কাতর এমন একটি মানুষকেই বেশী করে দেখতে পাই, যাঁর মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভা ছাইচাপা আগুনের মত প্রায়-নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। এর প্রথম দিকটায় মাঝে মাঝে অনুকূল হওয়ায় ছাই উড়ে আগুনের দীপ্তি বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কলমের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে তুলে দেননি বটে, কিন্তু তারপরেই তাঁর লেখা-টেখা বহুকালের জন্যে ধামাচাপা পড়ে। এই সময়টায়—তাঁর নিজের কথায়—শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন যে, কোনকালে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশের আর কোন সহিত্যিক এমন দীর্ঘকাল সাহিত্যকে ভুলে থেকে আবার সহসা আত্মপ্রকাশ করে পরিপূর্ণ মহিমায় সকলকে অবাক করে দিতে পারেননি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর তুলনা দুর্লভ। এমন সাহিত্যিকের অভাব নেই, যাঁরা প্রথম জীবনে অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও জনতার অভিনন্দন পেয়ে আচম্বিতে সাহিত্যধর্ম ত্যাগ করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন, আর দেখা দেননি। যেমন ফরাসী কবি Arthur Rimband; তাঁর সতেরো বছর বয়সের সময়ে সারা ফ্রান্স তাঁকে অতুলনীয় প্রতিভাবান বলে অভ্যর্থনা করেছিল, কিন্তু সাহিত্য-সমাজের দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি

সরে পড়লেন ; চলে গেলেন একেবারে আবিসিনিয়ায় ; এবং বাকী জীবন ব্যবসায়ে মেতে আর কবিত্বের স্বপ্ন দেখেননি।

কিন্তু আমরা একজন কবিকে জানি, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা চলে। তিনিও জাতে ফরাসী, নাম Paul Valery। বিশ বৎসর বয়সে কবিযশোপ্রার্থী হয়ে পারি শহরে এলেন। তাঁর অসাধারণ কবিত্ব দেখে জনকয়েক রসিক সাহিত্যিক তাঁকে খুব আদর করতে লাগলেন। কিন্তু Valery কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করলেন যে, শরীরী মানুষের পক্ষে কবিত্বের চেয়ে অভাবের তাড়না ও পেটের দায় হচ্ছে বড় জিনিস। তিনি ছিলেন Stephane Mallarme-র মতন সেই শ্রেণীর কবি, কবিতা পড়ে লোকে সহজে বুঝতে পেরে সুখ্যাতি করলে যাঁরা খুশী হতেন না! সুতরাং কবিতা লিখে অন্ন-সংগ্রহের উপায় নেই দেখে Valery হঠাৎ একদিন ডুব মারলেন।··· বছরের পর বছর যায়, Valery-র কোন পাত্তা নেই। যে দু-চারজন কবিবন্ধু তাঁকে ভোলেননি তাঁরা অবাক হয়ে ভাবেন, কবি নিরুদ্দেশ হলেন কোথায়? অদৃশ্য না হলে এতদিনে না জানি তাঁর কত যশই হোত! কিন্তু কেউ খবর পেলে না যে, Valery তখন কোন ব্যবসায়ীর সেক্রেটারিরূপে অজ্ঞাতবাস করেছেন এবং অবসরকালে করছেন কাব্যের বদলে গণিতবিজ্ঞানের চর্চা!

সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কেটে গেল! তারপর আচম্বিতে একদিন ফরাসী সাহিত্যক্ষেত্রে কবি Valery-র পুনরাবির্ভাব! এখন তিনি আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে একজন অমর কবিরূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর এক টুকরো কবিতার নমুনা হচ্ছে এই :

'The Universe is a blemish
In the purity of Non-being.'

শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অতটা না মিললেও, ফরাসী গল্প ও উপন্যাস লেখক গী দে মোপাসাঁর কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

ফ্লবেয়ারের অধীনে অপূর্ব ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল অপ্রকাশ্যে শিক্ষানবিসি করে মোপাসাঁ একটিমাত্র গল্প নিয়ে প্রথম যেদিন আত্মপ্রকাশ করলেন, বিখ্যাত হয়ে গেলেন সেই দিনই। তারপর মাত্র দশ-বারো বৎসর লেখনী চালনা করেই মোপাসাঁ নিজের বিভাগে বিশ্বসাহিত্যে আজও অমর এবং অদ্বিতীয় হয়ে আছেন!

সাধারণত যে-সব উদীয়মান সুলেখক হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিয়ে কার্যান্তরে মন দেন, দীর্ঘকাল পরে কলম ধরলেও অনভ্যাসের দরুন আর তাঁরা ভালো লিখতে পারেন না। সেই জন্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে এ-সব লেখকের পুনরাগমন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর একজন লেখককে আমরা বহুকাল পরে উৎসাহিত করে কলম ধরিয়েছিলুম। যে-বৎসরে 'যমুনা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরেই এবং ঐ কাগজেই আমরা প্রকাশ করেছিলুম তাঁর একাধিক রচনা। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তাঁর পুনরাগমন সফল হল না। অথচ পুরাতন 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি যখন সাহিত্য-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তখন সকলেই জানত, তিনি একজন খুব বড় লেখক হবেন। আমরা তাঁর নাম করলুম না, কারণ তিনি হয়তো এখনো ইহলোকেই বিদ্যমান।

কিন্তু আগেই দেখিয়েছি, শরৎচন্দ্র ঐ-শ্রেণীর লেখকদের দলে গণ্য হতে পারেন না। সমসাময়িক সাহিত্য-সমাজ থেকে নির্বাসিত ও জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি লেখনীত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাশীল মন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেনি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের—রচনা বরাবরই তাঁর বুভুক্ষু মস্তিষ্কের খোরাক যুগিয়েছে। অর্থাৎ তিনি কলমই ছেড়েছিলেন, সাহিত্যকে ছাড়েননি। মন ছিল তাঁর সক্রিয়। এবং মনই করে সাহিত্য সৃষ্টি।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যখন থেকে মানুষ শরৎচন্দ্রে পরিণত হতে বাধ্য হলেন, তাঁর তখনকার কার্যকলাপ খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে। বেশী কথা বলবার মালমশলাও আমাদের হাতে নেই।

নানাকারণে তাঁদের আত্মসম্মানে বারংবার আঘাত লাগায় পিতার সঙ্গে ভাগলপুর ছেড়ে শরৎচন্দ্র খঞ্জরপুর, তারপর অন্যান্য জায়গায় যান—চাকরির সন্ধানে। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় নালিশ ছিল, তিনি সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ! বই পড়তে ভালোবাসেন, লেখার অভ্যাস আছে, নকশা আঁকেন, ফুলের মালা গাঁথেন, অথচ টাকা রোজগার করতে পারেন না ! শ্বশুরবাড়িতে তাই গরিব ও বেকার জামাইয়ের আর ঠাঁই হল না। এবং সংসারে এইটেই স্বাভাবিক। ভাগলপুরের আত্মীয়-আলয়ে মতিলাল ও শরৎচন্দ্রের অনেক নির্যাতনের কাহিনী আমরা শুনেছি, কিন্তু এখানে তার উল্লেখ করে কাজ নেই। তার পরের কথা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর ভাষাতেই শুনুন। তখন হাতে-লেখা খাতায় বা মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি রচনা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ঃ

'হঠাৎ একদিন আমার স্বামীর মুখে শুনিলাম, সেই অপ্রকাশিত লেখার লেখক মজঃফরপুরে আমাদের বাসায় অতিথি। আমি সে সময় ভাগলপুরে। আমার স্বামী আমার মুখেই ইতিপূর্বে শরৎবাবুর লেখার প্রশংসা শুনিয়াছিলেন, তাই নাম জানিতেন। মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তাঁর খুব শখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন, 'একটি বাঙ্গালী ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়, অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলেই পরিচয় দিলেন ; কিন্তু লোকটি বাঙ্গালীই, একদিন গান শুনবে ? নিয়ে আসবো তাকে ?'

'বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা এক একদিন গান-বাজনার আসর বসিত। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসে, ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়িতে অতিথিরূপে এখানেই ছিলেন। কি জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না ; কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতই ছিল। সে সময় তিনি কিছু নূতন রচনা না করিলেও তাঁহার যে স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা তাঁহার মধ্যে

অপেক্ষা করিয়াছিল তাহা তাঁহার ব্যবহারকেও অনেকখানি সৌজন্যমণ্ডিত এবং আকর্ষণীয় করিয়া রাখিত। শ্রীযুক্ত শিখরনাথবাবু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত কথাবার্তায় বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহার পরিচয় এখনকার লেখক শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ পরিচিত লোকও অবগত নন। অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিখরবাবুর বাড়ি থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যান। এই মহাদেব সাহুই 'শ্রীকান্তে'র কুমার সাহেব তাহাতে সন্দেহ নাই। মজঃফরপুর হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও শরৎচন্দ্র শিখরনাথ বাবুকে বার কয়েক পত্র দিয়াছিলেন। তাহার পর আর বহুদিন তাঁহার সংবাদ জানা যায় নাই। পরে শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রমুখাৎ শুনি তিনি বর্মা চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যে সেখানে তাঁহার মৃত্যুসংবাদও রটিয়াছিল।'

আধারণ মানুষ শরৎচন্দ্রের তখনকার যে-ছবিটি কল্পনায় আসছে, তা হচ্ছে এই রকম। একটি রোগাসোগা কালো যুবক, চোখে শ্রান্ত স্বপ্নবিলাসের ছাপ আছে, চেহারায় ও কাপড়-চোপড়ে পারিপাট্য নেই, লাজুক অথচ মিষ্টভাষী, মাঝে মাঝে সাহিত্য-আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, খোসগল্পেও সুপটু, কিন্তু ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগলে হন বজ্রের মতন কঠিন, আত্মপরিচয় দিতে নারাজ, সর্বাঙ্গে ফোটে আলাভোলা বৈরাগ্যের ভাব, পরদুঃখে কাতর, পর-সেবায় তৎপর, সুকণ্ঠ, বাঁশী ও তবলায় দক্ষ! এমন একজন মানুষ যে সকলের প্রিয় হয়ে উঠবেন, এটা আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু এঁকে অপমান করতে গেলে সাহসীকেও আগে ভাবতে হয়!

মহাদেব সাহুর কাছে কাজ করবার সময়ে শরৎচন্দ্রের শিকারেরও শখ হয়। অবসরকালে প্রায়ই তিনি বন্দুক হাতে করে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রের মনের কোথায় খানিকটা যে ক্ষাত্রবীর্য ছিল, সেটা পরেও লক্ষ্য করা গেছে। যখন রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, সেই পরিণত বয়সেও পকেটে তিনি ধারালো বড় ছোরা রেখে পথে বেরিয়েছেন। এ-কথা সত্য কিনা জানি না, তবে কেউ কেউ লিখেছেন শরৎচন্দ্র নাকি সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি করেই রেঙ্গুনের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কাহিনী আমরা শরৎচন্দ্রের মুখে শুনিনি। তবে সশস্ত্র থাকবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল বরাবরই। বৃদ্ধবয়সেও—ছোরা ত্যাগ করলেও—এমন এক ভীষণ মোটা লগুড় হাতে নিয়ে নিরীহ বন্ধুদের বৈঠকখানায় এসে বসতেন, যার আঘাতে বন্য মহিষও বধ করা যায়!

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় আসেন। কলকাতার ভবানীপুরে থাকতেন তাঁর সম্পর্কে-মামা উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি 'বিচিত্রা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা। হিন্দী কাগজপত্র অনুবাদ করবার জন্যে তাঁর একজন লোকের দরকার হয়েছিল। ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র সেই কাজটি পেলেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। তখনো তাঁর পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করবারও সময় আসেনি। চির-গরিব বাপ, ছেলেকেও দেখে গেলেন দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত পরাশ্রিত অবস্থায়। অথচ এমন ছেলের জন্মদাতা তিনি!

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প আছে। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট সম্পর্কে-মামা, অথচ বন্ধুস্থানীয় কারুর কারুর শখ হয়েছিল তাঁরা একটি হার্মোনিয়ম কিনবেন। অথচ সকলেরই ট্যাঁক গড়ের মাঠ! অতএব সকলে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলেন। বক্তব্যটা এই: তুমি আমাদের একটা গল্প লিখে দাও, আমরা সেটা কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠাব। পুরস্কার পেলে আমাদের

হার্মোনিয়ম কেনবার একটা উপায় হয়! দেখা যাচ্ছে, তখনই ওঁদের মনে ধারণা ছিল যে, শরৎচন্দ্র গল্প লিখলে সেটি পুরস্কৃত হবেই!

শরৎচন্দ্রের তখন নাম হয়নি। এবং তিনিও তখন নিজের লেখাকে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না। তবু নিজের নামে প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠাতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। তাই সকলের সুদৃঢ় অনুরোধে সেইদিনই তাড়াতাড়ি 'মন্দির' নামে একটি গল্প লিখতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু লেখকরূপে নাম রইল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

গল্পটি প্রতিযোগিতায় হল প্রথম এবং এই হল আত্মীয়-সভার বাইরে শরৎপ্রতিভার প্রথম সফল পরীক্ষা ও প্রথম গৌরবজনক আত্মপ্রকাশ! কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার আগে ঐ 'মন্দির'ই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের শেষ-রচনা!

শুনেছি, ভবানীপুরেও আত্মীয়-আলয়ে শরৎচন্দ্র নিজের মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণ বলে মনে করতে পারেননি—প্রায়ই প্রাণে তাঁর আঘাত লাগত। শেষটা নিতান্ত মনের দুঃখেই তিনি আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সাগর পার হয়ে গেলেন একেবারে অজানা দেশ রেঙ্গুনে। এত দেশ থাকতে ঐ সুদূর প্রবাসে গেলেন যে তিনি কোন্ ভরসায়, সেটা প্রথম দৃষ্টিতে রহস্যময় বলেই মনে হয়। তবে শুনেছি, তাঁর আত্মীয়-সম্পর্কীয় ও রেঙ্গুন-প্রবাসী স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ এসে তাঁর পথ থেকে এ বান্ধবটিকেও সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস, এই দুঃসময়ে শরৎচন্দ্র কোন আত্মীয়হীন দেশে গিয়ে নূতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মনে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব ছিল না, সেটা বলা বাহুল্য। তার উপরে তাঁর ভিতরে ছিল শিল্পীর ভাবপ্রবণতা। সাধারণ লোকের মত আত্মীয়-বন্ধুদের অবহেলা অনায়াসে সহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। আগে তাঁর

মত অনেক বেকার দরিদ্রই যেতেন ব্রহ্মদেশে ভাগ্যান্বেষণে। নিজের দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিয়ে তিনিও যখন সেই পথ অবলম্বন করে রেঙ্গুনে গিয়ে হাজির হন, তাঁর সম্বল ছিল নাকি মাত্র দুই টাকা! এবং ঐ দুই টাকা ফুরিয়ে যেতেও দেরি লাগেনি। তখন রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালীরা কিছুদিন শরৎচন্দ্রের অভাব মেটালেন, কারণ লোকের স্নেহ-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতেন তিনি খুব সহজেই। তারপর সওদাগরি অফিসে তাঁর সামান্য মাহিনার একটি চাকরি জুটল। তাঁর তখনকার অসহায় অবস্থার পক্ষে সেই কাজটিই বোধকরি যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল!

কিছুদিন পরে তিনি ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের অফিসে একটি কাজ পেলেন। এখানে চাকরি ছাড়বার আগে তাঁর মাহিনা একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।

এই রেঙ্গুন-প্রবাসের সময়ে শরৎচন্দ্রের মনের বৈরাগ্য বোধহয় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কারণ তাঁর সংসারী হবার সাধ হল এবং তাঁর সে সাধ পূর্ণ করলেন শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী। কিন্তু এর আগেই তিনি একটি মেয়েকে কুপাত্রের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে বিবাহ করে নিজের মহত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই বিবাহের ফলে লাভ করেছিলেন একটি পুত্রসন্তান। কিন্তু দুর্দান্ত প্লেগ এসে তাঁদের সেই সুখের সংসার ভেঙে দেয় এবং শরৎচন্দ্র হন আবার একাকী!

আমাদের এক নিকট-আত্মীয় রেঙ্গুনে ডাক্তারী করেন। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁরই মুখে শুনেছি, রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালী-সমাজে শরৎচন্দ্র খুব আসর জমিয়ে তুলে-ছিলেন। গানে-গল্পে তিনি সকলকেই মোহিত করতেন। সেখানে গান, গল্প, বই-পড়া, ছবি-আঁকা আর চাকরি ছাড়া তাঁর জীবনের যে আর কোন উচ্চ লক্ষ্য আছে, বাহির থেকে দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারত না। শরৎচন্দ্রের এই আর একটা বিশেষত্ব ছিল ; মনে মনে নিজেকে তিনি যত আলাদা করেই রাখুন, বাহিরে আর

দশজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতে পারতেন। এ বিশেষত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, সাধারণ মানুষ তাঁকে দূর থেকে নমস্কার করত। রবীন্দ্রনাথও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারেন না।

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার অধুনা-লুপ্ত 'বাঁশরী' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক স্মৃতিকথা প্রকাশ করে-ছিলেন, তার নাম 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র'। ঐ লেখাটিতে ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ গল্পের সঙ্গেই শিল্পী বা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বিশেষ সম্পর্ক নেই বলে কেবল গল্পের খাতিরে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতরে তাদের আর টেনে আনা হল না।

তবে শরৎচন্দ্রের জীবনী-কথা হিসাবে, ব্রহ্মদেশের দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। যদিও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে সাধ্যমত আত্মগোপন করে চলতেন, তবু অবশেষে রসিক লোকেরা তাঁকে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তার ফলে 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে'র সভ্যদের প্রবল অনুরোধে শরৎচন্দ্রকে আবার 'অস্ত্র ধরতে' হয়। তিনি 'নারীর ইতিহাস' নামে সুবৃহৎ এক প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রকাশ্য সভায় লেখাটি তাঁর পড়বার কথা ছিল এবং সভার মধ্যিখানে শরৎচন্দ্র ছিলেন চিরদিনই 'কাপুরুষ'—মসী-বীর হলেই যে বাক্যবীর হওয়া যায় না তারই মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। অতএব প্রবন্ধটি সভার জন্যে বাসায় রেখে, লেখক পড়লেন কোথায় সরে! যা-হোক প্রবন্ধটি সভায় পঠিত হয় এবং শরৎচন্দ্রের নামে ধন্য-ধন্য রব পড়ে যায়!

শরৎচন্দ্র বরাবরই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন বলে তাঁর রেঙ্গুনের বাসাতেও ছোটখাটো একটি মূল্যবান পুস্তকালয় স্থাপন করেছিলেন। হঠাৎ বাসায় আগুন লেগে সেই সযত্নে সংগৃহীত পুস্তকাবলীর সঙ্গে তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও তাঁর অঙ্কিত চিত্রের প্রশংসিত নমুনা প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নব নব গীত শুনে রেঙ্গুনের বাঙালীরা আনন্দে মেতে উঠতেন—বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল অপূর্ব। কবি নবীনচন্দ্র সেন নিজের সম্বর্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীত শুনে তাঁকে নাকি 'রেঙ্গুন-রত্ন' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

রেঙ্গুন-প্রবাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা হচ্ছে এই ঃ ওখানে গিয়েছিলেন তিনি অজ্ঞাতবাস করতে, কিন্তু ওখান থেকেই হল তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। সে কথা বলবার আগে আর একটি দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'নারীর মূল্য', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি আরো অনেক শ্রেষ্ঠ রচনার জন্ম ঐ রেঙ্গুনেই। সেজন্যেও তাঁর সাহিত্য-জীবনে রেঙ্গুনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং রেঙ্গুন আশ্রয় না দিলে বাংলার শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যতাড়িত জীবন কোন্ পথে ছুটত, সেটাও মনে রাখবার কথা।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে, কলকাতায় তাঁর অজ্ঞাতে তখন এক কাণ্ড হল। শ্রীমতী সরলা দেবী তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় থেকে তাঁর নামে কাগজ চালান। সৌরীন্দ্র জানতেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাবার সময়ে তাঁর রচনাগুলি রেখে গেছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। সৌরীন্দ্রমোহন সুরেনবাবুর কাছ থেকে ছোট উপন্যাস 'বড়দিদি' আনিয়ে তিন কিস্তিতে 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন। শরৎ-চন্দ্রের মত নেওয়া হল না, কারণ তাঁদের হয়তো সন্দেহ ছিল যে, মত নিতে গেলে গল্প ছাপা হবে না। এটা ১৩১৪ সালের কথা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

'এই 'বড়দিদি' সম্পর্কে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে। 'বড়দিদি' যখন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় তখন নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'

চলছিল এবং তার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী'তে 'বড়-দিদি'র প্রথম কিস্তি পাঠ করে 'বঙ্গদর্শনে'র কার্যাধ্যক্ষ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজের কাগজ বঙ্গদর্শনের দাবি অগ্রাহ্য করে 'ভারতী'তে লেখা দেওয়ার অপরাধে গুরুতরভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করেন। অপরাধ মোচনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তা হয়েছে, কখনো হয়ত ওরা কবিতা-টবিতা সংগ্রহ করে রেখে থাকবে, প্রকাশ করেছে।' শৈলেশচন্দ্র চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'কবিতা-টবিতা কি বলছেন মশায়? উপন্যাস!' কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ত অবাক! বললেন, 'উপন্যাস কি বলছ শৈলেশ? উপন্যাস লিখলামই বা কখন আর ভারতীতে তা প্রকাশিত হলই বা কেমন করে? তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভুল করছ।' পকেটের মধ্যে প্রমাণ বর্তমান তবু বলবেন ভুল করছ!' বিরক্তি-গম্ভীর মুখে পকেট থেকে সদ্য প্রকাশিত 'ভারতী' বার করে 'বড়দিদি'র পাতাটি খুলে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে স্থাপন করে শৈলেশবাবু বললেন, 'নাম না দিলেই কি এ আপনি লুকিয়ে রাখতে পারেন? এখনো কি অস্বীকার করছেন?' শৈলেশচন্দ্রের অভিযোগের প্রাবল্যে ঔৎসুক্য বশতই হোক অথবা বড়দিদির প্রথম দু'চার লাইন পড়ে আকৃষ্ট হয়েই হোক, রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সমস্ত লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করলেন, তারপর বললেন, 'লেখাটি সত্যিই ভারী চমৎকার—কিন্তু তবুও আমার বলে স্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ লেখাটি সত্যই অন্য লোকের।' রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শৈলেশচন্দ্র ক্ষণকাল নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, 'আপনার নয়?' এ অবশ্য প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের আকারে বিস্ময় প্রকাশ করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই অনাবশ্যক প্রশ্নের মুখে কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন।'

'বড়দিদি' প্রথম প্রকাশের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পেরেছিল বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু

যাঁরা লেখার পাকা কারবারী, তাঁরা এই নূতন লেখকটির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে দেখে, শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে কৌতূহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। সে-সব দৃষ্টি শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে পারলে না। এবং শরৎচন্দ্রও জানলেন না যে, তাঁর জন্যে কোথাও কোন কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে! (এখানে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। পরে শরৎচন্দ্রের নাম যখন দেশব্যাপী, তখন একমাত্র 'পরিণীতা' ছাড়া আর কোন উপন্যাসেরই 'বড়দিদি'র মতন এত বেশী সংস্করণ হয়নি।)

তিনি তখন কেরানী। তিনি তখন সংসারী। এমন কি জীবন-যাত্রার দিক দিয়েও তিনি তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। দুর্লভ সরকারী চাকরি করেন, ক্রমেই মাহিনা বাড়বার সম্ভাবনা, আহারের ভয় আর নেই। 'গল্পরচনা অকেজোর কাজ', তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে যে দু-চারজন নবীন সাহিত্যযশোপ্রার্থী তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা মাঝে মাঝে প্রবাসী বন্ধুর কথা ভাবেন। যে দু-চারজন সাহিত্যিকের 'বড়দিদি' ভালো লেগেছিল, তাঁদের চোখে শরৎচন্দ্রের আর কোন নূতন লেখা এসে পড়ল না, তাঁরা 'বড়দিদি'র কথাও ভুলে গেলেন। নব্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব প্রতিভা যে মগের মুল্লুকে অজ্ঞাতবাস করছে, এমন সন্দেহ তখন কেউ করতে পারেনি।

প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন

'একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য সেবার ডাক এলো তখন যৌবনের দাবি শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম, ভয়ের কথা মনেই হল না।

আঠার বৎসর পরে হঠাৎ একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার নিকট থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—কোন রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য-সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোটগল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাংলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।'

উপরের কথাগুলি শরৎচন্দ্রের। ঐ হল তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে

পুনরাগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু ব্যাপারটা আমরা একটু খুলেই বলতে চাই। কারণ আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে প্রায় সমস্ত ঘটনাই। এবং এখন থেকে শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখবার জন্যে আমাদের আর জনশ্রুতির বা অন্য কোন লেখকের উপরে নির্ভর করতে হবে না।

'যমুনা' একখানি ছোট মাসিক কাগজ। 'লক্ষ্মীবিলাস তৈলে'র স্বত্বাধিকারীরা প্রথমে এই কাগজখানি বের করেন। তারপর এর ভার নেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল। সে হচ্ছে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। প্রথমে 'যমুনা'র গ্রাহক দুই শতও ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখনকার উদীয়মান এবং কয়েকজন নাম-করা লেখক লেখা দিয়ে, 'যমুনা'কে সাহায্য করতেন। যেমন স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় কবি রসময় লাহা, স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ পাল, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রলাল রায়, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘটক, স্বর্গীয় ইন্দিরা দেবী, ডক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের এই উক্তিটির মধ্যে অতিরঞ্জন আছে— প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেহই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না।' উপরে যাঁদের নাম করা হল তাঁদের অনেকেই তখন জনসাধারণের কাছে শরৎচন্দ্রের চেয়ে ঢের বেশী বিখ্যাত এবং তাঁদের সাহায্যে অনেক বড় মাসিকপত্র চলছে।

তবু যে 'যমুনা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রকে নিজের কাগজের প্রধান লেখক করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে

উঠলেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, শরৎচন্দ্রের মধ্যে তিনি প্রথম থেকেই বৃহৎ প্রতিভার অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। ফণীন্দ্রনাথের অমন অতিরিক্ত আগ্রহ না থাকলে শরৎচন্দ্রকে পুনর্বার সাহিত্যের নেশা অত সহজে পেয়ে বসত না বোধ হয়। একখানি বিখ্যাত মাসিকপত্রে সম্প্রতি বলা হয়েছে, শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করার জন্যে 'স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের দাবি সর্বাগ্রগণ্য'। একথা সম্পূর্ণ অমূলক। শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রেও (২৮-৩-১৯১৬) দেখেছি, তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই ফণীবাবুকে লিখেছেন: 'আপনার claim যে আমার উপর first তাহাতে আর সন্দেহ কি?' শরৎচন্দ্রকে পুনর্বার কলম ধরাবার জন্যে প্রমথবাবু প্রথমে কোন চেষ্টাই করেছেন বলে জানি না। এ-সম্পর্কে প্রমথবাবুর কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব। আপাতত কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শরৎচন্দ্রকে আবার সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়িভাবে আনবার জন্যে যাঁরা বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

এ-সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহনের বিবৃতি উদ্ধারযোগ্য:

'১৩১৯ সাল—পূজার সময় হঠাৎ শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। আমায় বলিলেন—বড়দিদি গল্পটা আমায় পড়িতে দাও—

'বেশ মনে আছে সেদিন কালীপূজা। বেলা প্রায় দুটার সময় আমার গৃহে বাহিরের ঘরে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও আমি—বাঁধানো ভারতী খুলিয়া আমি 'বড়দিদি' পড়িতে লাগিলাম। শরৎচন্দ্র শুইয়া সে গল্প শুনিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে উঠিয়া বসেন। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন—চুপ। তাঁর চোখ অশ্রু-সজল, স্বর বাষ্পার্দ্র। শরৎচন্দ্র মুগ্ধ বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে বলিলেন—এ আমার লেখা! এ গল্প আমি লিখিয়াছি!

তাঁর যেন বিশ্বাস হয় না। আমরা তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম—লেখা ছাড়িয়া কি অপরাধ করিতেছ, বলো তো! শরৎচন্দ্র উদাস মনে

বসিয়া রহিলেন—বহুক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—লিখবো। লেখা ছাড়া উচিত হয় নাই। লেখা ভালো—আমার নিজের বুকই কাঁপিয়া উঠিতেছিল! তিনি বলিলেন—চাকরিতে একশো টাকা মাহিনা পাই। অনেককে খরচ দিতে হয়। শরীর অসুস্থ—সে দেশে আর কিছুদিন থাকিলে যক্ষ্মারোগে পড়িবেন—এমন আশঙ্কাও জানাইলেন।

আমি বলিলাম—তিন মাসের ছুটি লইয়া আপাতত কলিকাতায় চলিয়া এসো। মাসে একশো টাকা উপার্জন হয়—সে ব্যবস্থা আমরা করিয়া দিব।

শরৎচন্দ্র কহিলেন—দেখি।

তার প্রায় তিন মাস পরে। শরৎচন্দ্র আবার কলিকাতায় আসিলেন।

'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্র পাল আমায় ধরিয়াছেন—ঐ 'যমুনা'কে তিনি জীবন-সর্বস্ব করিতে চান, আমার সহযোগিতা চাহেন।

শরৎচন্দ্র আসিলে তাঁকে ধরিলাম—এই যমুনার জন্য লিখিতে হইবে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—একখানা উপন্যাস 'চরিত্রহীন' লিখিতেছি। পড়িয়া দ্যাখো চলে কি না।

প্রায় পাঁচ আনা অংশ লেখা 'চরিত্রহীনে'র কপি তিনি আমার হাতে দিলেন। পড়িলাম। শরৎচন্দ্র কহিলেন—নায়িকা কিরণময়ী। তার এখনো দেখা পাও নাই। খুব বড় বই হইবে।

চরিত্রহীন যমুনায় ছাপা হইবে স্থির হইয়া গেল।—তিনি অনিলা দেবী ছদ্মনামে 'নারীর মূল্য' আমায় দিয়া বলিলেন—আমার নাম প্রকাশ করিয়ো না। আপাতত যমুনায় ছাপাও।

তাই ছাপানো হইল। তারপর দিলেন গল্প—'রামের সুমতি।' যমুনায় ছাপা হইল। বৈশাখের যমুনার জন্য আবার গল্প দিলেন—'পথনির্দেশ।'

শরৎচন্দ্র এই সময়ে 'যমুনা'-সম্পাদককে রেঙ্গুন থেকে যে-সব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলি পড়লেই বেশ বুঝা যায় যে, পাথর-চাপা উৎসের মুখ থেকে কেউ পাথর সরিয়ে দিলে উৎস যেমন কিছুতেই আর নিজের উচ্ছ্বসিত গতি সংবরণ করতে পারে না, শরৎচন্দ্রের অবস্থা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। অনেক দিন চেপে-রাখা সাহিত্যের উন্মাদনা আবার নূতন মুক্তির পথ পেয়ে শরৎচন্দ্রকেও এমনি মাতিয়ে তুলেছিল যে 'যমুনা'র ভালো-মন্দের জন্যে যেন সম্পাদকের চেয়ে তাঁরই দায়িত্ব ও মাথাব্যথা বেশী! একলাই প্রত্যেক সংখ্যার সমস্তটা লিখে ভরিয়ে দিতে চান এবং একাধিকবার তা দিয়েছেনও। এমন কি কেবল গল্প নয়, কবিতা ছাড়া বাকি প্রত্যেক বিষয় নিয়ে কলম চালাবার ইচ্ছাও তাঁর হয়েছিল। মাঝে মাঝে ছদ্মনামে তিনি সমালোচনা পর্যন্ত লিখতে ছাড়েননি। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে 'নারীর লেখা' ও 'কাণকাটা' নামে প্রবন্ধ দুটি; যুক্তি-সঙ্গত মতামত, সতেজ ভাষা এবং হাস্য ও বিদ্রূপরসের জন্যে সমালোচক শরৎচন্দ্রকে মনে রাখবার মত; কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলীতে ও-দুটি রচনা এখনো পুনর্মুদ্রিত হয়নি।

'যমুনা'য় প্রথমেই বেরুলো শরৎচন্দ্রের নূতন গল্প 'রামের সুমতি'। এ গল্পটির ভিতরে ছিল জনপ্রিয়তার অপূর্ব উপাদান এবং শরৎচন্দ্রের পরিপক্ক হাতের লিপিকুশলতা। তার উপরে 'রামের সুমতি'র আর একটি মস্ত বিশেষত্ব হচ্ছে, সার্বজনীনতায় সে অতুলনীয়। কারণ 'রামের সুমতি' কেবল বয়স্ক পাঠকের উপযোগী নয়, তাকে অনায়াসেই শিশু-সাহিত্যেরও সমুজ্জ্বল কোহিনূর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আবির্ভাবের জন্যে এমন আবালবৃদ্ধ-বনিতার উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে শরৎচন্দ্র নিজের আশ্চর্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কারণ সেই একটিমাত্র গল্প সর্বশ্রেণীর পাঠককে বুঝিয়ে দিলে যে, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন এক অসাধারণ প্রতিভার উদয় হয়েছে।

সেদিনের কথা মনে আছে। তখন 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'নব্যভারত' প্রভৃতি প্রধান পত্রিকায় লিখে অল্পবিস্তর নাম কিনেছি —অর্থাৎ সম্পাদকরা লেখা পেলে বাতিল করবার আগে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করেন। কিন্তু 'রামের সুমতি' পড়ে নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারলুম না। একেবারে এত শক্তি নিয়ে কি করে তিনি দেখা দিলেন? সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছ থেকে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলুম—কে এই শরৎ চট্টোপাধ্যায়? কোথায় থাকেন, কি করেন? অনুসন্ধানে জানতে পারলুম, শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ লেখক হননি, ১৩১৪ সালে তাঁরই লেখনীজাতা 'বড়দিদি' 'ভারতী'র আসরে গিয়ে হাজিরা দিয়েছে। মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার ছিল, কলম ধরেই কেউ পুরোদস্তুর লেখক হতে পারে না; 'রামের সুমতি'র শরৎচন্দ্র সেই সংস্কারের মূল আল্‌গা করে দিয়েছিলেন। এখন আশ্বস্ত হয়ে বুঝলুম, শরৎচন্দ্র নূতন লেখক নন—'রামের সুমতি'র পিছনে আছে আত্ম-সমাহিত সাধকের বহুদিনের গভীর সাধনা! আর্টের আসর আর 'ম্যাজিকে'র আসর এক নয়—এক মিনিটে এখানে ফলন্ত আমগাছ মাথা চাগাড় দিয়ে ওঠে না।

১৩২০ সালের বৈশাখ থেকেই শরৎচন্দ্র 'যমুনা' তথা বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন পূর্ণ উত্তমে। ঐ প্রথম সংখ্যাতেই বেরুলো তাঁর পুরাতন ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাস 'চন্দ্রনাথ', নবলিখিত ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ 'নারীর মূল্য' ও সদ্যরচিত বড় গল্প 'পথনির্দেশ'। 'নারীর মূল্যে'র নূতন রকম নবযুগের উপযোগী জোরালো যুক্তি এবং 'পথনির্দেশে'র লিপিকুশলতা আবার সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। (যদিও জনপ্রিয়তার হিসাবে এ গল্পটি 'রামের সুমতি'র মতন সাফল্য অর্জন করেনি)। শ্রাবণ সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করলে 'বিন্দুর ছেলে'। এ গল্পটি সাহিত্যক্ষেত্রে যে-উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তার আর তুলনা নেই এবং এর পরে কথাসাহিত্যের আসরে শরৎচন্দ্রের স্থান কোথায়, সে-সম্বন্ধে কারুর মনে আর কোন সন্দেহ রইল না।

১৩২০ সালের 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ঃ ১। 'নারীর মূল্য' সম্পর্কীয় পাঁচটি প্রবন্ধ, ২। কানকাটা (প্রতিবাদ বা সমালোচনা), ৩। গুরুশিষ্য-সংবাদ (প্রচ্ছন্ন হাস্যরসাত্মক নাট্য-চিত্র), ৪। পথনির্দেশ (বড় গল্প), ৫। বিন্দুর ছেলে (বড় গল্প), ৬। পরিণীতা (বড় গল্প), ৭। চন্দ্রনাথ (উপন্যাস) ও ৮। চরিত্রহীন (উপন্যাস)।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। 'রামের সুমতি' বেরুবার অনতিকাল পরেই শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক-মণ্ডলীভুক্ত) একদিন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়ে ঐ গল্পটি পড়ে শুনিয়ে এসেছেন। বিজয়বাবু প্রশংসায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এবং তাঁর মুখে শুনে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও 'রামের সুমতি' পাঠ করে অভিভূত হয়ে যান। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় মহাসমারোহে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের উদ্যোগ-পর্ব চলছে। দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে'র লেখকরূপে পাবার জন্যে আগ্রহবান হন। দ্বিজেন্দ্রলালের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন একটি শৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় চলছিল এবং সেখানকার সভ্য স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন শরৎচন্দ্রের পরিচিত ব্যক্তি। তিনি শরৎচন্দ্রকে দ্বিজেন্দ্রলালের আগ্রহের কথা জানালেন এবং তার ফলে লাভ করলেন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের প্রথম অংশের পাণ্ডুলিপি। সকলেই জানেন, 'চরিত্রহীন' কোনকালেই রুচিবাগীশদের মানসিক খাদ্যে পরিণত হতে পারবে না। রুচিবাগীশ বলতে যা বোঝায় দ্বিজেন্দ্রলাল তা ছিলেন না বটে, কিন্তু তার কিছু আগেই তিনি করেছিলেন 'কাব্যে দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে বিষম যুদ্ধঘোষণা। কাজেই তাঁর নূতন কাগজে তিনি 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না। 'চরিত্রহীন' বাতিল হয়ে ফিরে আসে এবং পরে 'যমুনা'য় বেরুতে আরম্ভ করে। এই প্রত্যাখ্যানের জন্যে শরৎচন্দ্র মনে যে-আঘাত পেয়েছিলেন, সেটা

তখনকার অনেক সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে প্রকাশ না করে পারেননি। কিন্তু সেজন্যে আত্মশক্তির উপরে তাঁর নিজের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি কিছুমাত্র। 'যমুনা'তে যখন 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হতে থাকে তখনও একশ্রেণীর লোক তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন—অটল।

১৩২০ সালে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সে-সময়ে 'যমুনা'র আফিস উঠে এসেছে ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। শ্রীমানী মার্কেটের সামনে এখন যেখানে ডি. রতন কোম্পানির আলোক-চিত্রালয়, ঐখানে ছাদের উপরে সতরঞ্চ বিছিয়ে রোজ সন্ধ্যায় বসত 'যমুনা'র সাহিত্য-আসর। শরৎচন্দ্রকেও সেখানে দেখা যেত প্রত্যহ। ওখানকার কিছু কিছু বিবরণ পরিশিষ্টে মৎলিখিত 'শরতের ছবি'র মধ্যে পাওয়া যাবে।

এবারে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এলেন বিজয়ীর বেশে! 'যমুনা'য় প্রকাশিত রচনাবলী তখন তাঁকে সাহিত্যিক ও পাঠক-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ করে তুলেছে এবং 'যমুনা'-কার্যালয় থেকেই গ্রন্থাকারে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' মুদ্রিত হয়েছে। প্রতিদিনই নব নব অপরিচিত ভক্ত একান্ত সুপরিচিতের মতন আসেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হতে এবং আরো আসেন মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতন প্রকাশকের দল। চারিদিক থেকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের অন্ত নেই! শরৎচন্দ্র এবারে এসে বাসা বেঁধেছিলেন মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের এক মোড়ে। সেই বাসা তুলে দিয়ে আবার যখন তিনি রেঙ্গুনে ফিরে গেলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আর তাঁকে কেরানীগিরি করে সুদূর প্রবাসে জীবনযাপন করতে হবে না! মানুষের পক্ষে এই সফল উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুভূতি কী সুমধুর!

হলও তাই। পর-বৎসরেই কেরানী শরৎচন্দ্র হলেন পুরোপুরি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। এবং তখন তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থাবলী প্রকাশের ভার পেলেন সর্বপ্রথমে 'যমুনা'-আসরেরই অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত

সুধীরচন্দ্র সরকার,—এখন 'রায় এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স' নামক সুবিখ্যাত পুস্তকালয়ের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, শরৎচন্দ্রের শেষ পুস্তক 'ছেলেবেলার গল্প' প্রকাশেরও অধিকার পেয়েছেন ঐ সুধীরবাবুই।

ঐ সময়ে শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা কতখানি চরমে উঠেছিল, একটিমাত্র ঘটনাই তা প্রমাণিত করবে। 'এম. সি. সরকার' থেকে যখন 'চরিত্রহীন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল, তখন সেই সাড়ে তিন টাকা দামের গ্রন্থ প্রথম দিনেই সাড়ে চার শত খণ্ড বিক্রী হয়ে যায়! আর কোন বাঙালী লেখক বাংলাদেশের পাঠক-সমাজের ভিতরে প্রথম দিনেই এত মোটা প্রণামী পেয়েছেন বলে শুনিনি! পরে তাঁর 'পথের দাবি' নাকি এর চেয়েও বেশী আদর পেয়েছিল!

গৌরবময় সাহিত্য-জীবন

শরৎচন্দ্রের মতন বৃহৎ প্রতিভা 'যমুনা'র মতন ছোট পত্রিকায় বেশীদিন বন্দী থাকবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি। অবশ্য শরৎচন্দ্র যদি 'যমুনা'কে ত্যাগ না করতেন, তাহলে 'যমুনা' যে কেবল আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকত তা নয়, আকারে ও প্রচারে আজ সে হয়তো বিপুল হয়ে উঠতে পারত ; কারণ ১৩২০ সালেই তার গ্রাহক-সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল আশাতীত। কিন্তু 'যমুনা' বেশীদিন আর শরৎচন্দ্রকে ধরে রাখতে পারলে না। 'যমুনা'র সম্পাদকরূপে পরে শরৎচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হল বটে, কিন্তু 'ভারতবর্ষ' তার সবল বাহু বাড়িয়ে তখন শরৎচন্দ্রকে টেনে নিয়েছে। সম্পাদক শরৎচন্দ্রের চেয়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের পসার বেশী। তাঁর সমস্ত নূতন রচনা 'ভারতবর্ষে'ই প্রকাশিত হতে লাগল।

'যমুনা'র সর্বনাশ হল বটে, তবে শরৎচন্দ্রের দিক থেকে এটা হল একটা মঙ্গলময় ঘটনা। কারণ 'যমুনা' ধনীর কাগজ ছিল না, শরৎচন্দ্রকে সে কোনরকম অর্থসাহায্য করতে পারত না। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারীরা হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্বপ্রধান প্রকাশক এবং তাঁদের নিয়মিত অর্থসাহায্যের উপরেই নির্ভর করে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে শরৎচন্দ্র দাসত্ব ত্যাগ করে সাহিত্য-জীবনকেই গ্রহণ করলেন একান্তভাবে। শরৎচন্দ্রের মতন শিল্পীকে স্বাধীনতা দিয়ে 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারীরা যে বঙ্গসাহিত্যেরই উপকার করলেন, এ সত্য মানতেই হবে। এবং এইখানেই স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কৃতিত্বের কথা মনে ওঠে। কারণ শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে'র বড় আসরে হাজির করবার জন্যে তিনি যথেষ্ট—এমন কি প্রাণপণ চেষ্টাই করেছিলেন।

'যমুনা'য় কথাসাহিত্যের যে উৎসব আরম্ভ, 'ভারতবর্ষে'র মস্ত আসরে স্থানান্তরিত হয়ে তার সমারোহ বেড়ে উঠল। শরৎচন্দ্র তখন বাংলাসাহিত্যের জন্যে নিজের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করলেন, তাঁর লেখনীর মসী-ধারা অকস্মাৎ যেন প্রপাতে পরিণত হতে চাইলে বিপুল আনন্দে! সে তো বেশীদিনের কথা নয়, আজও অধিকাংশ পাঠকের মনেই তখনকার সেই বিস্ময়কর মহোৎসবের স্মৃতি নিশ্চয়ই বিচিত্র রঙের রেখায় আঁকা আছে! মোপাসাঁর সাহিত্য-জীবনের মত শরৎচন্দ্রের নবজাগ্রত সাহিত্য-জীবনও প্রধানত একযুগের মধ্যেই মাতৃভাষার ঠাকুরঘরে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল। প্রতি মাসে নব নব উপহার—নব নব বৈচিত্র্য—নব নব বিস্ময়! পরিচিতরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ঐ তো এক রোগজীর্ণ, শীর্ণদেহ অতি সাধারণ ছটফটে মানুষ, যার মুখে ক্ষুদ্র সাহিত্যিকদেরও মত বড় বড় বুলি শোনা যায় না, বিদ্বানদের সভায় গিয়ে যিনি দুটো লাইনও গুছিয়ে বলতে পারেন না, রাজপথের জনপ্রবাহের মধ্যে যিনি কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না, তাঁর মধ্যে কেমন করে সম্ভব হল এই মহামানুষোচিত শক্তির প্রাবল্য, নরজীবন সম্বন্ধে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, মানবতার আদর্শ সম্বন্ধে এই উদার উচ্চধারণা, সংকীর্ণ প্রচলিতের বিরুদ্ধে এই সগর্ব বিদ্রোহিতা এবং কল্পনাতীত সৌন্দর্যের এই অফুরন্ত ঐশ্বর্য!

কেবল 'ভারতবর্ষ' নয়, পরে মাঝে মাঝে 'বঙ্গবাণী' 'নারায়ণ' ও 'বিচিত্রা' প্রভৃতি আসরে গিয়েও শরৎচন্দ্র দেখা দিয়ে এসেছেন। তাঁর কোন কোন উপন্যাস একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে (যেমন 'বামুনের মেয়ে'), কোন কোন উপন্যাস সমাপ্ত হয়নি, কোনখানির পাণ্ডুলিপি নষ্টও হয়ে গিয়েছে (যেমন 'মালিনী')। 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস বা গল্পগুলি লিখেছিলেন: বিরাজ-বৌ, পণ্ডিত-মশাই, বৈকুণ্ঠের উইল, স্বামী, মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, আঁধারে আলো, শ্রীকান্ত (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ

পর্ব), দত্তা, পল্লীসমাজ, মালিনী, অরক্ষণীয়া, নিষ্কৃতি, গৃহদাহ, দেনা-পাওনা, বামুনের মেয়ে, নববিধান, হরিলক্ষ্মী, মহেশ, পথের দাবি, শেষ-প্রশ্ন, বিপ্রদাস, জাগরণ (অসমাপ্ত), অনুরাধা, সতী ও পরেশ, আগামী কাল (অসমাপ্ত), শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত), এবং ভালো-মন্দ (১ম পরিচ্ছেদ)। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধও লিখেছেন। শেষের দিকে শিশু-সাহিত্যেরও প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু এ-বিভাগে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য নূতন কিছু করবার আগেই তাঁকে মহাকালের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে। তিনি অনেক পত্র রেখে গেছেন, তারও অনেকগুলির মধ্যে শরৎ-প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ আছে এবং একত্রে প্রকাশ করলে সেগুলিও সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শরৎচন্দ্রের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। 'নারায়ণ' পত্রিকার জন্যে গল্প নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে একখানি সই-করা চেক পাঠিয়ে দিয়ে দেশবন্ধু লিখেছিলেন—আপনার মতন শিল্পীর অমূল্য লেখার মূল্য স্থির করবার স্পর্ধা আমার নেই, টাকার ঘর শূন্য রেখে চেক পাঠালুম, এতে নিজের খুশিমত অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারেন। ....সাধারণের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রও হয়তো বোকার মতন কাজ করেছিলেন,—কারণ নিজের অসাধারণতার মূল্য নিরূপণ করেছিলেন তিনি মাত্র একশো টাকা!

বর্তমান ক্ষেত্রে শরৎ-সাহিত্য নিয়ে আমরা কোন কথা বলতে চাই না, কারণ শরৎচন্দ্র পরলোকে গমন করলেও তাঁর অস্তিত্বের স্মৃতি এখনো আমাদের এত নিকটে আছে যে, সমালোচনা করতে বসলে আমরা হয়তো যথার্থ বিচার করতে পারব না; লেখনী দিয়ে হয়তো কেবল প্রশংসার উচ্ছ্বাসই নির্গত হতে থাকবে, কিন্তু তাকে সমালোচনা বলে না। এবং এখন উচিত কথা বলতে গেলেও অনেকের কাছে তা অন্যায়-রকম কঠোর বলে মনে হতে পারে। সুতরাং ও-বিপদের মধ্যে না যাওয়াই সঙ্গত।

অতঃপর বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের কথা

সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই। তাঁর যে-উপন্যাস নাট্যাকারে সর্বপ্রথমে সাধারণ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার নাম হচ্ছে 'বিরাজ-বৌ'। নাট্যরূপদাতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যমঞ্চ ছিল 'স্টার থিয়েটার'। যশস্বী নট-নটীরাই এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করেছিলেন বটে,কিন্তু নানা কারণে 'বিরাজ-বৌ'য়ের পরমায়ু সুদীর্ঘ হয় নি।

তারপর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন 'মনোমোহন নাট্য-মন্দিরে'র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন 'ভারতী'-সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিক বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে শরৎচন্দ্র পুরানো বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কীয় একখানি নূতন নাটক লেখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্রের অনুরোধে 'নাচঘর' সম্পাদক সেই সুখবর জনসাধারণেরও কাছে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন। শিশিরকুমার সে-সময়ে 'ভারতী'র আসরে নিয়মিতরূপে হাজিরা দিতেন। নূতন নাটক নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তিনি জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন বলেও স্মরণ হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের নিজেরও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তিনি নাটক লিখতে পারেন। এবং তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদেরও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যাঁর উপন্যাসে এত নাটকীয় ক্রিয়া, সংলাপ ও ঘটনা-সংস্থান আছে, তাঁর লেখনী নিশ্চয়ই নাট্য-সাহিত্যকে নূতন ঐশ্বর্য দান করতে পারবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত কারুর বিশ্বাসই সত্যে পরিণত হল না। যদিও এখনো আমাদের বিশ্বাস আছে যে, নাটক লিখলে শরৎচন্দ্রের লেখনী বিফল হ'ত না।

শিশিরকুমার তখন 'নাট্যমন্দিরে' বসে নূতন নাটকের অভাব অনুভব করছেন এবং থিয়েটারি নাট্যকারদের তথাকথিত রচনা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। ওদিকে 'ভারতী' ইতিমধ্যে আবার শ্রীমতী সরলা দেবীর হস্তগত হয়েছে। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসকে 'ষোড়শী' নামে নাট্যাকারে প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনা দেখে শিশিরকুমার তখনি শরৎচন্দ্রের আশ্রয় নিলেন। শরৎচন্দ্রের

হস্তে পরিবর্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হয়ে 'ষোড়শী' নাট্য-মন্দিরে'র পাদ-প্রদীপের আলোকে দেখা দিয়ে কেবল সফলই হল না, নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করলে বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র আর একবার উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, 'এইবারে আমি মৌলিক নাটক লিখব!' কিন্তু তাঁর সে উৎসাহও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

'ষোড়শী'র সাফল্য দেখে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত আরো অনেকগুলি নাটক একাধিক সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে গ্রহণ ও অভিনয় করা হয়েছিল, যথা—'পল্লীসমাজ' বা 'রমা', 'চন্দ্রনাথ', 'চরিত্রহীন', 'অচলা' ও 'বিজয়া' প্রভৃতি। অভিনয়ের দিক দিয়ে কোনখানিই ব্যর্থ হয় নি। যদিও নাটকত্বের দিক দিয়ে সবগুলি সফল হয়েছে বলা যায় না—বিশেষত 'চরিত্রহীন'। বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রের আর কোন উপন্যাসের নাট্যরূপই 'ষোড়শী'র মত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি।

বাংলার চলচ্চিত্র প্রথম থেকেই শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে অবলম্বন করতে চেয়েছে। এ-বিভাগেও সর্বাগ্রে শরৎচন্দ্রকে পরিচিত করেন শিশিরকুমার, তাঁর 'আঁধারে আলো'র চিত্ররূপ দেখিয়ে। তারপর নানা চিত্র-প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সাহায্যে অনেকগুলি ছবি (সবাক বা নির্বাক) তৈরি করেছেন, যথা—'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' (সবাক ও নির্বাক), 'স্বামী', 'শ্রীকান্ত', 'পল্লীসমাজ', 'দেনা পাওনা', 'বিজয়া', 'চরিত্রহীন' ও 'পণ্ডিত মশাই'। এদের মধ্যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত'। অন্যগুলি অল্পবিস্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু সকলকার উপরে টেক্কা দিয়েছে সবাক 'দেবদাস', কি চিত্রকথা হিসাবে আর কি চিত্রশিল্প হিসাবে সে অতুলনীয়! চলচ্চিত্র জগতে আনাড়ি পরিচালকের পাল্লায় পড়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার দান কলঙ্কিত হয়েছে বারংবার, সাধারণ রঙ্গালয়ে তা এতটা দুর্দশাগ্রস্ত হয়নি কখনো। তার প্রধান

কারণ, সাহিত্যশিক্ষাহীন বাঙালী পরিচালকদের দৃঢ় ধারণা, গল্প-লেখকদের চেয়ে তাঁরা ভালো করে গল্প বলতে পারেন। এই মূর্খোচিত ধারণার কবলে পড়ে বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের নাম বহুবার অপমানিত হয়েছে। যারা বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রকে মানে না, সে-সব হতভাগ্যের কাছে অন্যান্য লেখকরা তো নগণ্য! কিন্তু শরৎচন্দ্রের নাম রেখেছে 'দেবদাস',—যদিও চলচ্চিত্র-জগতে মনস্তত্ত্ব-প্রধান কোন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেরই মর্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করি না। শরৎচন্দ্রের আরো কয়েকখানি উপন্যাস নাট্যরূপলাভের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাঁর কোন কোন মানসসন্তান ইতিমধ্যেই ছবিতে হিন্দী কথা কয়েছে, ভবিষ্যতে আরো অনেকেই কইতে পারে।

শরৎচন্দ্রের বহু রচনা য়ুরোপের ও ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচুর সমাদর লাভ করেছে, এখানে তাদের নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবার ঠাঁই নেই। আরো কিছুকাল জীবিত থাকলে তিনি হয়তো 'নোবেল-পুরস্কার' পেয়ে সমগ্র পৃথিবীর বিস্মিত চিত্ত আকর্ষণ করতে পারতেন।

একদৃষ্টিতে যতটা দেখা যায়, আমরা শরৎচন্দ্রের জীবন ততটা দেখে নিয়েছি বোধহয়। যৌবনে যে-শরৎচন্দ্রের দেশে মাথা রাখবার ছোট্ট একটুখানি ঠাঁই জোটে নি, ট্যাঁকে দুটি টাকা সম্বল করে যিনি মরিয়া হয়ে মগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে তিনিই যে দেশে ফিরে এসে বালিগঞ্জে সুন্দর বাড়ি, রূপনারায়ণের তটে চমৎকার পল্লী-আবাস তৈরি করবেন, মোটরে চ'ড়ে কলকাতার পথে বেড়াতে বেরুবেন, একদিন যাঁরা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকান নি, তাঁরাই এখন তাঁর কাছে ছুটে এসে বন্ধু বা আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে ব্যস্ত হবেন, এটা কেহই কল্পনা করতে পারেন নি বটে, কিন্তু এ-সব খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কারণ এমন ব্যাপার আরো বহু প্রতিভাহীন ও বিদ্যাহীন ব্যক্তির ভাগ্যেও ঘটতে দেখা গিয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এইঃ শরৎচন্দ্রের জীবনে আলাদীনের প্রদীপের মতন কাজ করেছে বাংলা-সাহিত্য। বাংলা-সাহিত্য গরিবকে দু'দিনে ধনী করে তুলেছে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। বড় বড় বাঙালী সাহিত্যিকদের দিকে তাকিয়ে কি দেখি? দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন জমিদার। হেমচন্দ্র যত দিন ওকালতি করতেন, কবিতা লিখতেন নির্ভাবনায়; কিন্তু অন্ধত্বের জন্যে ওকালতি ছাড়বার পর তাঁকে পরের কাছে হাত পেতে বাকী জীবন কাটাতে হয়েছে। এবং সাহিত্য অত বড় প্রতিভাবান মাইকেলকে কোন সাহায্যই করে নি—হাসপাতালে গিয়ে তিনি মারা পড়েছেন একান্ত অনাথের মত। বাংলাদেশের বড় সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রই কেবল সাহিত্যের জোরে দুই পায়ে ভর দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন,—ভারতীর পুরোহিত হয়েও লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে করেছেন হস্তগত!

নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি ও নিজের টাকার কাঁড়ির গর্বে শরৎচন্দ্র একদিনের জন্যেও একটুও পরিবর্তিত হন নি, তাঁর মুখে কেউ কোনদিন দেমাকের ছায়া পর্যন্ত দেখে নি। সাদাসিধে পোশাকে, সরল হাসি-মাখা মুখে, বিনা অভিমানে তিনি আগেকার মতই আলাপী-লোকদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন, যাঁরা তাঁকে চিনত না তাঁর কথাবার্তা শুনেও তারা বুঝতে পারত না যে তিনি একজন পৃথিবীবিখ্যাত অমর সাহিত্যস্রষ্টা! ভানই যাদের সর্বস্ব সেই পুঁচ্‌কে লেখকরা শরৎচন্দ্রকে দেখে কত শিক্ষাই পেতে পারে!

রেঙ্গুন থেকে চাকরিতে জবাব দিয়ে দেশে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র কয়েক বৎসর শিবপুরে বাসা ভাড়া করে বাস করেন। কিন্তু শহরের একটানা ভিড়ের ধাক্কা সইতে না পেরে শেষটা তিনি রূপনারায়ণের রূপের ধারায় ধোয়া পাণিত্রাসে (সাম্‌তাবেড়) নিরালা পল্লী-আবাস বানিয়ে সেইখানেই বাস করতে থাকেন। বাগানে ঘেরা দোতলা

বাড়ি, লেখবার ঘরে বসে নটিনী নদীর নৃত্যলীলা দেখা যায় ; পল্লীকথার অপূর্ব কথকের পক্ষে এর চেয়ে মনোরম স্থান আর কোথায় আছে ? কখনো লেখেন, কখনো পড়েন, কখনো ভাবেন ; কখনো বাগানে গিয়ে ফুলের চারা আর ফলের গাছের সেবা করেন ; কখনো পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে যত্নে পালিত মাছদের আদরে ডেকে খাবার খেতে দেন ; কখনো গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে পল্লীবাসীদের কুশল-সংবাদ নেন এবং পীড়িতদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে আসেন। এই ছিল শরৎ-চন্দ্রের কাছে আদর্শ জীবন !

কিন্তু যাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্র জনতার শ্রেণী, বহুজনধাত্রী কলিকাতা নগরীও মাঝে মাঝে বোধহয় তাঁকে প্রাণের ডাকে ডাকত ! তাই শেষ-জীবনে বালীগঞ্জেও তিনি একখানি বড় বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর তাঁর স্নেহ শহর ও পল্লীর মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

এবং শহরেও ছিল তাঁর আবাসে সকলের অবারিত দ্বার। আগন্তুকদের ভয় দেখাবার জন্যে বড়মানুষীর দিনেও তাঁর দেউড়িতে লাঠি-হাতে চাপদাড়ি দ্বারবান বসেনি কোনদিন। তাই শরৎচন্দ্রের প্রশস্ত বৈঠকখানার ভিড়ের মধ্যে দেখা যেত দেশবিখ্যাত নেতা, সাহিত্যিক ও শিল্পীর পাশে নিতান্ত সাধারণ অখ্যাত লোকদের ; হোম্‌রা-চোম্‌রা মোটরবিলাসী বাবুগণের পাশে কপর্দকহীন মলিনবাস দরিদ্রদের ; পক্ককেশ গম্ভীরমুখ প্রাচীনবৃন্দের পাশে ইস্কুলের অজাতশত্রু চপল ছোকরাদের ! শরৎচন্দ্র ছিলেন সমগ্র মানবজীবনের চিত্রকর, তাই কোনরকম মানুষকেই তিনি ত্যাগ করতে পারতেন না—তিনি ছিলেন প্রত্যেকেরই বন্ধু, তাই সবাই এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে যেত। সেইজন্যেই আজ তাঁর মৃত্যুর পরে অগুন্তি মাসিকে, সাপ্তাহিকে ও দৈনিকে স্মৃতি-কথার আর অন্ত নেই, যিনি তাঁকে একদিন দু'দণ্ডের জন্যে দেখেছেন, তিনিও শরৎ-কাহিনী লিখতে বসে গেছেন প্রবল উৎসাহে এবং তিনিও এই

ভাবটাই প্রকাশ করেছেন যে শরৎচন্দ্র তাঁকে, একান্ত স্বজনেরই মতন ভালোবাসতেন! হয়তো সেইটেই আসল সত্য, বিরাট বিশ্বের বৃহৎ আকাশ থেকে ছোট্ট তৃণকণার প্রেমে যিনি হাসতে-কাঁদতে নারাজ। সাহিত্যিক বা শিল্পী হওয়া তাঁর কাজ নয়!

তাঁর গোপন দান ছিল অনেক। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অভাব ও দীনতার হাহাকারে, তাই পরের দুঃখে তিনি অটল থাকতে পারতেন না। অনেক সময়ে ভিখারীর হাতে একমুঠো সিকি দুআনী আনী ঢেলে দিয়েছেন! দেশের ডাকে হাসিমুখে যারা শাস্তিকে মাথা পেতে নিয়েছে, তাদের পরিবারের অসহায়তার কথা ভেবে সমবেদনায় তাঁর প্রাণ ছটফট করত। তাই বহু রাজবন্দীর পরিবারে গিয়ে পৌঁছত তাঁর অযাচিত অর্থসাহায্য। শরৎচন্দ্র নিজেও ছিলেন দেশের কাজে অগ্রণী; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়ই কংগ্রেসের কাজে মেতে উঠতেন। শেষের দিকে শরীর ভেঙে পড়াতে এদিকে হাতে নাতে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত জাতীয় কর্মক্ষেত্রেই। এক সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের লেখবার ধারা ছিল একটু স্বতন্ত্র। বহু নবীন লেখককে জানি, যাঁরা বড় বড় লেখকের রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করেন। এটা ভুল। কারণ প্রত্যেক লেখকেরই মনের গড়ন বিভিন্ন, তাই তাঁদের রচনাপ্রণালীও হয় ব্যক্তিগত। শরৎচন্দ্র আগে প্লট বা আখ্যানবস্তু স্থির করতেন না, আগে বিষয়বস্তু ও তার উপযোগী চরিত্রগুলিকে মনে মনে ভেবে রাখতেন, তারপর ঠিক করতেন তারা কি কি কাজ করবে। গতযুগের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বঙ্কিম-সহোদর স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, বঙ্কিমচন্দ্র আগে মনে-মনে

করতেন ঘটনা-সংস্থান। শরৎচন্দ্রের আর এক নূতনত্ব ছিল। প্রায়ই তাঁর মুখে শুনেছি যে, মনে-মনে নূতন উপন্যাসের কল্পনা স্থির হয়ে গেলে তিনি নাকি গোড়ার দিক ছেড়ে শেষাংশের বা মধ্যাংশের ত্থ-চারটে পরিচ্ছেদ আগে থাকতে কাগজে-কলমে লিখে রাখতে পারতেন। তাঁর 'চরিত্রহীনে'র একাধিক বিখ্যাত অংশ এইভাবে লেখা!

শরৎচন্দ্রের ঝরঝরে লেখা দেখলে মনে হয়, ভাষা যেন অনায়াসে তাঁর মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আসলে তিনি দ্রুত লেখকও ছিলেন না এবং খুব সহজে লিখতেও পারতেন না এবং লেখবার পরেও অনেক কাটাকুটি করতেন। বেশ ভেবে-চিন্তে বাক্যরচনা করতেন। বর্তমান জীবনী-লেখক 'যমুনা'র যুগে রচনায় নিযুক্ত শরৎচন্দ্রকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন একাধিকবার। তখন তাঁর মনে হয়েছিল, লিখতে লিখতে শরৎচন্দ্র যেন বিশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন! এবং প্রত্যেক ভালো লেখকেরই পক্ষে এইটেই হয়তো স্বাভাবিক! রচনাও তো জননীর প্রসব-বেদনার মত;— যন্ত্রণাময় অথচ আনন্দময়!

যশস্বী হয়ে শরৎচন্দ্র প্রায় প্রতিদিনই অসংখ্য সম্পাদকের লেখার জন্যে তাগাদা সহ্য করেছেন, অটলভাবে এবং অম্লানবদনে। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের মত তাগাদার চোটে সহসা যা তা একটা কিছু লিখে দিয়ে কারুকে কখনো তিনি খুশী করতেন না। সম্পাদকরা রাগ করবেন বলে তিনি সাহিত্যের অপমান করতে রাজী ছিলেন না— টাকার লোভেও নয়!

কথিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করা ছিল শরৎচন্দ্রের মতবিরুদ্ধ। এ ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন কদাচ। এ-বিষয়ে তিনি পুরাতনপন্থী ছিলেন। কথ্যভাষার সুদৃঢ় ত্থর্গ 'ভারতী' আসরেও গিয়ে তিনি বহুবার নিজের অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

সাহিত্য-সেবার জন্যে তাঁর ভাগ্যে প্রথম পুরস্কার লাভ হয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'জগত্তারিণী পদক'। এ-সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের পুরাতন বন্ধু, পুস্তকের প্রকাশক ও 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন : 'সভা-সমিতিকে তিনি বর্জন করিয়া চলিতেন। আমার বেশ মনে আছে যে-বারে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে 'জগত্তারিণী' মেডেল দেওয়া হয়, সেইবারের কন্‌ভোকেশনের দিনে মেডেল দিবার সময়ে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মেডেল পরিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তাই সেইদিন তিনি আমাদের দোকানের নিভৃত কোণে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।' আমরা জানি, সর্বপ্রথমে শরৎচন্দ্রকে যেদিন একটি সাহিত্য-সভার সভাপতি করা হয়, সেদিনও তিনি সুধীরচন্দ্রের পুস্তকালয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু এমন লুকোচুরি করে ছিনেজোঁক সভা-ওয়ালাদের কতদিন আর ফাঁকি দেওয়া যায়? শেষের দিকে শরৎ-চন্দ্রকে বাধ্য হয়ে সভার অত্যাচার সহ্য করতে হ'ত, কিন্তু তাঁর লাজুক ভাব কোনকালেই যায় নি। আর একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের এই রকম সভা-ভীতি দেখেছি। তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সভার ব্যাপারে তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রেরও চেয়ে পশ্চাৎপদ!

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে। মৃত্যুর অনতিকাল আগে এই 'ডক্টর' উপাধি লাভ করে হয়তো তিনি যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন—যদিও তাঁর প্রতিভার মূল্য ঐ উপাধির চেয়ে ঢের বেশী। উপাধি মানুষকেই বড় করে, প্রতিভাকে নয়।

১৩৩৯ সালে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কলকাতার টাউন-হলে 'শরৎ-জয়ন্তী'র আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে একশ্রেণীর লোক এমন অশোভন কাণ্ড করেছিল যা ভাবলে আজও লজ্জা পেতে হয়! এর আগে ও পরে জীবনে আরো বহু বৃহৎ অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র

সম্মানলাভ করেছেন, কিন্তু এখানে তার ফর্দ দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি, কারণ ও-সব শোভা পায় সুবিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতে।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের যা বলবার তা মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। তবে সাধারণ পাঠক হয়তো তাঁর আরো কোন কোন পরিচয় পেতে চাইবেন। এখানে তাই আরো কিছু বলা হল। যাঁরা এর চেয়েও বেশী কিছু চাইবেন, পরিশিষ্ট অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন।

জীবজন্তুদের প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রাণের টান ছিল চিরদিনই। খুব ছেলেবেলাতেও তিনি বাক্সে করে নানারকম ফড়িং পুষতেন, পরিচর্যা করতেন নিজের হাতে। কোন বাড়ির উঁচু আলিসা দিয়ে একটা মালিকহীন বিড়ালকে চলাফেরা করতে দেখলে তিনি দুর্ভাবনায় পড়তেন—যদি সে পড়ে যায়! পাখি, ছাগল ও বানর প্রভৃতি সব জীবকেই তিনি সমান যত্নাদর বিলিয়ে গেছেন। তাঁর পোষা দেশী কুকুর 'ভেলু' তো প্রায়-অমর হয়ে উঠেছে! 'যুবরাজ' 'বংশীবদন' প্রভৃতি আদরের ডাকে তিনি তাকে ডাকতেন! কেবল ভেলু নয়, যে-কোন পথচারী কুকুর ছিল তাঁর স্নেহের পাত্র। নিজের মোটর চালককে বলা ছিল, পথে যদি কখনো সে কুকুর চাপা দেয়, তা'হলেই তার চাকরি যাবে! তাঁর এই কুকুর-প্রীতি দেখলে কবি ঈশ্বর গুপ্তের লাইন মনে হয়ঃ

'কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!'

ভেলুর কয়েকটি গল্প পরিশিষ্টে 'শরতের ছবি'তে দেওয়া হল। পাণিত্রাসের বাগানে পুকুরের মাছরাও তাঁকে চিনত। দুটি মাছ আবার তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসত। একবার বর্ষায় রূপনারায়ণ ছাপিয়ে বাগানে জল ঢুকে সেই মাছ দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে তাঁর দুঃখ কত! তাঁর বাগানের একটি গর্তে দুটি বেজী তাদের বাচ্চা নিয়ে বাস করত। গাঁয়ের এক ছেলে সেই বাচ্চাটিকে চুরি

করে পালায়। শুনেই শরৎচন্দ্র তার বাড়িতে গিয়ে হাজির ছেলেটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সন্তানের অভাবে মা বাপের মনে কত কষ্ট হয়। কিন্তু ছেলেটি তবু বুঝল না দেখে শরৎচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তখন জোর করে বাচ্চাটিকে কেড়ে এনে আবার নেউল-দম্পতিকে ফিরিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্র যা তা খেলো কাগজে লিখতে পারতেন না। আর কোন লেখককেই তাঁর মতন নিয়মিতভাবে দামী কাগজে লিখতে দেখি নি। লেখার সরঞ্জাম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই শৌখীনতা রচনার প্রতি তাঁর পবিত্র নিষ্ঠাকেই প্রকাশ করে। তাঁর হাতে বরাবরই ফাউণ্টেন পেন দেখেছি, যখন ও-'পেনে'র চলন হয় নি, তখনো। তিনি খুব বড় ও মোটা কলম ও সূক্ষ্ম নিব ব্যবহার করতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দামী ফাউণ্টেন পেন উপহার দিতে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর হাতের লেখার ছাঁদ ছোট হলেও চমৎকার ছিল। যেন মুক্তার সারি।

তামাক ছাড়া তাঁর একদণ্ড চলত না। লেখবার সময়েও গড়গড়ায় তামাক খেতেন। কেউ তাঁকে গড়গড়া উপহার দিলে খুশী হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুও ছিলেন গড়গড়ার এমনি ভক্ত। তিনি চায়েরও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। অনেক দিনই তাঁকে আট-দশ পিয়ালা চা-পান করতেও দেখা গিয়েছে। তাঁর একটি বদ-অভ্যাস ছিল—আফিম খাওয়া।

তিনি স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারতেন না। কখনো চেয়ারের উপরে দু' পা তুলে ফেলতেন, কথা কইতে কইতে কখনো মাথার চুলের ভিতরে অঙ্গুলী সঞ্চালন করতেন, কখনো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে একবার পায়চারি করে আসতেন। সভাপতি রূপেও এ অস্থিরতা তিনি নিবারণ করতে পারতেন না।

মাঝে মাঝে গরদের জামা-কাপড়-চাদর পরতেন বটে, কিন্তু কোনদিনই তিনি ফিট্‌ফাট্ পোশাকী বাবু হতে পারেন নি। বেশীর ভাগ সময়েই আটপৌরে জামা-কাপড়ে একছুটে বেরিয়ে পড়তেন।

একসময়ে তালতলার চটি ছাড়া আর কোন জুতো পরতেন না। বাড়িতে তাঁকে হাত-কাটা জামা পরে থাকতে দেখেছি।

যৌবন-সীমা পার হবার আগেই তিনি নিজেকে বুড়ো বলে প্রচার করতে ভালোবাসতেন। একবার হাওড়ার এক সভায় রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়েই তিনি নিজের প্রাচীনতার গর্ব প্রকাশ করেন। তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় রবীন্দ্রনাথের বিস্মিত মুখে সেদিন মৃদু কৌতুকহাস্য লক্ষ্য করেছিলুম! তাঁর আগেকার অধিকাংশ পত্রেই এই কল্পিত বৃদ্ধত্বের দাবি দেখা যায়!

প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবনের প্রথম কয় বৎসর এই সব জায়গায় গিয়ে তিনি প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেন: ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের 'যমুনা' কার্যালয়ে ও পরে 'মর্মবাণী' কার্যালয়ে; সুকিয়া ষ্ট্রীটে 'ভারতী' কার্যালয়ে; গুরুদাস এণ্ড সন্সের দোকানে; রায় এম সি সরকার এণ্ড সন্সের দোকানে; ৩৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৈঠকখানায়, এবং শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের আলয়ে। শেষ-জীবনে তাঁকে আর কোন সাহিত্য-বৈঠকে দেখা যেত না। মাঝে মাঝে তিনি একাধিক থিয়েটারি আসরে (প্রায়ই দর্শক-রূপে নয়) উপরি-উপরি হাজিরা দিতেন।

পাণিত্রাসে যে-সব সাক্ষাৎপ্রার্থী গিয়ে উপস্থিত হতেন, তাঁরা ফিরে আসতেন শরৎচন্দ্রের অতিথি-সৎকারে অভিভূত হয়ে। তিনি পরমাত্মীয়ের মত সকলকে ভালো করে না খাইয়ে-দাইয়ে ছেড়ে দিতেন না। বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক লেখক হলেও মানুষ-শরৎচন্দ্রের ভিতরে সেকেলে হিন্দু-স্বভাবটাই বেশী করে ফুটে উঠত।

আজকালকার অধিকাংশ সাহিত্যিকই নিজেদের কোন বিশেষ দলভুক্ত বলে মনে করেন এবং এটা সগর্বে প্রচারও করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বরাবরই ছিলেন দলাদলির বাইরে। প্রাচীন ও আধুনিক সব দলেই তিনি দীর্ঘকাল ধরে মিশেছেন একান্ত অন্তরঙ্গের মত, কিন্তু কোথাও গিয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলেন নি, বা কোন দলের বিশেষ

মনোভাব তাঁর মনকে চাপা দিতে পারে নি। কেবল তাই নয়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আত্মাভিমানের বশবর্তী হয়ে তিনি নিজেও কোন দলগঠন করেন নি। সাহিত্যক্ষেত্রে 'শরৎচন্দ্রের দল' বলে কোন দল নেই। অথচ এমন দলসৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে ছিল অত্যন্ত সহজ।

ভবিষ্যতের ইতিহাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন স্থাপন করবে কত উচ্চে, আজ তা কল্পনা করা কঠিন। তবে বর্তমান যুগের কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মাঝখানে যে অন্য কারুর ঠাঁই হবে না, এটা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। এবং শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার কাহিনী যে সুদূর ভবিষ্যৎ যুগকেও বিস্মিত করবে সে-বিষয়েও সন্দেহ করবার কারণ নেই।

এখন বাকী রইল শরৎচন্দ্রের শেষ রোগশয্যার কথা। সেটা নিজে না বলে এখানে 'বাতায়নে'র বিবরণী উদ্ধার করে দিলুম ঃ

'মৃত্যুর বছর তুই পূর্বে থেকে শরৎচন্দ্রের শরীরে ব্যাধি প্রকট হয়। চিরদিন তিনি বলতেন, শরীরে আমার কোন ব্যাধি নেই, শুধু অর্শটাই মাঝে মাঝে যা একটু কষ্ট দেয়। অর্শ যে আর সারবে তা আমার মনে হয় না, তা এতদিন ও আমাকে আশ্রয় করে আছে যে ওকে আশ্রয়হীন করাও কঠিন। কিন্তু কুমুদ (ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়) ওর পরম শত্রু। সে বলে, ওকে তাড়াতেই হবে। এ-কথা ওকে আর জানতে দিইনে। জানলে ভয়ে ও এমনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে যে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত করে তুলবে। একেই ত ওকে খুশী রাখতে দিনে কয়েক ঘণ্টা আমার কাটে, ওর ওপর ও যদি অভিমান করে তা'হলে বুঝতেই পারচ আমার অবস্থা কি হবে!···'অর্শর কথা উঠলে এমনি পরিহাসই তিনি করতেন।

দিন যায়—অর্শ ব্যাধিটি পুরাতন ভৃত্যের মত তাঁর সঙ্গেই থাকে। একদিন ডাঃ কুমুদশঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে তাকে তাঁর দেহ থেকে কেটে বার করে দিলেন। তিনি বললেন, বাঁচলুম! এতদিনে সত্যি ও আমায় ছেড়ে গেল। কিন্তু ভয় হয়, প্রতিশোধ নিতে ও কুমুদকে না ধরে।

হঠাৎ তাঁর শরীরে প্রতিদিন জ্বর হতে লাগল আর সঙ্গে কপাল থেকে মাথা পর্যন্ত এক রকম যন্ত্রণার সূত্রপাত হল। জ্বরও ছাড়তে চায় না—যন্ত্রণাও যেতে চায় না। একদিন জ্বর গেল, কিন্তু যন্ত্রণা রয়ে গেল। চিকিৎসকেরা বললেন, 'নিউরলজিক পেন্'।······নানা চিকিৎসা চলতে লাগল,—শেষে যন্ত্রণারও উপশম হল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে পেটে এক রকম অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। পরীক্ষায় বুঝা গেল পাকস্থলীতে 'ক্যানসার' হয়েছে। এ কথা তাঁর কাছে গোপন রাখা হল—ইতিমধ্যে রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষার সাহায্যে চিকিৎসকেরা রোগ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। এদিকে শরীর তাঁর অত্যন্ত দুর্বল—অস্ত্রোপচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। চিকিৎসকেরা বড় মুশকিলে পড়লেন। শেষে স্থির হল বাড়ি থেকে (২৪নং অশ্বিনী-কুমার দত্ত রোড) তাঁকে কোন নার্সিং হোমে রেখে শরীরে যখন কিছু শক্তি সঞ্চয় হবে তখন অস্ত্রোপচার করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরই তাঁকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ তারিখে পার্ক স্ট্রীটের একটি য়ুরোপিয়ান নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় ১লা জানুয়ারী ১৯৩৮ তারিখে তিনি চলে আসবার জন্যে এমনি জিদ ধরে বসেন যে তাঁকে অন্য নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা ব্যতীত আর উপায় রইল না। তিনি বলেছিলেন, আমাকে যদি এখান থেকে না নিয়ে যাওয়া হয় তা'হলে আমি মাথা ঠুকে মরব। এখানকার নার্সগুলো আমাকে বড় বিরক্ত করে। (মানে তাঁকে তামাক ও আফিম খেতে দেয় না!)

যেখানে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল তার নাম হচ্ছে 'পার্ক নার্সিং হোম'। কাপ্তেন সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরস্থ ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরাসের ভবনের নীচের তলায় এটি অবস্থিত। এরই ১নং ঘরে তাঁকে রাখা হল।

এখানে কিছুদিন রাখবার পর বুধবার ১২ই জানুয়ারী তারিখে বেলা ২॥০ টার সময় অত্যন্ত গোপনে তাঁর পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার

করা হয়। এটি ক্যানসারের উপর অস্ত্রোপচার নয়। মুখের মধ্যে দিয়ে কিছু খাবার শক্তি তাঁর আর ছিল না, অথচ দেহে রক্তের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করে তাঁকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়। এই অস্ত্রোপচার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বেশ বুঝা যায় মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি একটুও শঙ্কিত ছিলেন না। চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের কোন আশাই রাখেন নি, তাই তাঁরা অস্ত্রোপচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। শরৎচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা—অস্ত্রোপচার করতেই হবে। জোর করে বললেন, আমি বলচি তোমরা কর—তোমাদের কোন দায়িত্ব নেই··· ভয় কিসের !—I am not a woman.

তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হল। এর পর চার দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। ১৬ই জানুয়ারী ২রা মাঘ, রবিবার, বেলা ১০ টার সময় নার্সিং হোমেই তাঁর জীবনলীলার অবসান হয়। বেলা ১১টার সময় তাঁর নিজের মোটর-গাড়িতে তাঁকে তাঁর বাড়িতে আনা হয়। বৈকাল বেলায় ৪টের সময়, এক বিরাট শোভাযাত্রা সহ তাঁর শবদেহ কেওড়াতলার শ্মশান-তীর্থে আনীত হয়। ৫-৪৫ মিঃ সময়ে তাঁর চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়।

শরৎচন্দ্র মহাপ্রস্থান করেন রবিবার, ২রা মাঘ, ১৩৪৪ ; তাঁর বয়স হয়েছিল একষট্টি বৎসর দুই মাস মাত্র।

মৃত্যুর পূর্বে শরৎচন্দ্রের শেষ কথা হচ্ছে, আমাকে দাও—আমাকে দাও—আমাকে দাও !'···কে তাঁকে কী দিতে এসেছিল, কিসের জন্য তাঁর এই অন্তিম আগ্রহ ?···শরৎচন্দ্রের মুখ চিরমৌন, শরৎচন্দ্রের লেখনী চির-অচল। তাঁর প্রার্থিত সেই অজ্ঞাত নিধির কথা আর কেউ জানতে পারবে না।

পরিশিষ্ট

শরতের ছবি

পঁচিশ বছর আগেকার কথা। সাহিত্যের পাঠশালায় আমার হাতমক্স তখন শেষ হয়েছে বোধহয়। 'যমুনা'র সম্পাদকীয় বিভাগে অপ্রকাশ্যে সাহায্য করি এবং প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ বা কবিতা কিছু-না-কিছু লিখি। ···একদিন বৈকাল-বেলায় যমুনা অফিসে একলা বসে বসে রচনা নির্বাচন করছি। এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগা ও নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উস্কখুস্ক চুল, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, পরনে আধ-ময়লা জামা-কাপড়, পায়ে চটি জুতো। সঙ্গে একটি বাচ্চা লেড়ী কুকুর।

লেখা থেকে মুখ তুলে শুধলুম, 'কাকে দরকার?'

—'যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।'

—'ফণীবাবু এখনো আসেন নি।'

—'আচ্ছা, তা'হলে আমি একটু বস্‌ব কি?'

চেহারা দেখে মনে হল লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুককে দেখেই সসম্ভ্রমে ও সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'এই যে শরৎবাবু! কলকাতায় এলেন কবে? ঐ বেঞ্চিতে বসে আছেন কেন?'

আগন্তুক মুখ টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওঁর হুকুমেই এখানে বসে আছি।'

ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'সে কি! হেমেন্দ্রবাবু, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেন নি?'

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে স্বীকার করলুম, 'আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী!'

শরৎচন্দ্র সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

এই হল কথা-সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্য পরিচয় হয়েছিল এর আগেই। কারণ 'যমুনা'য় আমার 'কেরানী' গল্প পড়ে তিনি রেঙ্গুন থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়ে একখানি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন। তারপরেও আমাদের মধ্যে একাধিকবার পত্র-ব্যবহার হয়েছিল। তাঁর দু-একখানি পত্র এখনো সযত্নে রেখে দিয়েছি।

উপর-উক্ত ঘটনার সময়ে শরৎচন্দ্রের নাম জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত না হলেও, 'যমুনা'য় 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি গল্প লিখে তিনি প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরও বছর-ছয়েক আগে 'ভারতী'তে তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়ে সাহিত্য-সমাজে অল্পবিস্তর আগ্রহ জাগিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর যশের ভিত্তি পাকা করে তুলেছিল, ঐ তিনটি সদ্য-প্রকাশিত গল্পই—বিশেষ করে 'বিন্দুর ছেলে।' তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি তখন অশ্লীলতার অপরাধে বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত মাসিকপত্রের অফিস থেকে বাতিল হয়ে ফিরে এসে 'যমুনা'য় দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তার প্রথমাংশ পাঠ করে আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে বিপুল আগ্রহ। তাঁর 'চন্দ্রনাথ' ও 'নারীর মূল্য'ও তখন 'যমুনা'য় সবে সমাপ্ত হয়েছে। তবে তখনো শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার মত আর বেশী কিছু ছিল না। রেঙ্গুনে সরকারী অফিসে নব্বই কি একশো টাকা মাহিনায় অস্থায়ী কাজ করতেন। অ্যাকাউন্টেন্টশিপ্ একজামিনে পাস করতে পারেন নি বলে তাঁর চাকরি পাকা হয়নি। শুনেছি, বর্মায় গিয়ে তিনি উকিল হবারও চেষ্টা করেছিলেন,

কিন্তু বর্মী ভাষায় অজ্ঞতার দরুন ওকালতি পরীক্ষাতেও বিফল হয়েছিলেন। এক হিসাবে জীবিকার ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়েই দাঁড়িয়েছিল। কারণ সরকারী কাজে পাকা বা উকিল হলে তিনি হয়তো আর পুরোপুরি সাহিত্যিক-জীবন গ্রহণ করতেন না।

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ 'যমুনা'-অফিসে আসতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি তাঁর অকপট বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সে পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়নি। সে সময়ে যমুনা-অফিসে প্রতিদিন বৈকালে বেশ একটি বড় সাহিত্য-বৈঠক বসত এবং তাতে যোগ দিতেন স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় গল্পলেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কবি, গল্পলেখক ও 'সাধনা'-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি শ্রীযুক্ত মোহিত-লাল মজুমদার, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, ঔপন্যাসিক (অধুনা চলচ্চিত্র-পরিচালক) শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, 'আনন্দবাজারে'র সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রকর ও চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও 'ভারতবর্ষে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আরো অনেকে, সকলের নাম মনে পড়ছে না। 'যমুনা'র কর্ণধার ফণীবাবুর কথা বলা বাহুল্য। পরে এই আসরেরই অধিকাংশ লোককে নিয়ে সাহিত্য-সমাজে বিখ্যাত 'ভারতী'র দল গঠিত হয়। অবশ্য 'ভারতী'র দলের আভিজাত্য এ

আসরে ছিল না—এখানে ছোট-বড় সকল দলেরই সাহিত্যিক অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেতেন। অসাহিত্যিকেরও অভাব ছিল না। এখানে প্রতিদিন আসরে আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা আরম্ভ হ'ত, শরৎচন্দ্রও মহা উৎসাহে তাতে যোগ দিতেন এবং আলোচনা যখন উত্তপ্ত তর্কাতর্কিতে পরিণত হ'ত তখনো গলার জোরে তিনিও কারুর কাছে খাটো হতে রাজী ছিলেন না—যদিও যুক্তির চেয়ে কণ্ঠের শক্তিতে সেখানে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতেন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত সেখানে যেমন অসঙ্কোচে ও স্পষ্টভাষায় প্রকাশ পেত, তাঁর কোন রচনার মধ্যেও তা পাওয়া যাবে না। সময়ে সময়ে আমরা সকলে মিলে শরৎচন্দ্রকে রীতিমত কোণঠাসা করে ফেলেছি, কিন্তু তিনি চটা-মেজাজের লোক হলেও তর্কে হেরে গিয়ে কোনদিন তাঁকে মুখভার করতে দেখিনি ; পরদিন হাসিমুখে এসে আমাদেরই সমবয়সী ও সমকক্ষের মতন আবার তিনি নূতন তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদীয়মান সাহিত্যিকরূপে অক্ষয় যশের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান সেদিনকার সেই শরৎচন্দ্রকে যিনি দেখেননি, আসল শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বললেও চলে। কারণ গত বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁর প্রকৃতি অনেকটা বদলে গিয়েছিল। সাহিত্যে বা আর্টে একটি অতুলনীয় স্থান অধিকার করলে প্রত্যেক মানুষকেই হয়তো প্রাণের দায়ে না হোক, মানের দায়ে ভাব-ভঙ্গী-ভাষায় সংযত হতে হয়।

শত শত দিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গলাভ করে তাঁর প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষত্ব আমার কাছে ধরা পড়ছে। শরৎচন্দ্রের লেখায় যে-সব মতবাদ আছে, তাঁর মৌখিক মতের সঙ্গে প্রায়ই তা মিলত না। তিনি প্রায়ই আমাদের উপদেশ দিতেন, 'সাহিত্যে দুরাত্মার ছবি কখনো এঁকো না। পৃথিবীতে দুরাত্মার অভাব নেই, সাহিত্যে তাদের টেনে

না আনলেও চলবে।' আবার—'পুণ্যের জয় পাপের পরাজয় দেখবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর মৃত্যু দেখিয়েছেন, এটা বড় লেখকের কাজ হয়নি।' উত্তরে আমরা বলতুম, 'কেন, আপনিও তো দুরাত্মার ছবি আঁকতে ত্রুটি করেননি। আবার আপনিও তো কোন কোন উপন্যাসে নায়িকাকে পাপের জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বেশি শাস্তি দিয়েছেন ?' কিন্তু এ প্রতিবাদ তিনি কানে তুলতেন না। উপবীতকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন না, কৌলীন্য-গর্ব তাঁর যথেষ্ট ছিল। 'ভারতী'র আসরে একদিন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় পৈতা নেই দেখে তিনি খাপ্পা হয়ে বললেন, 'ও কি হে চারু, তোমার পৈতে নেই!' চারুবাবু হেসে বললেন, 'শরৎ পৈতের ওপরে ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না।' শরৎচন্দ্র আহত কণ্ঠে বললেন, 'না, না, বামুন হয়ে পৈতা ফেলা অন্যায়।' রবীন্দ্রনাথের উপরে শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, যখন-তখন বলতেন, 'ওঁর লেখা দেখে কত শিখেছি!' কিন্তু আত্মশক্তির উপরেও ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। 'যমুনা'র পরে ঐ বাড়িতেই নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় 'মর্মবাণী'র কার্যালয় স্থাপন করেন এবং আমি ছিলুম তখন 'মর্মবাণী'র সহকারী সম্পাদক। 'যমুনা'র আসরে আমার যে-সব সাহিত্যিক বন্ধু আসতেন, এই নূতন আসরেও তাঁদের কারুরই অভাব হল না, উপরন্তু নূতন গুণীর সংখ্যা বাড়ল। যেমন স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ। তিনি মাঝে মাঝে নিজের নূতন রচনা শোনাতে আসতেন। এবং 'মানসী'রও দলের একাধিক সাহিত্যিক এখানে এসে দেখা দিতেন। এই 'মর্মবাণী'র আসরে বসে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, 'সবুজপত্রে রবিবাবু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস লিখছেন, তোমরা দেখে নিয়ো, আমি এইবার যে উপন্যাস লিখব, 'ঘরে-বাইরে'র চেয়েও ওজনে তা একতিলও কম হবে না।' প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রবল প্রতিবাদ করে বললেন, 'যে উপন্যাস এখনও লেখেননি, তার সঙ্গে 'ঘরে-বাইরে'র তুলনা আপনি কি করে

করছেন !' কিন্তু শরৎচন্দ্র আবার দৃঢ়স্বরে বললেন, 'তোমরা দেখে নিয়ো !' এই উক্তিতে কেবল শরৎচন্দ্রের আত্মশক্তিনির্ভরতাই প্রকাশ পাচ্ছে না, তাঁর সরলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, খুব সম্ভব শরৎচন্দ্রের পরের উপন্যাসের নাম ছিল 'গৃহদাহ'— যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কোন একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট ছায়া আছে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির নকলে চরিত্র অঙ্কন করেছেন, একখানি পত্রে সরল ভাষায় সে-কথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হননি। এই সরলতা ও অকপটতার জন্যে শরৎচন্দ্রের অনেক দুর্বলতাও মধুর হয়ে উঠত।

হয়তো এই সরলতার জন্যেই শরৎচন্দ্র যে-কোন লোকের যে-কোন কথায় বিশ্বাস করতেন। কারুর উপরে তাঁকে চটিয়ে দেওয়া ছিল খুবই সহজ। যদি তাঁকে বলা হ'ত, 'শরৎদা, অমুক লোক আপনার নিন্দা করেছে,' তা'হলে এ-কথার সত্যাসত্য বিচার না করেই তিনি হয়তো কোন বন্ধুর উপরেও কিছুকালের জন্যে চটে থাকতেন এবং নিজেও কষ্ট পেতেন। তারপর হয়তো নিজের ভুল বুঝে ভ্রম সংশোধন করতেন। মাঝে মাঝে কোন কোন দুষ্টু লোক এইভাবেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধী করে তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনবারেই এই সব অসৎ চক্রান্ত সফল হয়নি।

আমি এখানে খালি ব্যক্তিগতভাবেই শরৎচন্দ্রকে দেখতে ও দেখাতে চাইছি, কারণ এই সদ্যগত বৃহৎ বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে এখন ব্যক্তিগত কথা ছাড়া অন্য কথা মনে আসছে না, আসা স্বাভাবিকই নয়। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি বা সাহিত্য-প্রতিভা বিশ্লেষণ করবার কোন ইচ্ছাই এখন হচ্ছে না। তবে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করলে মন্দ হবে না। আজকাল অনেক তথাকথিত সাহিত্যিক নিজেদের অভিজাত বলে প্রচার করে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার জন্যে হাস্যকর চেষ্টা

করেন। তাঁরা লেখেন ও বলেন বড় বড় কথা। কিন্তু সাহিত্যের এক বিভাগে অসাধারণ হয়েও শরৎচন্দ্র কোনদিন এই সব ময়ূর-পুচ্ছধারীর ছায়া পর্যন্ত মাড়াননি। নিজেকে অতুলনীয় ভেবে গর্ব করবার অধিকার তাঁর যথেষ্টই ছিল, কিন্তু মুখের কথায় ও অসংখ্য পত্রে তিনি বারবার এই ভাবটাই প্রকাশ করে গেছেন যে—আমি লেখাপড়াও বেশি করিনি, আমার জ্ঞানও বেশি নয়, তবে আমার লেখা লোকের ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে, আমি স্বচক্ষে যা দেখি, নিজের প্রাণে যা অনুভব করি, লেখায় সেইটেই প্রকাশ করতে চাই। ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল গল্প-টল্প কাকে বলে আমি তা জানি না!··· এখনকার অভিজাত সাহিত্যিকরা লোককে ধাক্কা মেরে ধাপ্পা দিয়ে চমকে দিয়ে বড় হবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা করেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত যাঁরা যথার্থই শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী, তাঁরা বড় হন বিনা চেষ্টায় হাওয়ার মত অগোচরে বিশ্বমানুষের প্রাণবস্তুতে পরিণত হয়ে। জোর করে প্রেমিক বা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। পরের প্রাণে আশ্রয় খুঁজলে নিজের প্রাণকে আগে নিবেদন করা চাই। তুমি অভিজাত সাহিত্যিক, তুমি হচ্ছ সোনার পাথর-বাটির রূপান্তর! যশের কাঙাল হয়ে সাগ্রহে লেখা ছাপাবে, অথচ জনতাকে ঘৃণা করবে! অসম্ভব।

যমুনা-অফিসে শরৎ ও তাঁর ভেলু কুকুরকে নিয়ে আমাদের বহু সুখের দিন কেটে গিয়েছিল। ঐ ভেলু কুকুরকে অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেত না—কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল না, বরং অনেক মানুষের চেয়ে ভেলুকে তিনি বড় বলেই মনে করতেন। আর ভেলুও বোধ হয় সেটা জানত। সে কতবার যে আমাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে আদর জানিয়েছে, তার আর সংখ্যা হয় না। এবং তার এই সাংঘাতিক আদর থেকে শরৎচন্দ্রও নিস্তার পেতেন না। আমাদের সুধীরচন্দ্র সরকারের ছিল ভীষণ কুকুরাতঙ্ক, ভেলু যদি ঘরে ঢুকল সুধীর অমনি

এক লাফে উঠে বসল টেবিলের উপরে! ভেলুকে না বাঁধলে কারুর সাধ্য ছিল না সুধীরকে টেবিলের উপর থেকে নামায় এবং শরৎ-চন্দ্রেরও বিশেষ আপত্তি ছিল ভেলুকে বাঁধতে—আহা, অবোলা জীব, ওর যে তুঃখ হবে! হোটেল থেকে ভেলুর জন্যে আসত বড় বড় ঘৃতপক্ক চপ, ফাউল কাটলেট! ভেলুর অকালমৃত্যুর কারণ বোধ হয় কুকুরের পক্ষে এই অসহনীয় আহার! এবং ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের যে শোকাকুল অশ্রুস্নাত দৃষ্টি দেখেছিলুম, এ-জীবনে তা আর ভুলব বলে মনে হয় না।

যমুনা-অফিসে শরৎচন্দ্র অনেকদিন বেলা তুটো-তিনটের সময়ে এসে হাজিরা দিতেন, তারপর বাসায় ফিরতেন সান্ধ্য-আসর ভেঙে যাবারও অনেক পরে। কোন কোনদিন রাত্রি তুটো-তিনটেও বেজে যেত। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা তিন-চারজন মাত্র লোক থাকতুম। বাইরের লোক চলে গেলে শরৎচন্দ্র শুরু করতেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা কাহিনী। বেশী লোকের সভায় আলোচনা (conversazione) ও তর্ক-বিতর্কের সময়ে শরৎচন্দ্র বেশ গুছিয়ে নিজের মতামত বলতে পারতেন না বটে, কিন্তু গল্পগুজব করবার শক্তি ছিল তাঁর অদ্ভুত ও বিচিত্র—শ্রোতাদের তাঁর সুমুখে বসে থাকতে হ'ত মন্ত্রমুগ্ধের মত। একদিন এমন কৌশলে একটি ভূতের গল্প বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রে একলা বাড়ি ফিরতে ভয় পেয়েছিলেন। সেই গল্পটি পরে আমি আমার 'যকের ধন' উপন্যাসে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছিলুম বটে, কিন্তু তাঁর মুখের ভাষার অভাবে তার অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি রাত্রেই আসর ভাঙবার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাড়ি ফিরতুম আমি, কারণ তিনি তখন বাসা নিয়েছিলেন আমার বাড়ির অনতিদূরেই। সেই সময়ে পথ চলতে চলতে শরৎচন্দ্র নিজের হৃদয় একেবারে উন্মুক্ত করে দিতেন এবং তাঁর জীবনের কোন গুপ্তকথাই বলতে বোধ হয় বাকি রাখেননি। এই-

ভাবে খাঁটি শরৎচন্দ্রকে চেনবার সুযোগ খুব কম সাহিত্যিকই পেয়েছেন এবং আরো বছর-কয়েক পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে আমার ভাগ্যেও হয়তো এ সুযোগলাভ ঘটত না। এও বলে রাখি, শরৎ-চন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে উঠেছিল—Too much familiarity brings contempt, এ প্রবাদ সব সময়ে সত্য হয় না।

একদিন সকালবেলায় মা এসে বললেন, 'ওরে, তোর পড়বার ঘরে কে এক ভদ্রলোক এসে গান গাইছেন—কী মিষ্টি গলা!' কৌতূহলী হয়ে নিচে নেমে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখি, শরৎচন্দ্র কখন এসে আমার পড়বার ঘরে ঢুকে গালিচার উপরে ঠেলান দিয়ে শুয়ে নিজের মনে গান ধরেছেন এবং সে গান শুনতে সত্যই চমৎকার! আমাকে দেখেই তিনি মৌন হলেন, কিছুতেই আর গাইতে চাইলেন না! তারপর আরো কয়েকবার আমার নিচের ঘরে তাঁর গানের সাড়া পেয়ে তাড়া-তাড়ি নেমে গিয়েছি, আড়ালে থেকেও শুনেছি, কিন্তু যেই আমাকে দেখা অমনি তাঁর ভীরু কণ্ঠ হয়েছে বোবা! অথচ তাঁর সঙ্কোচের কোনই কারণ ছিল না, তাঁর গানে ওস্তাদি না থাকলেও মাধুর্য ছিল যথেষ্ট এবং সঙ্গীত-সাধনা করলে তিনি নাম করতেও পারতেন রীতিমত।

শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে বাস করতেন, তখন প্রতিদিন আর তাঁর দেখা পেতুম না বটে, কিন্তু আমাদের অন্যান্য আসরে তাঁর আবির্ভাব হ'ত প্রায়ই। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত গল্প বলতে গেলে এখানে কিছুতেই ধরবে না, অতএব সে চেষ্টা আর করলুম না। তিনি পানিত্রাসে যাবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'ত ন-মাসে ছ-মাসে, কিন্তু যখনই দেখা হ'ত বুঝতে পারতুম যে, আমার কাছে তিনি সেই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়সের যুবক ও পুরাতন শরৎচন্দ্রই

আছেন। অতঃপর তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে গল্প বলে এবারের কথা শেষ করব।

একদিন আমাদের এক আসরে বসে শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক টানছেন, এমন সময়ে অধুনালুপ্ত 'বিদূষক' পত্রিকার সম্পাদক হাস্য-রসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের আবির্ভাব। 'বিদূষক'-সম্পাদক এই শরৎচন্দ্রকে কথায় হারাতে কারুকে দেখিনি এবং খোঁচা খেলে তিনি নিরুত্তর থাকবার ছেলেও ছিলেন না। 'বিদূষক'-সম্পাদককে অপ্রস্তুত করবার কৌতুকের লোভে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এস বিদূষক শরৎচন্দ্র!' শরৎ পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'কি বলছ ভাই 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র?' এই কৌতুকময় ঘাত-প্রতিঘাতে নিরুত্তর হতে হল 'চরিত্রহীন' প্রণেতাকেই।

একদিন বিডন স্ট্রীটের মোড়ে এক মণিহারির দোকানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কি কিনতে গিয়েছি। হঠাৎ তিনি বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি কিছু খাও!' আমি বললুম, 'এই মণিহারির দোকানে আপনি আবার আমার জন্যে কি খাবার আবিষ্কার করলেন?'—'কেন, অনেক ভালো ভালো লজঞ্জুস রয়েছে তো!'—'বলেন কি দাদা, আপনার চেয়ে বয়সে আমি অনেক ছোট বটে, কিন্তু আমাকে লজঞ্জুস-লোভী শিশু বলে ভ্রম করছেন কেন?' শরৎচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, 'না হে না, তুমি বড় বেশি সিগারেট খাও। ও বদ-অভ্যাস ছাড়ো। হয় তামাক ধর, নয় লজঞ্জুস খাও!' দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি শরৎচন্দ্রের এ আদেশ পালন করতে ইচ্ছা হয়নি।

শরৎচন্দ্র ভেলুকে কি রকম ভালোবাসতেন তারও একটা গল্প বলি। একদিন কোন এক ভক্ত এক চাঙারি প্রথম শ্রেণীর সন্দেশ নিয়ে গিয়ে তাঁকে উপহার দিলেন। ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সামনে সন্দেশগুলি

রাখলেন, ভেলু ছিল তখন তাঁর পাশে বসে। সন্দেশ দেখে ভেলু রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠল। এবং শরৎচন্দ্রও ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভেলুর উৎসাহিত মুখে এক-একটি সন্দেশ তুলে দিতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, চাঙারি একেবারে খালি! যে ভদ্রলোক এত সাধে ভেট নিয়ে গিয়েছিলেন, সন্দেশের এই অপূর্ব পরিণাম দেখে তাঁর মনের অবস্থা কি রকম হল, সে-কথা আমরা শুনিনি।

একদিন শরৎচন্দ্র এসে বিরক্তমুখে বললেন, 'নাঃ, শিবপুরের বাস ওঠাতে হল দেখচি!'—'কেন শরৎদা, কি হল?'—'আর ভাই, বল কেন, ভেলুর জন্যে আমার নামে আদালতে নালিশ হয়েচে, পাড়ার লোকগুলো পাজীর পা-ঝাড়া!'—'সেকি, ভেলু কি করেছে?'—'কিছুই করেনি ভাই, কিছুই করেনি! একটা গয়লা যাচ্ছিল পাড়া দিয়ে, তাকে দেখে ভেলুর পছন্দ হয়নি। তাই সে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ডিম থেকে শুধু ইঞ্চি-চারেক মাংস খুব্‌লে তুলে নিয়েছে!'—'অ্যাঃ, বলেন কি, ইঞ্চি-চারেক মাংস?'—'হ্যাঁ, মোটে এক খাবল মাংস আর কি! এই সামান্য অপরাধেই আমার ওপরে হুকুম হয়েচে, ভেলুর মুখে 'মাজল্' পরিয়ে রাখতে হবে! ভেলুর কি যে কষ্ট হবে, ভেবে দেখ দেখি!'

সারমেয়-অবতার ভেলুর এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছি। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরের বাড়িতে, সেই সময়ে এক সকালে টেক্সো-বাবু এলেন টেক্সোর টাকা আদায় করতে। বাইরের ঘরে টেক্সো-বাবু তাঁর তল্পিতল্পা নিয়ে বসলেন। ভেলু এক কোণে আরাম করে শুয়ে আছে,—যদিও তার অসন্তুষ্ট দৃষ্টি রয়েছে টেক্সো-বাবুর দিকেই। শরৎচন্দ্র টেক্সোর টাকা দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। টেক্সো-বাবুর কাজ শেষ হল—তিনিও নিজের টাকার তল্পির দিকে

হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেলু ভীষণ গর্জন করে তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কারণ ভেলুর একটা স্বভাব ছিল এই, তার মনিবের বাড়িতে বাহির থেকে কেউ কোন জিনিস এনে রাখলে সে কোন আপত্তি করত না, কিন্তু বাড়ির জিনিসে হাত দিলেই তার 'কুকুরত্ব' জেগে উঠত বিষম বিক্রমে ! সুতরাং টেক্সো-বাবুর অবস্থা যা হল তা আর বলবার নয় ! তিনি মহা-আতঙ্কে পিছিয়ে পড়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। একেবারে চিত্রার্পিতের মত,—কারণ একটু নড়লেই ভেলু করে গোঁ-গোঁ ! দুই-তিন ঘণ্টা পরে স্নান-আহারাদি সেরে শরৎচন্দ্র আবার যখন সেখানে এলেন, টেক্সো-বাবু তখনো দেওয়ালের ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন ! বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের পুনরাবির্ভাবে টেক্সো-বাবুর মুক্তিলাভের সৌভাগ্য হল !

মনোমোহন থিয়েটারে চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'আঁধারে আলো' দেখানো হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমিও গিয়েছি। একখানা ঢালা বিছানা পাতা 'বক্সে' শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আমিও আশ্রয় পেলুম। ছবি দেখানো শেষ হলে দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের এক পাটি তালতলার চটি অদৃশ্য হয়েছে ! অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও পাটি পাওয়া গেল না। তখন শরৎচন্দ্র হতাশ হয়ে অন্য পাটি বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললুম, 'এক পাটি চটি নিয়ে আর কি করবেন, ওটাও এখানে রেখে যান।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'ক্ষেপেচ ? চোর বেটা এইখানেই কোথায় লুকিয়ে বসে সব দেখচে ! আমি এ-পাটি রেখে গেলেই সে এসে তুলে নেবে। তার সে সাধে আমি বাদ সাধব,—শিবপুরে যাবার পথে হাওড়ার পুল থেকে চটির এই পাটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেব !' তিনি খালি পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

পরদিনই 'বক্সে'র তলা থেকে তালতলার হারানো চটির পাটি আবিষ্কৃত হল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হস্তগত অন্য পাটি তখন গঙ্গালাভ

করেছে এবং সম্ভবত এখনো সলিল-সমাধির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন আর্ট ও সাহিত্যের আসর 'বিচিত্রা'র অধিবেশন হচ্ছে প্রতি সপ্তাহেই এবং প্রতি অধিবেশনের পরেই খবর পাওয়া যাচ্ছে, অমুক অমুক লোকের জুতা চুরি গিয়েছে! আমরা সকলেই চিন্তিত, কারণ 'বিচিত্রা'র ঢালা আসরে জুতা খুলে বসতে হ'ত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছেঁড়া, পুরানো জুতার আশ্রয় নিলেন, কেউ কেউ জুতা না খুলে ও হলে না ঢুকে পাশের বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করলেন এবং আমরা অনেকেই জুতার দিকেই মন রেখে গান-বাজনা ও আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলুম। শরৎচন্দ্র এই দুঃসংবাদ শুনেই খবরের কাগজে নিজের জুতোজোড়া মুড়ে বগলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে বসলেন—সেদিন আসরে লোক আর ধরে না! ইতিমধ্যে কে গিয়ে চুপি চুপি বিশ্বকবির কাছে শরৎচন্দ্রের গুপ্তকথা ফাঁস করে দিয়েছে! রবীন্দ্রনাথ মুখ টিপে হেসে শুধোলেন, 'শরৎ, তোমার কোলে ওটা কী?' শরৎচন্দ্র মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'আজ্ঞে, বই।' রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ?' শরৎচন্দ্র লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারেন না!

বছর-আড়াই আগেকার কথা। প্রায় বৎসরাবধি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তখন আমি আমার নতুন বাড়িতে এসেছি, শরৎচন্দ্র এ-বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত জানেন না। একদিন দুপুরে তিন-তলার বারান্দার কোণে বসে রচনাকার্যে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে একতলায় পরিচিত কণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাক শুনলুম। আমার দুই মেয়ে গিয়ে আগন্তুকের নাম জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর এল, 'ওগো বাছারা, তোমরা আমাকে চেন না, তোমরা যখন জন্মাওনি তখন আমি তোমাদের পুরানো বাড়িতে আসতুম, তোমাদের বাবা আমাকে

দেখলে হয়তো চিনতে পারবেন!' এ যে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর—আজ কুড়ি-বাইশ বছর পরে শরৎচন্দ্র অযাচিতভাবে আবার আমার বাড়িতে! বিশ্বাস হল না—তিনি আমার এ-বাড়ি চিনবেন কেমন করে? কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়েই দেখলুম, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন সত্য-সত্যই শরৎচন্দ্র—তাঁর পিছনে কবি-বন্ধু গিরিজাকুমার বসু! সবিস্ময়ে বললুম, 'শরৎদা, এতকাল পরে আমার বাড়িতে আবার আপনি!' শরৎচন্দ্র সহাস্যে বললেন, 'হ্যাঁ হেমেন্দ্র! গিরিজার সঙ্গে যাচ্ছিলুম বরানগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, তাই তোমার কাছেই এসে হাজির হয়েছি!' আমি সানন্দে তাঁকে তিনতলার ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললুম, 'এ যে আমার পরম সৌভাগ্য দাদা, এ যে বিনা মেঘে জল! কোথায় রবীন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমি! এ যে হাসির কথা!' তারপর অবিকল সেই পুরাতন কালের অবিখ্যাত শরৎচন্দ্রের মতই নানা আলাপ-আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তিনি আবার বিদায় গ্রহণ করলেন।

শরৎচন্দ্র শেষ যেদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, আমার দুই মেয়ে শেফালিকা ও মুকুলিকার কাছে বলে গিয়েছিলেন, 'শোনো বাছা, এ-সব সিগারেট ফিগারেট আমার সহ্য হয় না। আমার জন্যে যদি গড়গড়া আনিয়ে রাখতে পারো, তা'হলে আবার তোমাদের বাড়িতে আমি আসব!' তার কিছুদিন পরে রঙ্গালয়ে 'চরিত্রহীনে'র প্রথম অভিনয় রাত্রে আমার মেয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল, 'কই, আপনি তো আর এলেন না?' শরৎচন্দ্র বললেন, 'আমার জন্যে গড়গড়া আছে?'—'হ্যাঁ!' শুনে তিনি সহাস্যে অঙ্গীকার করলেন, 'আচ্ছা, এই-বারে তবে যাব!' কিন্তু এখন আর তাঁর সে-অঙ্গীকারের মূল্য নেই। তবু শোকাতুর মনে ভাবছি, তাঁর গড়গড়া তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র তো আর এলেন না? হায়, স্বর্গ থেকে মর্ত্য কতদূর?

সোনার
আনারস

কুমারী মধুমতী সেন

করকমলেষু

দাদু
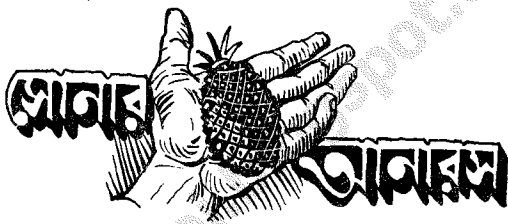
প্রথম

নূতন অভিযান

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'আর পড়তে হবে না মানিক, ফেলে দাও তোমার ঐ খবরের কাগজখানা! আমি রাজনীতির কচকচি শুনতে চাই না, আমি জানতে চাই নূতন নূতন অপরাধের খবর! কিন্তু আমি যা চাই, তোমার ঐ খবরের কাগজে তা নেই। অপরাধীরা কি আজ-কাল ধর্মঘট করেছে? এ হল কি? এত বড় কলকাতা শহর, কিন্তু কেউই অপরাধের মতন অপরাধ করতে পারছে না!'

মানিক কাগজখানা মেঝের উপরে নিক্ষেপ করে হাসতে হাসতে বললে, 'কারুর পোষ মাস, কারুর সর্বনাশ! তুমি চাও অপরাধীদের, কিন্তু সাধু নাগরিকদের পক্ষে তারা কি দুঃস্বপ্ন-লোকের জীব নয়?'

জয়ন্ত বললে, 'অপরাধ হচ্ছে বিচিত্র! সাধু মানুষদের চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে অপরাধীরাই। মহাভারত পড়বার সময় তুমি কি অনুভব করনি মানিক, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুর্যোধন আর দুঃশাসনের কথা জানবার জন্যেই আমাদের বেশী আগ্রহ হয়? মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্য পড়ে দেখো। তার মধ্যে রামের চেয়ে বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছে রাবণের চরিত্রই! আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন হচ্ছে একেবারেই

বেরঙা, কিন্তু রঙের পর রঙের খেলা দেখা যায় অপরাধীদের জীবনেই।'

মানিক সায় দিয়ে বললে, 'তা যা বলেছ ভাই, এ-কথা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু কি আর করবে বল, কলকাতা পুলিসের সুন্দরবাবুও তিন মাসের ছুটি নিয়ে বসে আছেন, তিনিও যে 'হুম্' বলে কোন নূতন মামলা নিয়ে আমাদের এখানে ছুটে আসবেন, তারও আশা নেই। অগত্যা আমাদের বাধ্য হয়েই বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে।'

ঠিক এমনি সময়ে মধু চাকর এসে খবর দিলে, একজন লোক নাকি জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'কি রকম লোক মধু?'

—'একটি ছোকরা বাবু। বয়স বোধ হয় বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় তিনি যেন ভারি ভয় পেয়েছেন।'

—'আচ্ছা মধু, বাবুটিকে এখানেই নিয়ে এস।'

তার একটু পরেই সিঁড়ির উপরে দ্রুত পদশব্দ জাগিয়ে একটি লোক ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'জয়ন্তবাবু কোথায়? আমি এখনি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

—'আমারই নাম জয়ন্ত। আপনি বড়ই উত্তেজিত হয়েছেন দেখছি, ঐ চেয়ারখানার উপরে গিয়ে একটু স্থির হয়ে বসুন।'

আগন্তুক সামনের চেয়ারখানা টেনে ধপাস করে তার উপরে বসে পড়ে বললে, 'উত্তেজিত না হয়ে কি করি বলুন দেখি! কাল রাত্রে আর একটু হলেই আমার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হয়ে যাচ্ছিল যে!'

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, 'তাহলে ঘটনাটা নিশ্চয়ই গুরুতর বটে! কিন্তু কি জানেন, শান্তভাবে না বললে কোন ঘটনার ভিতর থেকেই আমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে পারি না।'

আগন্তুক অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, এইবার আমার কথা বলতে পারি কি?'

—'বলুন। আপনার কথা শোনবার জন্যে আমাদেরও আগ্রহের অভাব নেই।'

—'আপনাদের তো আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু কাল আমার ঘাড়ে চেপেছিল মস্ত বড় এক কুগ্রহ! আজ যে বেঁচে আছি, সে হচ্ছে ভগবানের দয়া।'

—'বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। অতএব বেঁচে যখন আছেন, তখন নির্ভয়ে আপনার সমস্ত ইতিহাস আমাদের কাছে বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নামটি কি?'

—'সুব্রত সরকার।'

—'বেশ, এইবার আপনার কি বলবার আছে বলুন।'

সুব্রত বললে, 'কাল রাত্রে মশাই, আমার বাড়িতে ভয়ঙ্কর এক কাণ্ড হয়ে গেছে! আমি এখনও বিবাহ করিনি, নিজের বাড়িতে একলাই থাকি। কাল রাত্রে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হল অনেকগুলো হাত দিয়ে অন্ধকারে কারা যেন আমাকে চেপে ধরেছে! আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারলুম না; কারণ চার-পাঁচখানা হাত দড়ি দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে, আমার মুখেও গুঁজে দিলে বিছানার চাদরের খানিকটা, আর চোখের উপরেও বাঁধলে একখানা কাপড়! সেই অবস্থাতেই অনুভব করলুম, 'সুইচ্' টিপে কারা আলো জ্বাললে। তারপর শুনলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলার শব্দ! তার খানিক পরেই ঘরের আলো গেল আবার নিবে। কয়েক জনের পায়ের শব্দ বাইরে চলে গেল, তারপর আস্তে আস্তে আমার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল, তারপর আর কারুর কোন সাড়া-শব্দ পেলুম না বটে, কিন্তু আমাকে সেই অবস্থাতেই কানা আর বোবার মতন চুপ করে থাকতে হল। সকালবেলায় চাকর এসে আমাকে মুক্তিদান করলে।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার ঘরের ভিতরে বাইরের লোক এল কেমন করে?'

—'দরজা দিয়ে মশাই, দরজা দিয়ে! আমার একটি বদ-অভ্যাস

আছে, গ্রীষ্মকালে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে পারি না।'

—'তারপর? বিছানা থেকে নেমে আপনি কি দেখলেন?'

—'দেখলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলা পড়ে রয়েছে। তার ভিতরে শ-পাঁচেক টাকার নোট আর কিছু গয়নাও ছিল, কিন্তু

সে-সব কিছুই চুরি যায়নি। চোরেরা নিয়ে গেছে কেবল একটি জিনিস, যা ছিল সোনার আনারসের মধ্যে।'

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'সোনার আনারস? সে আবার কি?'

মানিক বললে, 'সোনার পাথরবাটির কথা শুনেছি, কিন্তু সোনার আনারসের কথা শুনলুম এই প্রথম!'

সুব্রত বললে, 'তাহলে একটু গোড়ার কথা বলতে হয়। কোন্ খেয়ালে জানি না, আমার প্রপিতামহ পিতল দিয়ে গড়িয়েছিলেন এই আনারসটি। এই আনারসের উপরে সোনার কলাই করা ছিল বলে আমরা একে সোনার আনারস বলেই ডাকি। আমার প্রপিতামহ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এই সোনার আনারসটি পিতামহের হাতে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, 'যদি কোনদিন তোমার বিশেষ অর্থাভাব হয়, তাহলে এই আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান!' আমার পিতামহও মৃত্যুকালে আমার বাবাকে ঠিক এই কথাই বলে গিয়েছিলেন। বাবাও যখন মৃত্যুন্মুখ, তখন তাঁর মুখেও শুনেছিলুম এই কথাই। এই সোনার আনারসটি টানলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমার পূর্বপুরুষরা ধনী ছিলেন বটে, কিন্তু আমি ধনী নই, তাই সোনার আনারসের ভিতর থেকে অর্থের সন্ধান করতে গিয়ে পেয়েছিলুম খালি এক টুকরো কাগজ, আর সেই কাগজের উপর লেখা ছিল যে কথাগুলো, তা প্রলাপের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'কথাগুলো কি?'

সুব্রত একটু ভেবে বললে, 'কাগজে লেখা ছিল একটি ছড়া, কিন্তু তার প্রথম আর শেষ দিকটার কথা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে পড়ছে না।'

—'যেটুকু মনে পড়ছে, বলুন দেখি।'

সুব্রত বললে, 'ছড়ার প্রথম দিকটায় আছে এই কথাগুলি—

'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোট্‌কা জট।'

বলতে পারেন জয়ন্তবাবু, এর মধ্যে কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি? বৃদ্ধ বট নাকি আয়নাতে তার মুখ দেখে গান ধরেছে! এমন কথা শুনলে কি হাসি পায় না?'

জয়ন্ত মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে বললে, 'আমার একটুও হাসি পাচ্ছে না সুব্রতবাবু! ছড়ার শেষ-দিকটায় কি আছে?'

সুব্রত বললে, 'শেষ-দিকটায় আছে—

'সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা!'

হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, এগুলো কি পাগলের প্রলাপ নয়?'

জয়ন্ত প্রায় পাঁচ মিনিটকাল স্তব্ধ ও স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, 'ছড়ার মাঝখানকার কোন কথাই আপনার মনে নেই?'

—'এ-রকম একটা বাজে ছড়ার কথা মনে রাখবার কেউ কি চেষ্টা করে জয়ন্তবাবু? চোর ব্যাটারা কি নির্বোধ! তারা কিনা লোহার সিন্দুক খুলে কেবল এই ছড়ার কাগজখানা নিয়েই সরে পড়েছে!'

জয়ন্ত বললে, 'চোরেরা বেশী নির্বোধ কি আপনি বেশী নির্বোধ, সেটা আমি এখনি বুঝতে পারছি না। কিন্তু ছড়ার কিছু কিছু অর্থ আমি যেন আন্দাজ করতে পারছি।'

—'পারছেন না কি? আমি তো কতবার ঐ কাগজখানা পড়ে দেখেছি, কিন্তু অর্থ বা অনর্থ কিছুই আন্দাজ করতে পারিনি।'

জয়ন্ত বললে, 'এখনও আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারেননি, এটা হচ্ছে আশ্চর্য কথা! আপনার বাড়িতে একদল চোর এল, তারা আপনার লোহার সিন্দুক খুলে মূল্যবান কিছুই নিয়ে গেল না, নিয়ে গেল কেবল এক টুকরো কাগজ, যার উপরে লেখা ছিল এই ছড়াটি, আর আপনার পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন যার মধ্যে পাবেন আপনি দুঃসময়ে অর্থের সন্ধান। 'সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।' এটুকু পড়েও আপনার মনে কোন সন্দেহের ইঙ্গিত জাগেনি?'

সুব্রত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'কিছু না, কিছু না। সর্প নৃপই বা কি, আর তার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্কই বা কি ?'

জয়ন্ত গম্ভীরকণ্ঠে বললে, 'একটি সম্পর্ক থাকতে পারে বৈকি! মানিক, তুমি কিছু বুঝতে পারছ কি ?'

মানিক বললে, 'পাগল, ধাঁধা নিয়ে আমি কোন কালেই মাথা ঘামাবার চেষ্টা করি না!'

জয়ন্ত মৃদু হাস্য করে বললে, 'কিন্তু ঐ চেষ্টাই হচ্ছে আমার জীবনের তপস্যা! চিরদিনই আমি ধাঁধার জবাব খুঁজতে চাই। যাকগে সে-কথা। সুব্রতবাবু, আপনাকে আমি দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।'

—'করুন।'

—'এই ছড়ার কথা আপনি আগে আর কারুর কাছে বলেছিলেন কি ?'

—'তা বলেছিলুম বৈ কি! অনেক লোকের কাছেই ঐ ছড়াটা দেখিয়েছিলুম। যে দেখেছে সেই-ই অবাক হয়ে গেছে, ওর মধ্যে কোন মানে খুঁজে পায়নি। যার মানে নেই, তার মধ্যে আবার মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি জয়ন্তবাবু ?'

জয়ন্ত সেই জিজ্ঞাসার কোনই জবাব না দিয়ে বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনি বললেন যে, আপনার পূর্বপুরুষরা নাকি ধনী ছিলেন। তাঁরাও কি কলকাতাতেই বাস করতেন ?'

—'না। আমাদের আদি বাস হচ্ছে দক্ষিণ বাংলার কোদালপুর গ্রামে। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন জমিদার। দেশে আজও আমার কিছু জমি-জমা আছে, আর তার ব্যবস্থা করতে এখনো আমি মাঝে মাঝে দেশে যাই বটে; কিন্তু নিজেকে আর জমিদার ভেবে আত্মগৌরব লাভ করতে পারি না।'

—'দেশে আপনাদের বসতবাড়ি আছে তো ?'

—'আছে, এইমাত্র। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, চার-চারটে মহল, তার

চারিধার ঘিরে মস্ত বড় বাগান, কিন্তু সে-সমস্তই আজ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে আর বন-জঙ্গলে, বসতবাড়ির একটা মহলের কিছু কিছু সংস্কার করে খান-ছয়েক ঘর কোনরকমে মানুষের উপযোগী করে নিয়েছি, যখন দেশে যাই, সেই ঘরগুলো ব্যবহার করি।'

—'আপনাদের দেশের বাগানে পুকুর আছে?'

—'নিশ্চয়ই আছে, প্রকাণ্ড পুকুর—কলকাতার গোলদীঘির চেয়ে প্রায় চার-গুণ বড়—'

—'আর সেই পুকুরের ধারে কোন পুরানো বটগাছ আছে কি?'

—'ভারী আশ্চর্য তো, আপনি এমন প্রশ্ন করছেন কেন? হ্যাঁ মশাই, পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে একটা মস্ত বটগাছ, তার বয়স কত কেউ তা জানে না।'

—'আর সেই বটগাছের উপরে বাস করে বকের দল?'

সুব্রত বিপুল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'এ-কথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

—'পরে বলব। আপাতত আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিন।'

—'সেই বটগাছের উপরে চিরদিন ধরেই বাস করে আসছে বকের দল, ও-গাছটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন তাদের নিজস্ব সম্পত্তি!'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ বসে রইল নীরবে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রুপোর শামুকের ভিতর থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'মানিক, জাগ্রত হও।'

—'ব্যাপার কি বন্ধু? খুব খুশী না হলে তুমি নস্য নাও না কিন্তু খুশীর কারণটি কি?'

—'আর আমরা অলস হয়ে বসে থাকব না। ওঠ, মধুকে পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধতে বল। আজ থেকেই শুরু হবে আমাদের নতুন অভিযান!'

—'কিন্তু যাবে কোন্ দিকে?'

—'সুব্রতবাবুর দেশে, কোদালপুর গ্রামে।'

সুব্রত খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইল। তারপর বিস্মিত স্বরে বললে, 'ও জয়ন্তবাবু, ঐ ছড়ার প্রলাপের ভিতর থেকে আপনি কোন অর্থ খুঁজে পেয়েছেন নাকি?'

—'আপনার পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন, ছড়ার মধ্যে অর্থের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাঁদের কথা মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই এই ছড়াটির ভিতরে আছে গভীর অর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনি সমস্ত ছড়াটার কথা আমাকে বলতে পারলেন না ; তাহলে হয়তো এখনি সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত।'

—'এমন জানলে আমি যে ছড়াটা একেবারে মুখস্থ করে রাখতাম।'

—'যাক্ গে, যেটুকু সূত্র পেয়েছি, তাই নিয়েই এখন কাজ আরম্ভ করে দি। মানিক, সুন্দরবাবুকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করে এস—তিনি এখন ছুটিতে আছেন। সুন্দরবাবু সঙ্গে না থাকলে আমাদের কোন অভিযানই ভালো করে জমে না!'

দ্বিতীয়

ভুষো-পাগলা

জয়ন্তরা কোদালপুর গ্রামে গিয়ে দেখলে, সুব্রত কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেনি। তাদের পৈতৃক অট্টালিকাখানি কেবল প্রকাণ্ড বললেই যথার্থ বলা হয় না, অত বড় অট্টালিকা রাজধানী কলকাতাতেও বোধ হয় দু-চারখানার বেশী নেই। আর সেই অট্টালিকার চারিপাশ ঘিরে বিরাজ করছে যে উদ্যান, তার সীমানা নির্দেশ করাও হচ্ছে রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং এক সময়ে যে তার সৌন্দর্যও ছিল অপূর্ব, সে-বিষয়ে নেই কোনই সন্দেহ। কিন্তু তার বর্তমান রূপ দেখলে মন হা-হা করে ওঠে।

অট্টালিকার কোন কোন অংশ ধ্বসে পড়ে রচনা করেছে পাহাড়ের মতন স্তূপ। এবং তার কোন কোন অংশ কোনক্রমে এখনো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের বর্ণহীন, বালুকাহীন ও গঠনহীন বড় বড় ফাটল-ধরা গায়ের উপরে বিরাজ করছে রীতিমত বন-জঙ্গল। মস্ত মস্ত অশথ, বট ও নিমগাছের দল প্রায় তাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে আছে, আর সেই সব গাছের ডালে ডালে বাদুড়, প্যাঁচা ও আরো নানা-জাতীয় পাখিরা এসে বাসা বেঁধেছে। এবং সেইসব গাছের তলদেশ জুড়ে আছে নানা-শ্রেণীর আগাছার ঝোপ-ঝাপ।

অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্ববর্তী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জমি, আগে যার নাম ছিল উদ্যান, এখন তারও অবস্থা ভয়াবহ বললেও চলে। আজ কেউ তাকে কল্পনাতেও উদ্যান বলে সন্দেহ করতে পারবে না, কারণ, তার নানা স্থানেই আশ্রয় নিয়েছে এমন গভীর জঙ্গল, যা দেখলে মহা

অরণ্য 'সুন্দরবন'-এর কথাই মনে পড়ে। এক সময়ে যখন এখানে ছিল ফুলবাগান আর ফলবাগান, তখন যে চারিদিকেই ছিল উচ্চ ও কঠিন প্রাচীর, নানা জায়গায় আজও তার চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আজ প্রাচীরের অধিকাংশই ভেঙেচুরে একেবারে হয়েছে ভূমিসাৎ।

সুন্দরবাবু রীতিমত ভীতকণ্ঠে বললেন, 'হুম্! জয়ন্ত, তুমি কি বলতে চাও, গভীর অরণ্যের মধ্যে এই বিপুল ভগ্নস্তূপের ভিতরেই এখন কিছুকাল ধরে আমাদের বাস করতে হবে? উঁহু, উঁহু, কিছুতেই আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই কেউ আমাকে এখানে থাকতে রাজী করাতে পারবে না। যত সব পাগলার পাল্লায় এসে পড়েছি! বাব্বাঃ, বেড়াতে এসে শেষটা কি পৈতৃক প্রাণটিকে নষ্ট করব? এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিষধর সর্প যে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! তার উপরে এখানে যে বাঘ-ভাল্লুক জাতীয় বদ্-মেজাজী জানোয়াররা নেই, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না! আমি আজই এখান থেকে সবেগে পলায়ন করতে চাই।'

সুব্রত বললে, 'মাভৈঃ সুন্দরবাবু, মাভৈঃ। এই ভাঙা অট্টালিকার মধ্যে এমন একটা অংশ আছে, যা ছোট্ট হলেও একেবারে আধুনিক বলেই মনে হবে। যে কয়দিন আমরা এখানে থাকব, সেই অংশটাই হবে আমাদের বাসস্থান।'

জয়ন্ত অধীর কণ্ঠে বললে, 'সুব্রতবাবু, এ-সব বাজে কথা এখন ছেড়েদিন। আপনি যে বড় পুষ্করিণীর কথা বলেছিলেন, আমি আগে সেইখানেই যেতে চাই।'

সুব্রত অগ্রসর হয়ে বললে, 'আসুন আপনারা, আমি এখন সেই দিকেই যাত্রা করছি।'

বহু আগাছার ঝোপ এবং লতাপাতার জাল দিয়ে ঘেরা বনস্পতির মতন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের 'জনতা' ভেদ করে মিনিট-পাঁচেক ধরে অগ্রসর হয়ে খানিকটা খোলা জায়গার উপরে এসে পড়ল তারা। সেখানেও ঝোপ-ঝাপ আছে বটে, কিন্তু বড় গাছের সংখ্যা অত্যন্ত

কম। তারই মাঝখানে দেখা গেল যেন ঘাসের সবুজ-মাখা একটা সমতল জমি।

মানিক বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনাদের বাগানের ভিতরে এত বড় একটা সবুজ মাঠ কেন?'

সুব্রত হেসে বললে, 'ওটা মাঠ নয় মানিকবাবু, ঐটে হচ্ছে আমাদের বাগানের প্রধান পুষ্করিণী। ওর অধিকাংশই ভরে গিয়েছে পানায় আর পানায়, তাই ওকে দেখাচ্ছে সবুজ মাঠের মতন! ওখানে লাফ দিয়ে পড়লে মোটেই মাটি খুঁজে পাবেন না, তলিয়ে যাবেন একেবারে অতল তলে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্। এত বড় পুকুর আমি কলকাতাতেও দেখিনি! এ কি পুকুর, এ যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ! উঃ! সুব্রতবাবুর পূর্বপুরুষরা কি ধনীই ছিলেন!'

এইরকম সব কথা বলতে বলতে সকলে সেই সরোবরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক বললে, 'দেখছি, পুকুরের ঐ ভাঙাঘাটের কাছে পানার অত্যাচার নেই।'

সুব্রত বললে, 'বাগানের পাঁচিলের বেশীরভাগই ভেঙে গিয়েছে, গ্রামের লোকজনরা তাই অবাধে এইখানে এসে ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করে। একটি নয় মানিকবাবু, এই পুকুরের চারিদিকে এখনো আটটি ঘাট বর্তমান আছে। সব ঘাটেরই অবস্থা শোচনীয়, তবু দারুণ গ্রীষ্মের সময় যখন এখানকার সব পুকুরই জলশূন্য হয়ে যায়, তখন গাঁয়ের লোকেরা এসে এই পুকুরেরই জল ব্যবহার করে, কারণ, আমাদের এই পুষ্করিণী এত গভীর যে, এখানে কোনদিনই জলের অভাব হয় না।'

জয়ন্ত বললে, 'এটা তো দেখছি পুকুরের উত্তর দিক্। সুব্রতবাবু, আপনি বলেছেন, এই পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে একটা সেকেলে বটগাছ। আমি এখন সেই গাছটার কাছেই যেতে চাই।'

সুব্রত বললে, 'তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।'

সরোবরের পূর্ব তীর দিয়ে সকলে বেশ খানিকক্ষণ ধরে অগ্রসর হল। তারপর পাওয়া গেল সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত।

সুব্রত অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, 'ভাঙাঘাট আর পুকুরের জলের উপরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ঐ সেই বুড়ো বটগাছ! জয়ন্তবাবু, দেখুন, এর ভিতর থেকে আপনি কোন রহস্যের চাবি আবিষ্কার করতে পারেন কি না!'

জয়ন্ত সেই বটগাছটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, 'এ বটগাছটা দেখছি শিবপুরের 'বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর বিখ্যাত বটগাছটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে! এর চারদিক দিয়ে যে-সব ঝুরি মাটির উপরে এসে নেমেছে, তার প্রত্যেকটাই তো হচ্ছে এক একটা গাছের গুঁড়ির মতন!'

সুব্রত বললে, 'শুনতে পাচ্ছেন কি, ঐ বটগাছের ভিতর থেকে জেগে উঠছে কত চিৎকার? ও চিৎকার হচ্ছে বক আর তাদের বাচ্চাদের। দিনে-রাতে এই অশ্রান্ত চিৎকার কখনো থামে না। তাই গাঁয়ের লোকেরা এই গাছটাকে বটগাছ না বলে 'বক-গাছ' বলে ডাকে।'

হঠাৎ শোনা গেল, চিৎকার করে কে যেন একটা কবিতা আবৃত্তি করছে!

জয়ন্ত সচমকে বললে, 'কথাগুলো যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখতে হল!'

তারপরেই শোনা গেল চেঁচিয়ে কে বলছে—

'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোট্‌কা জট।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'এ-যে সোনার আনারসের ভিতরে পাওয়া সেই ছড়াটারই গোড়ার দিক্।'

জয়ন্ত বললে, 'চুপ! ছড়ার পরের অংশ শোনো।'

শোনা গেল—

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূর্য্যিমামার ঝিক্‌মিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলদ টিক্‌টিকি।'

এই পর্যন্ত বলেই কণ্ঠস্বর আবার হল স্তব্ধ।

জয়ন্ত সহাস্যে বলে উঠল, 'এ যে দেখছি ছড়ার দ্বিতীয় শ্লোক!'

সুব্রত বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, ছড়াটা আমার মুখস্থ নেই বটে, কিন্তু এখন শুনে বেশ বুঝতে পারছি এটা তার দ্বিতীয় শ্লোকই বটে!'

জয়ন্ত আবার বললে, 'চুপ! শোনো!'

অজানা কণ্ঠস্বরে আবার শোনা গেল—

'অগ্নিকোণে নেইকো আগুন,
—কাঙাল যদি মানিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্টভাগে!'

কণ্ঠস্বর আবার স্তব্ধ হল।

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে, 'ও ছড়াটা কে বলছে জানেন? ও হচ্ছে এই গাঁয়েরই একটি লোক। ওর নাম হচ্ছে ভূষণ। এখানকার লোক ওকে ভূষো-পাগলা বলে ডাকে! শুনেছি ওর বাবা ছিলেন আমাদের নায়েব। কিন্তু সোনার আনারসের ঐ ছড়াটা কি করে যে ওর কণ্ঠস্থ হল সে-রহস্য আমি জানি না। তবে মাঝে মাঝে যখনি এখানে এসেছি, তখনি ওর মুখে শুনতে পেয়েছি ঐ ছড়ার পংক্তিগুলি। লোকে বলে, ঐ ছড়া মুখস্থ করতে করতেই ও পাগল হয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু আপনাদের ঐ ভূষো-পাগলা থেমে গেল কেন? আমার মনে হচ্ছে ঐ ছড়াটার নতুন কোন অংশ ওর মুখেই আমরা শুনতে পেতে পারি।'

ঠিক সেই সময়ে পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরের ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে উঠল একটি মূর্তি! তার একেবারে শীর্ণ দেহ, মাথার চুলে জট বেঁধেছে, মুখে রাশীকৃত দাড়ি-গোঁফ এবং সর্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত, কেবল

কম। তারই মাঝখানে দেখা গেল যেন ঘাসের সবুজ-মাখা একটা সমতল জমি।

মানিক বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনাদের বাগানের ভিতরে এত বড় একটা সবুজ মাঠ কেন?'

সুব্রত হেসে বললে, 'ওটা মাঠ নয় মানিকবাবু, ঐটে হচ্ছে আমাদের বাগানের প্রধান পুষ্করিণী। ওর অধিকাংশই ভরে গিয়েছে পানায় আর পানায়, তাই ওকে দেখাচ্ছে সবুজ মাঠের মতন! ওখানে লাফ দিয়ে পড়লে মোটেই মাটি খুঁজে পাবেন না, তলিয়ে যাবেন একেবারে অতল তলে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্। এত বড় পুকুর আমি কলকাতাতেও দেখিনি! এ কি পুকুর, এ যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ! উঃ! সুব্রতবাবুর পূর্বপুরুষরা কি ধনীই ছিলেন!'

এইরকম সব কথা বলতে বলতে সকলে সেই সরোবরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক বললে, 'দেখছি, পুকুরের ঐ ভাঙাঘাটের কাছে পানার অত্যাচার নেই।'

সুব্রত বললে, 'বাগানের পাঁচিলের বেশীরভাগই ভেঙে গিয়েছে, গ্রামের লোকজনরা তাই অবাধে এইখানে এসে ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করে। একটি নয় মানিকবাবু, এই পুকুরের চারিদিকে এখনো আটটি ঘাট বর্তমান আছে। সব ঘাটেরই অবস্থা শোচনীয়, তবু দারুণ গ্রীষ্মের সময় যখন এখানকার সব পুকুরই জলশূন্য হয়ে যায়, তখন গাঁয়ের লোকেরা এসে এই পুকুরেরই জল ব্যবহার করে, কারণ, আমাদের এই পুষ্করিণী এত গভীর যে, এখানে কোনদিনই জলের অভাব হয় না।'

জয়ন্ত বললে, 'এটা তো দেখছি পুকুরের উত্তর দিক্। সুব্রতবাবু, আপনি বলেছেন, এই পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে একটা সেকেলে বটগাছ। আমি এখন সেই গাছটার কাছেই যেতে চাই।'

সুব্রত বললে, 'তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।'

সরোবরের পূর্ব তীর দিয়ে সকলে বেশ খানিকক্ষণ ধরে অগ্রসর হল। তারপর পাওয়া গেল সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত।

সুব্রত অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, 'ভাঙাঘাট আর পুকুরের জলের উপরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ঐ সেই বুড়ো বটগাছ! জয়ন্তবাবু, দেখুন, এর ভিতর থেকে আপনি কোন রহস্যের চাবি আবিষ্কার করতে পারেন কি না!'

জয়ন্ত সেই বটগাছটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, 'এ বটগাছটা দেখছি শিবপুরের 'বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর বিখ্যাত বটগাছটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে! এর চারদিক দিয়ে যে-সব ঝুরি মাটির উপরে এসে নেমেছে, তার প্রত্যেকটাই তো হচ্ছে এক একটা গাছের গুঁড়ির মতন!'

সুব্রত বললে, 'শুনতে পাচ্ছেন কি, ঐ বটগাছের ভিতর থেকে জেগে উঠছে কত চিৎকার? ও চিৎকার হচ্ছে বক আর তাদের বাচ্চাদের। দিনে-রাতে এই অশ্রান্ত চিৎকার কখনো থামে না। তাই গাঁয়ের লোকেরা এই গাছটাকে বটগাছ না বলে 'বক-গাছ' বলে ডাকে।'

হঠাৎ শোনা গেল, চিৎকার করে কে যেন একটা কবিতা আবৃত্তি করছে!

জয়ন্ত সচমকে বললে, 'কথাগুলো যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখতে হল!'

তারপরেই শোনা গেল চেঁচিয়ে কে বলছে—

'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোট্‌কা জট।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'এ-যে সোনার আনারসের ভিতরে পাওয়া সেই ছড়াটারই গোড়ার দিক্।'

জয়ন্ত বললে, 'চুপ! ছড়ার পরের অংশ শোনো।'

শোনা গেল—

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যিমামার ঝিক্‌মিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলদ টিক্‌টিকি।'

এই পর্যন্ত বলেই কণ্ঠস্বর আবার হল স্তব্ধ।

জয়ন্ত সহাস্যে বলে উঠল, 'এ যে দেখছি ছড়ার দ্বিতীয় শ্লোক!'

সুব্রত বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, ছড়াটা আমার মুখস্থ নেই বটে, কিন্তু এখন শুনে বেশ বুঝতে পারছি এটা তার দ্বিতীয় শ্লোকই বটে!'

জয়ন্ত আবার বললে, 'চুপ! শোনো!'

অজানা কণ্ঠস্বরে আবার শোনা গেল—

'অগ্নিকোণে নেইকো আগুন,
—কাঙাল যদি মানিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্টভাগে!'

কণ্ঠস্বর আবার স্তব্ধ হল।

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে, 'ও ছড়াটা কে বলছে জানেন? ও হচ্ছে এই গাঁয়েরই একটি লোক। ওর নাম হচ্ছে ভূষণ। এখানকার লোক ওকে ভূষো-পাগলা বলে ডাকে! শুনেছি ওর বাবা ছিলেন আমাদের নায়েব। কিন্তু সোনার আনারসের ঐ ছড়াটা কি করে যে ওর কণ্ঠস্থ হল সে-রহস্য আমি জানি না। তবে মাঝে মাঝে যখনি এখানে এসেছি, তখনি ওর মুখে শুনতে পেয়েছি ঐ ছড়ার পংক্তিগুলি। লোকে বলে, ঐ ছড়া মুখস্থ করতে করতেই ও পাগল হয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু আপনাদের ঐ ভূষো-পাগলা থেমে গেল কেন? আমার মনে হচ্ছে ঐ ছড়াটার নতুন কোন অংশ ওর মুখেই আমরা শুনতে পেতে পারি।'

ঠিক সেই সময়ে পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরের ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে উঠল একটি মূর্তি! তার একেবারে শীর্ণ দেহ, মাথার চুলে জট বেঁধেছে, মুখে রাশীকৃত দাড়ি-গোঁফ এবং সর্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত, কেবল

কটিদেশে একখণ্ড কৌপীনের মতন বস্ত্র তার লজ্জা রক্ষার চেষ্টা করছে।

ভূষণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তদের দিকে তাকিয়ে রইল।

পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে সুব্রত শুধোলে, 'কি গো ভূষো-পাগলা, এই দুপুরের রোদে ঘাটে বসে তুমি কি করছ?'

ভূষণ মাটির দিকে মুখ নামিয়ে যেন আপন মনেই বললে, 'কিছুই করছি না, কিছুই করছি না, অনেক কিছুই করবার আছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না।'

—'করতে পারছ না কেন?'

—'করতে পারছি না কেন, করতে পারছি না কেন? ছড়ার সঙ্গে পৃথিবী মিলছে না।'

—'মিলছে না কেন?'

—'যে পৃথিবীতে সোনার আনারস ফলে, মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কোনদিনই তার মিল হয় না। সোনার আনারস, সোনার আনারস হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।'

—'তুমি ও ছড়াটা শিখলে কোথায়?'

—'বাবা শিখিয়েছেন গো, বাবা শিখিয়েছেন—বাপ ছাড়া ছেলেকে আর কে শেখাবে বল?'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু ছড়ার সবটা তো তুমি এখনো আমাদের শোনালে না?'

ভূষণ সে-কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল—তার মুখে চোখে ফুটল রীতিমত ভয়-ভয় ভাব! তারপর চারিদিকে ব্যস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল!

সুব্রত বললে, 'হঠাৎ কি হল ভূষো-পাগলা, চারিদিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

সুব্রতের কথা সে শুনতে পেলে বলে মনে হল না। বিড়বিড় করে কি বকতে লাগল তাও বোঝা গেল না।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'কী তুমি বিড়-বিড় করছ ? আমাদের কথার জবাব দাও !'

ভূষণ একেবারে বোবা হয়ে গেল। ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইল এক দিকে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জয়ন্তও ফিরে দেখতে পেলে অল্প দূরেই রয়েছে একটা বড় ঝোপ।

কিন্তু সে ঝোপটা একেবারেই স্থির। সেখানে সন্দেহজনক কিছুই নেই।

হঠাৎ ভূষণ বলে উঠল, 'দুশমন, দুশমন !'

সুব্রত বললে, 'দুশমন আবার কে ?'

—'আমি দুশমনদের গন্ধ পাচ্ছি !'

—'কোথায় ?'

—'এই বাগানে।'

—'বাগানে খালি তো আমরাই আছি !'

—'যেখানে ভগবান, সেইখানেই থাকে শয়তান।'

—'কি পাগলামি করছ !'

ভূষণ গান ধরলে—

'আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগলা ছেলে—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'ভূষণ, ও-গান থামিয়ে তুমি সেই ছড়ার সবটা আমাদের শুনিয়ে দাও।'

—'সোনার আনারসের ছড়া ?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে ছড়া তো তোমাদের শোনাতে পারব না !'

—'কেন বল দেখি ?'

—'তোমরা শুনলে দুশমনরাও শুনতে পাবে।'

—'দুশমন এখানে নেই।'

—'আছে গো, আছে গো, আছে। আজকাল রোজই এখানে তুশমনদের গন্ধ পাই!'

—'তারা কারা?'

—'জানি না। তারা থাকে দূরে দূরে আর আনাচে-কানাচে মারে উঁকিঝুঁকি!'

—'তুমি ভুল দেখেছ!'

—'না গো, না গো, না! আমার চোখ ভুল দেখে না।'

—'বেশ তো, তুমি চুপি চুপি ছড়াটা আমাদের শোনাও না। তাহলে দূর থেকে তুশমনরা কিছুই শুনতে পাবে না।'

—'তোমরা তুশমন নও। ছড়াটা তোমাদের শোনাতে পারি।'

—'বেশ, তবে শোনাও।'

ভূষণ শুরু করলে—

'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট—

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে পড়ে ত্রস্ত চক্ষে আবার সেই ঝোপটার দিকে তাকালে।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তেরও দৃষ্টি ফিরল সেই দিকে। তার দেখাদেখি আর সকলেও ফিরে দাঁড়াল।

মুহূর্ত-তুই পরে দেখা গেল, খানিকটা ধোঁয়া ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে!

প্রায় আধ মিনিট পরে আবার সেই দৃশ্য।

ভূষণ বলে উঠল, 'তুশমন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, ঝোপের ভিতর বসে নিশ্চয় কেউ বিড়ি কি সিগারেট খাচ্ছে!'

ভূষণ আবার বললে, 'তুশমন!'

জয়ন্ত বললে, 'এগিয়ে দেখতে হল।'

জয়ন্তের পিছনে পিছনে আর সকলেও অগ্রসর হল—কেবল ভূষণ

ছাড়া। সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের মনে বিড়বিড় করে কি বকতে লাগল।

মিনিট-খানেকের মধ্যেই সকলে গিয়ে হাজির হল ঝোপের কাছে। বিড়ি বা সিগারেটের ধোঁয়া তখন অদৃশ্য। ঝোপটা বেশ বড়, তার ভিতরে অনায়াসেই দশ-বারো জন লোকের ঠাঁই হতে পারে।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে পাওয়া গেল না জনপ্রাণীকে। তবে পাওয়া গেল একটা প্রমাণ। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ!

জয়ন্ত হেঁট হয়ে জমির উপর থেকে কি তুলে নিয়ে সকলকে দেখালে। সেটা হচ্ছে একটা জ্বলন্ত সিগারেটের অর্ধাংশ।

মানিক বললে, 'তাহলে এখানে বসে নিশ্চয়ই কেউ ধূমপান করছিল। এখন আমাদের আসতে দেখে সিগারেট ফেলে লম্বা দিয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'এটা কি সিগারেট দেখছ?'

—'হুঁ। স্টেট এক্সপ্রেস ৯৯৯।'

—'যে এ-রকম দামী সিগারেট ব্যবহার করে, তার ধনবান হওয়াই উচিত। ঝোপের ভিতরে সিগারেটের গন্ধ ছাড়া আর একটা গন্ধও পাচ্ছি। এসেন্সের মিষ্টি গন্ধে এখানকার বাতাস এখনো ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি এতক্ষণ লুকিয়েছিল, সে কেবল ধনবান নয়, রীতিমত শৌখীনও।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই ঝোপটার ফাঁক দিয়েই দেখতে পাচ্ছি, ও দিকে বিশ-পঁচিশ হাত তফাতে আরো একটা বড় ঝোপ রয়েছে। সেই শৌখীন ধনবান ব্যাটা এখান থেকে পালিয়ে ঐখানে গিয়ে লুকিয়ে নেই তো?'

জয়ন্ত বললে, 'এখনি সে সন্দেহভঞ্জন করা যেতে পারে। চলুন।'

ঠিক সেই সময়ে আচম্বিতে পুষ্করিণীর দিক থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল। তারপরেই চারিদিক আবার স্তব্ধ।

জয়ন্ত এক লাফ মেরে ঝোপের ভিতর থেকে বাইরে গিয়ে পড়ল।

তারপর চটপট চারিদিকে বুলিয়ে নিল নিজের খরদৃষ্টি। কিন্তু কোন দিকেই কারুকে দেখতে পেলে না।

তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, 'কই, কেউ তো কোথাও নেই। তবে আর্তনাদ করলে কে?'

—'আমার বিশ্বাস আর্তনাদ করেছে ভূষো-পাগলা।'

—'কিন্তু সে পাগলাই বা কোথায়? তারও যে টিকি দেখতে পাচ্ছি না।'

—'এস, আর একবার ঘাটের কাছে যাওয়া যাক।'

সুব্রতবাবু জয়ন্তের পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে হতে বললেন, 'এ কি রকম ম্যাজিক বাবা? ঝোপের মাথায় সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ে, কিন্তু ঝোপের ভিতরে মানুষ নেই। পুকুরের ধারে আর্তনাদ জাগে, কিন্তু কারুকে দেখতে পাওয়া যায় না। এ-সব তো ভালো কথা নয়।'

কিন্তু পুকুরের ধারে গিয়েও আর্তনাদের বা ভূষণের অদৃশ্য হওয়ার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না। জয়ন্ত পুকুরের ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'ঘাটের ধাপে ওটা কি পড়ে রয়েছে?'

মানিক এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললে, 'এ যে দেখছি বাঁশের বাঁশি?'

সুব্রত বললে, 'ও হচ্ছে ভূষো-পাগলার বাঁশি! সে বাঁশি বাজাতে ভারি ভালোবাসে, আর ও-বাঁশিটিকে কখনো কাছছাড়া করে না।'

জয়ন্ত বললে, 'যখন অমন প্রিয় বাঁশিকে সে পুকুর ঘাটে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছে, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

—'দুর্ঘটনা!'

—হ্যাঁ। ভূষো-পাগলা হয় ভয়াবহ কিছু দেখে দারুণ আতঙ্কে আর্তনাদ করে বাঁশি ফেলেই বেগে পলায়ন করেছে, নয় কেউ বা কারা তাকে বন্দী করে এখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কোন অর্থই বোঝা যাচ্ছে না। এখানে

ভয়াবহ কিছুই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আর ভূষণের মতন একটা পাগলাকে বন্দী করে কার কি লাভ হতে পারে?'

জয়ন্ত কেবল বললে, 'বোধ হয় শীঘ্রই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।'

তৃতীয়

তীর এবং ধোঁয়া

সুব্রত মিথ্যা বলেনি। সেই মস্ত ভাঙা অট্টালিকার একটা মহলকে মেরামত করে সত্যই সে আবার তার পূর্বশ্রী উদ্ধার করেছে। এ অংশটা যেন আলাদা একখানা বাড়ি।

উপরে-নিচে খান ছয়েক বড় বড় ঘর এবং উপরে-নিচে উঠানের চারিপাশেই আছে বেশ চওড়া দালান। কোথাও অযত্ন বা মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই।

বৈঠকখানা-ঘরটির মধ্যে আসবাবের সংখ্যাধিক্য নেই বটে, কিন্তু তার সাজসজ্জার ভিতরে পরিচয় পাওয়া যায় সুরুচির। এক দিকে আছে ছুখানি কোচ ও একখানি সোফা এবং আর-এক দিকে ধবধবে চাদর-পাতা চৌকি, তার উপরে কয়েকটি মোটা-সোটা, শুভ্র ও কোমল তাকিয়া যেন অতিথিদের আহ্বান করছে সাদর মৌন ভাষায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মার্বেল বাঁধানো গোল টেবিল এবং তার চারিপাশে ঘিরে রয়েছে খান-ছয়েক গদিমোড়া চেয়ার। টেবিলের উপর রাখা হয়েছে একটি নীলবর্ণপ্রধান চীনামাটির ফুলদানিতে কয়েকটি রক্ত-গোলাপ এবং ধূম্রসেবকদের ব্যবহারের জন্যে ছুটি কাঁচের ছাইদান।

দেওয়ালকে অলঙ্কৃত করছে প্রাচ্য চিত্রকলা-পদ্ধতিতে আঁকা আটখানি ছবি। এখানে বিদ্যুৎ বাতি নেই বটে, কিন্তু ছাদ থেকে ঝুলছে পেট্রলের এমন একটি বড় লণ্ঠন, যা প্রচুর আলোক বিতরণ করে অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসেই।

ঘরের তিন দিকের জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের পানে তাকালেও এখানকার যা প্রধান বিশেষত্ব, সেই বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ

বা আগাছাদের ভিড় চোখে পড়ে না। দেখা যায় শুধু ঘাসের সবুজ মখমলে মোড়া পরিষ্কার সমতল জমি এবং এখানে-ওখানে ছোট বড় ফুলগাছদের বর্ণ বৈচিত্র্য।

সুন্দরবাবু ধপাস করে একখানা কোচের উপরে বসে পড়ে বললেন, 'হুম্! এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আফ্রিকার নিবিড় অরণ্য ত্যাগ করে আমরা আবার সভ্যজগতে ফিরে এলুম। দিব্যি ঘরখানি! চোখ জুড়িয়ে যায়!'

মানিক বললে, 'সুব্রতবাবু জঙ্গল সাফ করে বাড়ির এই অংশটিকে এমন উপভোগ্য করে তুলতে আপনার তো কম খরচ হয়নি। প্রবাদের কথাই সত্যি—মরা হাতিরও দাম লাখ টাকা।

সুব্রত একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে, 'পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন। আমি একেলে বাঙালী বাবুদের মতন নই মানিকবাবু। কত যুগ ধরে যেখানকার আকাশে-বাতাসে আমার পূর্বপুরুষদের পবিত্র স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, কেমন করে ভুলব সেখানকার মাটির প্রেমকে? তেমন সামর্থ্য থাকলে সমস্ত অট্টালিকা আর উদ্যানের নষ্ট-শ্রী আবার আমি উদ্ধার করতুম, কিন্তু উপায় নেই—উপায় নেই। অট্টালিকার ঐ একটি অংশকেই বাসোপযোগী করে তুলতে গিয়ে মহাজনের কাছে আমাকে ঋণ স্বীকার করতে হয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনার উপরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ল। যারা নিজেদের বংশগৌরব আর অতীত মহিমা ভুলে যায়, তারা মানুষ নামের যোগ্য নয়। অথচ বাংলাদেশের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখতে পাই এমনি অমানুষের দল। তারা আজ নিজেদের গ্রাম ভুলে নব্য আর শহুরে হবার জন্যে কলকাতায় এসে সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল-ক্রিকেট আর হোটেল-রেস্তোরাঁ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে। মুখময় তাদের 'স্নো' আর 'পাউডারে'র প্রলেপ, চোখে তাদের শখের চশমা, ওষ্ঠাধরে সিগারেট, হাতে 'রিস্টওয়াচ' আর নট-নটীদের ছবি, পরনে ফিরিঙ্গি পোশাক আর পায়ে মেয়েলী চলনের ভঙ্গী। অথচ তাদের

নায় তাদের গ্রাম যে অরণ্যের নামান্তর হতে বসেছে, সেদিকে
ই খেয়াল—এমন কি খেয়াল করবার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই। আমি
কীটপতঙ্গ বলে মনে করি—এরা কেবল নরাধম নয়, পশুরও
আপনি যে এ-জাতীয় জীব নন, আপনার মধ্যে যে যথার্থ
আছে, তারই প্রমাণ পেয়ে আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত
...কিন্তু যাক সে কথা। এখন কাজের কথা হোক। কোদাল-
মধ্যে এখন সব-চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি কে?'

-'বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে?'

-'সবচেয়ে ধনী বা প্রতিপত্তিশালী।'

ব্রত একটু ভেবে বললে, 'এখানে এমন কেউ নেই, যাকে খুব ধনী
য়। তবে এখানে এমন একজন লোক আছে, স্থানীয় বাসিন্দারা
খুব মানে।'

-'মানে কেন?'

-'ভয়ে।'

-'ভয়ে?'

-'আজ্ঞে, হ্যাঁ। তার নাম প্রতাপ চৌধুরী। সে একজন দুর্দান্ত
যে তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাকেই বিপদে পড়তে
। বার-দুয়েক খুনের মামলাতেও তাকে আসামী হতে হয়েছিল,
ই বারেই প্রমাণ অভাবে সে খালাস পায়। এখানকার কোন
তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করে না।'

ান্ত কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, 'বটে, বটে? তাহলে আরো ভালো
াকটির কথা বলুন তো সুব্রতবাবু।'

'প্রতাপকে চোখে দেখে কিছু বোঝবার যো নেই। ফরসা রঙ,
দুস মাঝারি চেহারা, সর্বদাই মিষ্টি হাসিমাখা মুখ, এক জামা
রে না—এমনি শৌখীন সে।'

'তাহলে সে ধনবান?'

—'এইখানেই একটা আশ্চর্য রহস্য আছে। তার পৈতৃক সম্পত্তি

নেই, সে নিজেও কোন কাজকর্ম করে না, অথচ তার টাকার অভাব নেই। মাঝে-মাঝে সে বেশ কিছু দিনের জন্যে গ্রাম ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়—কেন যায়, কোথায় যায়, কেউ তা জানে না। প্রতাপের সঙ্গে সর্বদাই একদল লোক থাকে, সে গ্রাম থেকে অদৃশ্য হলে তাদেরও আর দেখতে পাওয়া যায় না। লোকগুলোর চেহারা ভদ্র না হলেও চাকর-দ্বারবানেরও মত নয়—কিন্তু তারা সকলেই জোয়ান।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রতাপ কি রকম লোক বলে মনে করেন?'

—'সন্দেহজনক।'

—'কেন?'

—'যে অর্থবান নয়, অথচ যার অর্থের অভাব নেই, সে লোকের উপর দৃষ্টি রাখা দরকার। এখানকার পুলিসের কাছে খবর নিলে প্রতাপ সম্বন্ধে হয়তো আরো নতুন কথা জানতে পারব।'

—'তার চেয়ে চলুন না, আমরা নিজেরাই গিয়ে প্রতাপবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ জমিয়ে আসি।'

সুব্রত বললে, 'আপনার এ আশা আজ সফল হবে না। আমি এখানে এসেই খবর পেয়েছি, প্রতাপ এখন কোদালপুরে নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'যাক্, তাহলে আপাতত প্রতাপকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এইবারে স্নানাহারের চেষ্টা করা যাক্।'

সে উঠে দাঁড়াল এবং সেই মুহূর্তেই জানলা-পথ দিয়ে কি একটা জিনিস সাঁ করে তার মাথার পাশ দিয়ে ছুটে দেওয়ালে বাধা পেয়ে ঘরের মেঝের উপরে সশব্দে গিয়ে পড়ল!

জয়ন্ত সচমকে জিনিসটার দিকে তাকিয়েই এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক তাড়াতাড়ি জিনিসটা মাটির উপর থেকে তুলে নিলে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'হুম্! ওটা যে দেখছি তীর!'

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ সুন্দরবাবু! ওটা যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারত,

তাহলে আর আমার স্নানাহারের দরকার হোত না।'

সুব্রত বললে, 'কে তীর ছুঁড়লে? কেন ছুঁড়লে?'

—'কে ছুঁড়লে জানি না। জানলার কাছে এসে তো জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না। তবে কেন যে ছুঁড়েছে, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। এই কোদালপুরে এমন কোন মহাত্মা আছেন, যাঁর ইচ্ছা নয় যে, আমি আর ধরাধামে বর্তমান থাকি।'

—'সে কি জয়ন্তবাবু, এখানে তো কারুরই আপনার উপরে রাগ থাকবার কথা নয়! এখানে কে আপনাকে চেনে?'

—'যাদের চেনা উচিত, তারাই চেনে! আমি সোনার আনারসের রহস্য উদ্ধার করতে এসেছি, আমাকে আবার তারা চিনবে না?'

—'তারা কারা?'

—'যারা আপনাকে আক্রমণ করে সোনার আনারসের ছড়া চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, যারা বাগানের ঝোপে বসে আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ্য রেখেছিল, যাদের দেখে ভুষো-পাগলা আর্তনাদ করে উঠেছিল, তাদেরই অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়েছে আজ আমার উপরে। এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সুন্দরবাবু, মানিক, আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে—এ শত্রু বড় সামান্য শত্রু নয়, এরা এখন আমাদের পিছনে পিছনেই ঘুরবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সুব্রতবাবু, এই বিশ শতাব্দীতেও তীর ছোঁড়ে তো খালি অসভ্য দেশের লোকেরা! আরে ছ্যাঃ, আপনাদের কোদাল-পুর আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, বিশ শতাব্দীতেও সময়ে সময়ে আগ্নেয় অস্ত্রের চেয়ে তীর বেশি কাজে লাগতে পারে। তীর-ধনুক বন্দুকের মতন গর্জন করে পাড়া মাত্ করে না, কাজ সারে চুপিচুপি।...আরে আরে সুন্দরবাবু, আঙুল বুলিয়ে তীরের ফলার ধার পরীক্ষা করছেন কেন? ও তীর যদি বিষাক্ত হয়?'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তীরটা মাটির উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

বললেন, 'ও বাবা, ঠিক তো! এটা তো আমি ভাবিনি! একটু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি, হুম্!'

—'যাক, তীরন্দাজের কথা ভুলে এইবার স্নান-আহার সেরে নেওয়া যাক্। বড়ই বেলা হয়েছে।'

সন্ধ্যার কিছু আগে জয়ন্ত বললে, 'সুব্রতবাবু, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।'

বাইরে বেরিয়ে সুব্রত জিজ্ঞাসা করলে, 'জয়ন্তবাবু, কোন্ দিকে যাবেন?'

—'যে-দিকে প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ি।'

—'কিন্তু সেখানে গিয়ে কি হবে? প্রতাপকে তো পাবেন না।'

—'প্রতাপকে না পাই, তার বাড়িখানাকে তো পাব।'

—'প্রতাপ যখন দলবল নিয়ে অদৃশ্য হয়, তখন তার বাড়ি তালা-বন্ধ থাকে।'

—'থাকুক তালা-বন্ধ। বাড়িখানাকে আমি একবার বাইরে থেকে দেখতে চাই। যে কোন বাড়ি তার মালিকের অল্প-বিস্তর পরিচয় দিতে পারে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী যে বল জয়ন্ত, কিছু মানে হয় না।'

—'খুব হয়। একখানা বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় তার মালিক কোন্ প্রকৃতির লোক! সে ধনী, না মধ্যবিত্ত, না দরিদ্র? সে শৌখীন, না সাদাসিধে? এমন আরো অনেক কিছুই বাড়ি দেখে আমি বলে দিতে পারি।'

—'ইশ তাহলে আর ভাবনা ছিল না! কারুর বাড়ি দেখেই তুমি বলে দিতে পারো, সে সাধু, না চোর? সে গাঁজা খায়, না চণ্ডু খায়? যত সব বাজে ধাপ্পা।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি বড্ড বেশী এগিয়ে যাচ্ছেন, অতটা আমি পারি না।'

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, আপনি ঠিক বলেছেন। আপনার বসত-বাড়ি দেখে জয়ন্ত কিছুতেই বলতে পারবে না যে, তার মালিকের মাথায় আছে কাঁচের মতন তেলা টাক আর কোমরে আছে মস্ত বড় ঝোঝুল্যমান ভুঁড়ি! হ্যাঁ হে জয়ন্ত, তুমি তা বলতে পারবে কি?'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'মানিক, চিরদিনই কি তুমি সুন্দরবাবুকে চটাবার চেষ্টা করবে?'

সুন্দরবাবু প্রাণপণে মনের রাগ দমন করতে করতে বললেন, 'হুম, মানিকের মতন ছ্যাঁচড়ার কথায় আমি আবার না কি রাগ করব! আরে ছোঃ! মানিককে আমি ছুঁচোর মতন বাজে জীব বলে

মনে করি।'

সুন্দরবাবুকে আরো বেশী রাগাবার জন্যে মানিক আবার কি বলবার উপক্রম করছিল, কিন্তু জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার সময় আমার নেই। চলুন সুব্রতবাবু, প্রতাপের বাড়ি আমাকে চিনিয়ে দিন।'

সকলে অগ্রসর হল।

কোদালপুর গ্রামখানি বিশেষ বড় গ্রাম নয়। কাঁচা পথ, তার এধারে-ওধারে মাঝে মাঝে দু-চারখানা মেটে-ঘর এবং মাঝে মাঝে দু-একখানা কোঠাবাড়ি।

খানিক দূর অগ্রসর হয়ে পাওয়া গেল একখানা লাল রঙের তিনতলা বাড়ি। তার চারপাশে আছে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা ন্যাড়াজমি।

সুব্রত বললে, 'এই হচ্ছে প্রতাপের বাড়ি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত ভায়া, তুমি বাড়ি দেখে বাড়ির মালিককে না কি চিনতে পারো? এ বাড়িখানাকে দেখে তোমার কী মনে হয়?'

জয়ন্ত বললে, 'আমার কী মনে হয়? আমার মনে হয়, এ বাড়ির মালিক অত্যন্ত সাবধানী!'

—'মানে?'

—'মানে ঐ বাড়ির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়ির জানলায় থাকে সোজা চার কি পাঁচটি গরাদে। কিন্তু এ বাড়ির জানলায় দেখছি, সোজা গরাদের সঙ্গে আড়াআড়ি লোহার গরাদে দেওয়া! তার মানে হচ্ছে, এই বাড়ির মালিক চান যে, বাইরের কোন লোক সহজে যেন বাড়ির ভিতর ঢুকতে না পারে! এতটা সাবধানতার পিছনে নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে!'

সুব্রত বললে 'জয়ন্তবাবু, প্রতাপের বাড়ি দেখলেন তো?'

জয়ন্ত বললে, 'দেখলুম বৈ কি! বাড়ির ফটকে মস্ত এক তালা লাগানো রয়েছে। তার মানে হচ্ছে, এই বাড়ির ভিতরে কোন লোক

নেই। আচ্ছা, আসুন! যখন বাড়িখানাকে পেয়েছি, তখন এর চারি-দিকটা একবার প্রদক্ষিণ করে দেখা যাক্!'

—'তাতে আমাদের কি লাভ হবে?'

—'লাভ? হয়তো কিছুই লাভ হবে না, তবু আরো কিছুক্ষণ পদচালনা করলে বিশেষ ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা নেই বোধ হয়?'

সকলে বাড়ির চতুর্দিকে একবার ঘুরে এল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নজরে পড়ল না। বাড়ির প্রত্যেক জানলা বন্ধ, কোথাও জীবনের কোন লক্ষণই নেই।

গ্রামের উপরে তখন ক্রমেই ঘন হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। পাখির দল বাসায় ফিরে গিয়েছে, এখানে-ওখানে গাছের ওপর থেকে ভেসে আসছে তাদের বেলা-শেষের কলরব।

জয়ন্ত এক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আবার থমকে দাঁড়ালে কেন বাপু? শেষটা কি অন্ধের মত সাপের খপ্পরে গিয়ে পড়বে?'

জয়ন্ত চোখ না ফিরিয়েই বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনি তো বললেন, এ বাড়ির ভিতরে লোকজন কেউ নেই?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বচক্ষেই তো দেখলেন বাড়ির বাইরে তালা দেওয়া!'

—'তা দেখেছি বটে। কিন্তু এখন আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করছি।'

—'কি?'

—'ধোঁয়া।'

—'ধোঁয়া আবার কি?'

—'বাড়ির দোতলার কোণের ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, একটা বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার পর ধোঁয়া।

জয়ন্ত বললে, 'ধোঁয়া কি মানুষের অস্তিত্বই প্রমাণিত করে না?'

মানিক বললে, 'বোধ হয় ওটা রান্নাঘর। কেউ উনুনে আগুন দিয়েছে।'

—'হুঁ। এখন আমাদের কি করা উচিত?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখন আমাদের কিছুই না করা উচিত। সোজা বাসায় ফিরে চল।'

—'তাই যাব। কিন্তু তারপর গভীর রাত্রে আবার আমরা এইখানেই ফিরে আসব।'

—'কেন?'

—'বাড়ির ভিতরটা দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

—দেখবে কেমন করে? দরজায় তো তালা বন্ধ! দরজা ভাঙবে?'

—'উঁহু। আগে বাইরের প্রাচীর লঙ্ঘন করব।'

—'তারপর?'

—'তেতলার ছাদ থেকে ঐ যে বৃষ্টির জল বেরুবার নলটা মাটির দিকে নেমে এসেছে, ঐটে অবলম্বন করে সোজা ছাদের উপর গিয়ে উঠব।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বল কি হে? ও-সব আমাকে দিয়ে হবে-টবে না বাপু! তারপর যদি ফস্ করে হাত ফসকে —উঃ!' তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না, শিউরে উঠে দুই চক্ষু মুদে ফেললেন।

জয়ন্ত বললে, 'আপনি সুব্রতবাবুর সঙ্গে বাসাতেই থাকবেন। আমার সঙ্গে আসবে খালি মানিক।'

মানিক বললে, 'রাজী!'

চতুর্থ

সেই রাত্রে

ঢং ঢং ঢং ঢং—

জয়ন্ত প্রথম রাত্রেই শয্যাগ্রহণ করেছিল এবং মানিকও। কিন্তু তাদের ঘুম অত্যন্ত সজাগ।

ঘড়ি বার-চারেক বাজতে না বাজতেই জয়ন্ত বিছানার উপরে ধড়মড় করে উঠে বসে ডাকলে, 'মানিক!'

মানিকও ততক্ষণে বিছানার উপরে উঠে বসেছে। দুই হাতে দুই চোখ কচলাতে কচলাতে বললে, 'শুনেছি। রাত বারোটা বাজছে।'

—'আমাদের পোশাক পরাই আছে। উঠে পড়। ঐ ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে ভুলো না। চল, আর দেরি নয়।' জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে নিজের ব্যাগটার দিকে বাহু বিস্তার করলে।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবুর নাক এখনো গান গাইছে। যাবার সময় ওঁকে বলে গেলে হয় না?'

—'হুম্! না, আমার নাক এখনো গান গাইছে না! তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি!'

মানিক সবিস্ময়ে ফিরে দেখল, সুন্দরবাবু জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন তারই মুখের পানে! বললে, 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। স্বচক্ষে দেখলুম আপনার নিদ্রিত চক্ষু, আর স্বকর্ণে শুনলুম আপনার জাগ্রত নাসিকা-ধ্বনি! অথচ আপনি—'

সুন্দরবাবু উঠে বসতে বসতে বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার নাক ডাকলেও আর আমার চোখ বুজে থাকলেও আমি নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়িনি। তোমরা যাবে হাঁড়িকাঠে মাথা গলাতে

আর আমি ঘুমিয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকব ? আমি কি অমানুষ ? আমি কি তোমাদের ভালোবাসি না ?'

জয়ন্ত বললে, 'প্রতাপ চৌধুরীর বাড়িখানাকে আপনি হাঁড়িকাঠ বলে মনে করেন না কি ?'

—'নিশ্চয় ! প্রতাপ চৌধুরীর যেটুকু বর্ণনা শুনেছি, তাই-ই যথেষ্ট ! তার উপরে, এই কালো ঘুটঘুটে রাতে, নর্দমার নল বয়ে তোমরা ওঠবার চেষ্টা করবে এক অজানা শত্রুপুরীর তেতলায় ! এমন অপচেষ্টার কথা কেউ কখনো শুনেছে না কি ? উঃ ! তোমাদের এই মতলব শুনে পর্যন্ত বুক এত ধড়ফড় করছে যে, হয় তো আমার কোন শক্ত ব্যামো হবে। এ-সব শুনেও কেউ কখনো নাকে সরষের তেল দিয়ে অঘোরে ঘুমোতে পারে ?'

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, 'আপনি নাসিকার জন্যে সরিষার তৈল ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু আপনার নাসিকা যে ভীষণ কোলাহল করছিল, সে-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই !'

সুন্দরবাবু বিছানার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মারমুখো হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আমার নাসিকা কোলাহল করছিল, বেশ করছিল ! আমার নাসিকা যত খুশি কোলাহল করতে পারে, তাতে তোমার কি হে বাপু ? ফাজিল ছোকরা ! খালি খালি আমার পিছনে লাগা ?'

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, 'শান্ত হোন সুন্দরবাবু, শান্ত হোন ! মানিক, এখন মশকরা করবার সময় নেই। জানো, আমাদের সামনে রয়েছে কি গুরুতর কর্তব্য ?'

মানিক বললে, 'জানি জয়ন্ত, জানি ! কিন্তু সুন্দরবাবুর মাথার উপরে ঐ লাউয়ের মতন তেলা টাক, আর কাঁকড়ার দাড়ার মতন ওঁর ঐ একজোড়া গোঁফ, আর ওঁর ঐ থলথলে বিপুল ভুঁড়িটিকে দেখলেই আমার মন যেন অট্টহাস্য না করে থাকতে পারে না। বেশ সুন্দরবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন ! আজকের মত আমি মৌনব্রত অবলম্বন করলুম।'

সুন্দরবাবুর সমস্ত রাগ যেন জল হয়ে গেল একেবারে। তিনি হঠাৎ এগিয়ে এসে ডান হাতে জয়ন্তের কাঁধ এবং বাম হাতে মানিকের কাঁধ চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত! ভাই মানিক! আমাকে এখানে একলা ফেলে কেন তোমরা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি তো আপনাকে একলা থাকতে বলছি না। আপনিও তো অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন।'

সুন্দরবাবুর দুই ভুরু উঠে গেল কপালের দিকে এবং তাঁর সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল একটা প্রবল উত্তেজনার শিহরণ। আড়ষ্টভাবে তিনি বললেন, 'হুম্! ছাতের জল বেরুবার নল বয়ে আমি উঠব তেতলার উপরে? জয়ন্ত, তোমার মাথা কি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে? হুম্, হুম্, হুম্! আমার এই শরীরটিকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না?'

—'বেশ তো, আপনি না হয় মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থেকেই পাহারা দেবার চেষ্টা করবেন!'

—'পাগল! আজ আমি এখানে এক দিনেই তিন বার তিনটে গোখরো সাপকে স্বচক্ষে দেখেছি! এখানকার মাটি ছাতের জল বেরুবার নলের চেয়েও বিপজ্জনক। আমি ভাই ছাপোষা মানুষ—ঘরে আছে স্ত্রী আর আধ-ডজন ছেলেমেয়ে। আমার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি যমালয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।'

জয়ন্ত দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে বললে, 'বেশ, তাহলে আপনি নিরাপদে এইখানেই অবস্থান করুন। আমাদের আর বাধা দেবেন না—আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি জয়ন্তের সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তার চেয়ে জয়ন্ত, আমার আর একটা পরামর্শ শোনো।'

—'কি পরামর্শ?'

—'কালকেই টেলিগ্রাফ করে আমি এখানে একদল পুলিস

ফৌজ আনাব। তারপর সদল-বলে গিয়ে ঘেরাও করব প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ি।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'তা হয় না সুন্দরবাবু। হয়তো গ্রামের দিকে দিকে আছে প্রতাপ চৌধুরীর চরেরা। এখানে হঠাৎ পুলিস ফৌজের আবির্ভাব দেখলেই যথাস্থানে সেই খবর গিয়ে পৌঁছবে। তারপর? তারপর আমরা দেখব গিয়ে খাঁচা খালি—পাখিরা কোথায় অদৃশ্য! এখন আর কথা-কাটাকাটি করবার সময় নেই। এস মানিক!'

সুন্দরবাবু হতাশভাবে শয্যার উপরে বসে পড়লেন। তিনি আর একটিও বাক্যব্যয় করবার অবসর পর্যন্ত পেলেন না। জয়ন্ত এবং মানিক ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে।

আলো-হারা কালো রাতের বুকে জাগছিল খালি ঝিল্লীদের কণ্ঠ এবং থেকে থেকে তিমির-তুলি দিয়ে আঁকা গাছপালার পাতায় পাতায় বাতাস ফেলছিল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। রাতের নিজস্ব একটা ঝিমঝিম ধ্বনি আছে বটে, কিন্তু সে ধ্বনি কানে কেউ শোনে না, প্রাণে করে অনুভব।

নির্জন পল্লী-পথ। কাছে বা দূরে কোন কুটির বা বাড়ির ভিতর থেকে ফুটে উঠছে না এক টুকরো আলোক-রেখাও।

খানিক দূর অগ্রসর হবার পর জয়ন্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মানিক শুধোলে, 'দাঁড়ালে কেন?'

—'পিছনে একটা শব্দ শুনলুম।'

—'কি রকম শব্দ?'

—'শুকনো পাতার উপরে পায়ের শব্দ।'

—'কুকুর কি শেয়াল যাচ্ছে।'

—'হতে পারে। চল।'

কিছু দূর এগিয়ে জয়ন্ত আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'আবার পায়ের শব্দ শুনছি।'

এবারে মানিকও শুনতে পেয়েছিল। সে বললে, 'জয়ন্ত, কেউ কি আমাদের অনুসরণ করছে?'

—'অসম্ভব নয়। কেউ হয়তো আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ রেখেছে। টর্চ জ্বালো।'

জয়ন্ত ও মানিক দুজনেই টর্চ জ্বেলে দিকে দিকে আলোক নিক্ষেপ করলে। কোন মনুষ্য-মূর্তির বদলে দেখা গেল, একটা শৃগাল ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'কিন্তু আমরা যে শব্দ শুনেছি, তা শেয়ালের পায়ের শব্দ নয়। চুলোয় যাক্। এগিয়ে চল মানিক।'

—'কিন্তু পিছনে শত্রু নিয়ে কি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

—'কত ধানে কত চাল দেখাই যাক্ না। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।'

দুজনে অগ্রসর হল। কাছে এবং দূরে দুই গাছের ডালে বসে দুটো প্যাঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন করছিল। রাত্রি-জগতের বিপুল কালো প্রজাপতির মত একটা বাদুড় উড়ে গেল বাতাসকে সশব্দে ডানা দিয়ে আঘাত করতে করতে। তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

পিছনে সেই পদশব্দ।

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, 'শুনছ?'

—'হুঁ।'

—'এই ঝোপটার আড়ালে তাড়াতাড়ি বসে পড়।'

দুজনে গা-ঢাকা দিলে ঝোপের আড়ালে গিয়ে।

খানিকক্ষণ কিছু শোনা গেল না। তারপর মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল পায়ের শব্দ। বেশ বোঝা গেল, কেউ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একটা অস্পষ্ট অপচ্ছায়া।

ঝোপের প্রায় পাশে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে মূর্তি নিজের মনেই বললে, 'কি আশ্চর্য ! এইখানেই তো ছিল, গেল কোথায় ?'

জয়ন্ত হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাঘের মতন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নিজের দুই অতি বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে তাকে করলে প্রচণ্ড আলিঙ্গন।

আর্ত, অবরুদ্ধ কণ্ঠে লোকটা বললে, 'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে !'

বাহুর বন্ধন একটু আলগা করে জয়ন্ত বললে, 'কে তুই ?'

—'আমি এই গাঁয়েই থাকি।'

—'তুই আমাদের পিছু নিয়েছিস কেন ?'

—'না, আমি আপনাদের পিছু নিইনি। আমি ভিন গাঁয়ে গিয়েছিলুম, ফিরতে রাত হয়ে গেল।'

—'তোর নাম কি ?'

—'শ্রীমানিকচাঁদ বিশ্বাস।'

—'আরে, তুমিও মানিক ? তাহলে এ যে হয়ে দাঁড়াল মানিক-জোড়! ওহে আমাদের পুরাতন মানিক, এখন এই নতুন মানিকটিকে নিয়ে কি করা যায় বল দেখি ?'

—'আপাতত হাত-পা-মুখ বেঁধে ওকে এই ঝোপের ভিতরে ফেলে রেখে যাওয়া যাক্। তারপর বাসায় ফেরবার সময়ে ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ জমালেই চলবে।'

—'উত্তম প্রস্তাব। তাহলে এস, আমাকে সাহায্য কর।'

—'আমাকে ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন! আমি নির্দোষ, নিরীহ ব্যক্তি!'

তার পকেট হাতড়ে জয়ন্ত আবিষ্কার করলে একখানা মস্ত বড় শাণিত ছোরা। বললে, 'তুমি যে কি রকম নিরীহ ব্যক্তি, এই বাঘ-মারা ছোরাখানা দেখেই বেশ বুঝতে পারছি। মানিক, চটপট বেঁধে ফেল এই খুনে গুণ্ডাটাকে। আমাদের অনেক কাজ বাকি।'

লোকটার হাত-পা-মুখ বেঁধে তাকে ঝোপের ভিতরে নিক্ষেপ করে জয়ন্ত ও মানিক আবার হল অগ্রসর।

আরো খানিক পরে তারা এসে দাঁড়াল প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ির সুমুখে।

চারিদিক নিঃসাড় এবং নিবিড় অন্ধকারের কালো বনাত দিয়ে মোড়া। বাড়ির কোনখানেই কোন জীবনের লক্ষণ নেই।

অতি অনায়াসেই তারা পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তারা কান পেতে রইল, কিন্তু অন্ধকারের ভিতরে শুনতে পেলে না কোনরকম সন্দেহজনক শব্দ।

জয়ন্ত ফিসফিস করে বললে, 'মানিক, আমাদের ছাতে ওঠবার সিঁড়ি—অর্থাৎ বৃষ্টির জল বেরুবার সেই নলটা ঐ দিকের কোথাও আছে। এখানে টর্চ ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। বাড়ির দেওয়ালের

গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আমাদের নলটাকে খুঁজে বার করতে হবে।'

চক্ষু অন্ধকারে অন্ধ, কাজটা খুব সহজ হল না। কিন্তু অবশেষে পাওয়া গেল নলটাকে।

—'মানিক, একসঙ্গে আমাদের ছুজনের ভার এই নলটা হয়তো সইতে পারবে না। তুমি নিচেই দাঁড়াও। আগে আমি ছাতে গিয়ে উঠি—তারপর তুমি।'

ছুজনেই যখন ছাতের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতাকে যেন খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে কোথা থেকে চিৎকার করে উঠল একটা কুকুর। বার-তিনেক কেঁউ-কেঁউ করেই আবার সে চুপ করলে।

জয়ন্ত চিন্তিত স্বরে বললে, 'মানিক, কুকুরটা হঠাৎ কেন ডাকলে?'

—'কুকুর কেন ডাকলে, কুকুরই তা জানে। কুকুরের ভাষা আমি শিখিনি।'

—'কিন্তু ঐ কুকুরটার ডাক অস্বাভাবিক বলে মনে হল নাকি?'

—'তা হল বটে।'

—'আমার কি মনে হল, জানো?'

—'কি?'

—'ও যেন নকল কুকুরের ডাক।'

—'মানে?'

—'কুকুরের স্বরের অনুকরণে চিৎকার করলে যেন কোন মানুষ।'

—'তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত?'

—'আমি বলতে চাই, ওটা কুকুরের ডাক নয়, মানুষের সঙ্কেত ধ্বনি, কেউ যেন কাকে কোন কারণে সাবধান করে দিলে।'

—'তাহলে শত্রুরা কি জানতে পেরেছে যে, তাদের আড্ডায় আবির্ভূত হয়েছে আমাদের মতন ছুজন অনাহুত অতিথি?'

—'খুব সম্ভব, তাই।'

—'এ ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত ?'

—'এখন উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন ভুলে যাও মানিক। এখন ছাতের উপরেই থাকি, আর নল বয়ে আবার নিচেই নেমে যাই, দুটোই হচ্ছে এক কথা। ঐ কোণে রয়েছে চিলের ছাত। ওর তলায় আছে বাড়ির ভিতরে নামবার সিঁড়ি। এস, মরবার বা বন্দী হবার আগে দেখেনি, এই বাড়ির ভিতরটা কি রকম! কোন ভয় নেই, বিপদ নিয়েই তো আমাদের কারবার! এরও চেয়ে ঢের বেশি বিপদকে আমরা ফাঁকি দিয়েছি, আজও কি আর পারব না? এস, দেখি—সাধুর সহায় ভগবান!'

চিলের কুঠরির তলাতেই ছিল সিঁড়ি। জয়ন্ত ও মানিক দ্রুতপদে নিচের দিকে নেমে গেল—টর্চের আলো করলে তাদের পথনির্দেশ।

টর্চের আলো ফেলে ফেলেই খুব তাড়াতাড়ি তারা দেখে নিলে, এদিকে বারান্দার কোলে রয়েছে পাশাপাশি তিনখানা ঘর। প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘরের দরজা তালাবন্ধ, কিন্তু তৃতীয় ঘরখানা তালাবন্ধ নয়—যদিও বাহির থেকে তার শিকল ছিল তোলা।

দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তিনতলা থেকে দোতলায় নামবে কি নামবে না, এমন সময় শোনা গেল বোধ হয় একতলার সিঁড়িতে উচ্চ পদশব্দ! একজনের নয়, দুইজনের নয়—অনেক লোকের পদশব্দ। এবং তারা উপরে উঠছে অত্যন্ত দ্রুতপদেই।

—'মানিক, মানিক!'

—'কি জয়ন্ত ?'

—'ফাঁদে পড়েছি—এক রকম যেচেই। আর ভাববার সময় নেই। এই দুটো ঘরই তালাবন্ধ, কিন্তু ও-ঘরটার বাহির থেকে কেবল শিকল তোলা আছে। চল, আমরা ঐ ঘরেই ঢুকে ভিতর থেকে খিল এঁটে দি।'

—'কিন্তু তাহলে যে আমাদের অবস্থা হবে কলে-পড়া ইঁদুরের মতন!'

—'মোটেই নয়। অকারণেই আমরা 'অটোমেটিক' রিভলবার সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি। একটা কোণ পেলে হয়তো আমরা যুদ্ধ করে অনেক শত্রু বধ করতে পারব।'

চোখের পলক -ফেলতে-না-ফেলতে জয়ন্ত ও মানিক তৃতীয় ঘরের শিকল খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিলে। বাইরের দ্রুত পদশব্দগুলো তখন হাজির হয়েছে ত্রিতলের বারান্দার উপরে।

অকস্মাৎ অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকেই বিকট স্বরে হা-হা-হা-হা অট্টহাস্য করে কে বলে উঠল, 'এসেছ বন্ধুগণ? এস, এস, আমি যে তোমাদেরই পথ চেয়ে আছি! হা-হা-হা-হা-হা!'

ঘরের বাইরে এবং ভিতরেও শত্রু। জয়ন্ত ও মানিক দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত। এতটা তারা কল্পনা করতে পারেনি!

পঞ্চম

তারপর

হা-হা-হা-হা-হা-হা! ঘরের ভিতরে আবার অট্টহাসি!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মানিকের হাত ধরে টেনে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল যে-দিক থেকে অট্টহাসি আসছিল না সেই দিকে। তারপর এমন ভাবে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াল, যেন পিছন থেকে কেউ তাদের আক্রমণ করতে না পারে।

ঘরের ভিতরে আবার বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠস্বর জাগল—'এসেছ বন্ধুগণ! এস, এস, আমি যে তোমাদেরই জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি!' তারপরই শুরু হল গান:

'এস এস বঁধু এস,
আধ আঁচরে বোসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি!'

উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠের এই হাসি, কথা ও গান শুনে সচকিত জয়ন্ত একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'কে তুমি? তোমার গলা যে চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে।'

—'হচ্ছে না কি? হচ্ছে না কি? হা-হা-হা-হা! বন্ধু আর বন্ধুর গলা চিনবে না?'

—'তুমি হচ্ছো ভুষো-পাগলা!'

—'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোট্‌কা জট।

হা-হা-হা-হা-হা-হা ! সোনার আনারসের এই ছড়া তোমরা জানো ? তাহলে—'

কিন্তু ভূষো-পাগলার কথা আর শেষ হল না, হঠাৎ বাহির থেকে ঘরের দরজার উপরে শোনা গেল দমাদ্দম পদাঘাতের শব্দ। একসঙ্গে অনেকগুলো পা দরজার পাল্লা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে।

ঘরের ভিতরের বিপদ সম্বন্ধে জয়ন্ত তখন নিশ্চিন্ত হয়েছে—কারণ, পাগলা হলেও ভূষো নিশ্চয়ই বিপজ্জনক নয় ! জয়ন্ত ছুটে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললে, 'দরজা ভাঙবার চেষ্টা করো না ! আমরা নিরস্ত্র নই !'

বাহির থেকে হো-হো করে হেসে সচিৎকারে কে বললে, 'ওরে ছিঁচকে চোর ! তুই কি ভেবেছিস আমরাও সশস্ত্র নই ?'

—'আমাদের কাছে 'অটোমেটিক' রিভলবার আছে—এক মিনিটে তারা কতগুলো গুলিবৃষ্টি করতে পারে তা জানো ?'

—'আমাদের দলে লোক আছে পনেরো জন। তোমরা দু-একটা গুলি ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই আমরা তোমাদের দুজনকে কেটে কুচি-কুচি করে ফেলব।'

—'বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারো। ব্যাপারটা যা ভাবছ ততটা সহজ নয়।'

—'দ্যাখ্, ভালো চাস তো ভালোমানুষের মতন ধরা দে।'

—'তারপর ?'

—'তারপর আবার কি ?'

—'তারপর আমাদের নিয়ে তোমরা কি করবে ?'

—'আগে ধরা তো দে, তারপর সে-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।'

—'চমৎকার ! তোমার নাম কি বাছা ?'

—'আমার নাম তো একটু আগেই তোরা শুনেছিস !'

—'কি রকম ?'

—'আমার নাম মানিকচাঁদ বিশ্বাস।'

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে উঠে সকৌতুকে বললে, 'আরে, আরে, তুমি সেই ছোরাধারী মানিকচাঁদ—যাকে আমরা ঝোপের ভিতরে ঘাস-বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছিলুম? তোমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলে কে হে?'

—'ওরে গঙ্গারাম, তুই কি ভেবেছিস এখানে আমি ছাড়া আর কেউ তোদের ওপরে দৃষ্টি রাখেনি? তোরা চলে আসবার তিন-চার মিনিট পরেই আমি মুক্তি পেয়েছি!'

—'বটে, বটে, বটে! তোমার সৌভাগ্যের কথা শুনে আমার হিংসে হচ্ছে যে!'

—'তার মানে?'

—'তুমি তো দিব্যি চট করে মুক্তি পেয়েছ। কিন্তু আমরা কি অত সহজে তোমাদের কদলী প্রদর্শন করতে পারব?'

—'সে আশায় জলাঞ্জলি দে। তোরা বাঘের গর্তে ঢুকেছিস। আমাদের গুপ্তকথা জানতে পেরেছিস। তোরা কি আর কখনো ছাড়ান পাবি বলে আশা রাখিস?'

—'আশা রাখি বৈ কি মানিকচাঁদ, আশা রাখি বৈ কি, খুব রাখি! কিন্তু বাপু, ঐ যে গুপ্তকথাটা উল্লেখ করলে, ওর অর্থ কি? তোমাদের কোন্ গুপ্তকথা আমরা জানতে পেরেছি?'

—'ভূষো-পাগলা যে এখানে আছে, এ কথা কি তোরা জানতে পারিসনি?'

—'এও আবার একটা গুপ্তকথা না কি? ভূষো তো পাগলা মানুষ, ও যেখানেই থাকুক তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন?'

—'তোরা তো ভূষোকে পাবার জন্যেই এখানে এসেছিস রে!'

—'মোটেই নয়।'

—'তবে কি তোরা এখানে এসেছিস হাওয়া খাবার জন্যে?'

—'আমরা এসেছি অন্য একটা কথা জানবার জন্যে।'

—'কি কথা ?'

—'যে-বাড়ি সবাই জানে খালি বাড়ি, তার ভিতরে মানুষ থাকে কেন ?'

—'এ কথা জেনে তোদের লাভ ?'

—'লাভালাভের ধার ধারি না, আমরা এসেছি কৌতূহল চরিতার্থ করতে।'

—'কৌতূহল চরিতার্থ, না আত্মহত্যা করতে ?'

—'আমরা আত্মহত্যা করতে মোটেই রাজী নই। যাক্, এ-সব বাজে কথা! মানিকচাঁদ তোমার সঙ্গে তো অনেকক্ষণ আলাপ হল, এইবার আমরা আর একজনের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

—'কার সঙ্গে ?'

—'তোমাদের কর্তা প্রতাপ চৌধুরীকে ডাকো।'

—'তিনি তো এখন কলকাতায়!'

—'এটা কি সত্য কথা ?'

—'তিনি এখানে থাকলে তোর মত পাজির-পা-ঝাড়ার সঙ্গে কথা কয়ে আমাকে মুখ-ব্যথা করতে হোত না।'

—'ও, আপাতত তুমিই বুঝি এখানকার প্রধান সেনাপতি ?'

—'না, আপাতত আমিই এ-বাড়ির মালিক।'

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'তার মানে ?'

—'প্রতাপবাবুর সঙ্গে এখন এ-বাড়ির আর কোনই সম্পর্ক নেই।'

—'সম্পর্ক নেই! কেন ?'

—'বাড়িখানা তিনি আমার কাছে বিক্রি করেছেন। প্রতাপবাবু এ গ্রামে আর থাকতে চান না।'

—'কেন, এ গ্রামটি তাঁর পক্ষে কি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ?'

প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। নতুন এক গলায় শোনা গেল, —'মানিক, তুমি লোকটার সঙ্গে এত কথা কইছ কেন বল দেখি ?

তুমি কি বুঝতে পারছ না, ও তোমার পেটের কথা আদায় করবার চেষ্টা করছে ?'

—'ঠিক বলেছিস ভজা ! ধড়িবাজটার সঙ্গে আর কোন কথা নয় । ওহে জয়ন্ত, এইবার শেষ বার জিজ্ঞাসা করছি, দরজা তোমরা খুলবে, না আমরা ভেঙে ফেলব ?'

—'দরজা আমরা খুলব না, ভাঙতে চাও তো তোমরাই ভাঙো ।··· আমরা তোমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত । মানিক, রিভলবার বার করে দরজার পাশে এসে দাঁড়াও । দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দুজনে গুলিবৃষ্টি করব । হতভাগারা বোধ হয় 'অটোমেটিক' রিভলবারের মহিমা জানে না ।' শেষের কথাগুলো জয়ন্ত এমন চিৎকার করে বললে যে বাইরের সবাই শুনতে পেলে ।

কিন্তু বাহির থেকে দরজা ভাঙার কোন চেষ্টাই হল না । কেবল শোনা গেল, মানিকচাঁদরা পরস্পরের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইছে । তারপর তাদের কণ্ঠস্বর হল একেবারে নীরব ।

জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে ঘরের অন্য দিকের একটা খোলা জানলার ভিতর দিয়ে বাহিরটা একবার দেখবার চেষ্টা করলে । কিন্তু দেখা গেল কেবল অন্ধকার । রাত্রি তখন দিবসের দিকে অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্তু আকাশের কালিমা পাতলা হবার কোন লক্ষণই নেই । পৃথিবীও যেন বোবা হয়ে আছে ।

মানিক চুপি চুপি বললে, 'জয়ন্ত, ওরা বোধ হয় আজ রাতে কোন গোলমাল করবে না ।'

—'হুঁ, আমারও তাই বিশ্বাস । ওরা ভোরের জন্য অপেক্ষা করছে, রাতের অন্ধকারে ওরা আমাদের গুলি হজম করতে রাজী নয় । এখন দেখা যাক্, এই অন্ধকারের সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারি কি না ! আস্তে আস্তে একবার জানলার কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি !'

মানিক জানালার কাছে গিয়ে নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ।

তারপর ফিরে এসে বললে, 'নিচের জমির দিকে তাকিয়ে মনে হল, কারা যেন এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে।'

—'মানিকচাঁদ তাহলে ওদিকেও পাহারা রাখতে ভোলেনি। দেখছ আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। কালকের প্রভাত হয়তো আমাদের পক্ষে সুপ্রভাত হবে না!'

এতক্ষণ পরে ভূষো-পাগলা হঠাৎ মুখ খুলে বলে উঠল,—'সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! আমি জানি আমার জীবনে আর সুপ্রভাত আসবে না। কিন্তু তোমরা কে বাপু? তোমরা এখানে কেন?'

জয়ন্ত বললে,—'মানুষ নিজের বিপদকে কতখানি বড় করে দেখে বুঝেছ তো মানিক! ভূষো-পাগলা যে আমাদের সঙ্গেই আছে, এ-কথা আমরাও ভুলে গিয়েছিলুম। যাক্, এ তবু মন্দের ভালো। ভূষোর সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্।' এই বলে সে টর্চের আলো জ্বেলে দেখলে, ঘরের মেঝের উপরে ভূষো-পাগলা লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে।

মানিক বললে,—'এ কি ভূষণ, তোমার মাথায় আর মুখে যে চাপ চাপ শুকনো রক্ত!'

ভূষো হেসে বললে,—'দুশমনরা লাঠি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আমাকে এখানে ধরে এনেছে। এই দ্যাখ না, আমার হাত-পা-ও বাঁধা!'

জয়ন্ত বললে,—'আহা, বেচারী! মানিক, ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও।'

বাঁধন খুলে দিতে দিতে মানিক বললে,—'আচ্ছা ভূষণ, তোমার মতন নিরীহ মানুষের উপরে এমন অত্যাচার কেন? তুমি কি ওদের কোন অনিষ্ট করেছ?'

ভূষো মাথা নেড়ে বললে,—'কিছু না, কিছু না। নিজের উপকার কি পরের উপকার, কিছুই আমি করতে পারি না। আমি খালি খাই-দাই, বগল বাজাই আর সোনার আনারসের গান গাই!'

—'তবে ওরা তোমাকে ধরে রেখেছে কেন, সে-কথা কি জানো ?'

—'ওদের মুখেই শুনে জেনেছি।'

—'কি জেনেছ ?'

—'আমি সোনার আনারসের ছড়া জানি বলেই ওরা আমাকে ধরে রেখেছে !'

—'তাই না কি ?'

—'হ্যাঁ। ওরা আমাকে আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। ওদের বিশ্বাস, আমি আরো অনেক কথা জানি।'

জয়ন্ত বললে,—'বটে, বটে ? তুমি আরো অনেক কথা জানো না কি ?'

—'অনেক কথা জানি গো, আবার অনেক কথা জানি না !'

—'তুমি কি কি কথা জানো ভূষণ ?'

ভূষোর দুই চক্ষে ফুটল সন্দেহের ভাব। সে বললে,—'আমার কথা তুমি জানতে চাও কেন ? ও, তুমিও বুঝি ঐ দলে ? ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার মনের কথা জেনে নিতে চাও !'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে,—'না ভূষণ, আমরা তোমার বন্ধু, তোমাকে উদ্ধার করতেই এখানে এসেছি।'

—'হা-হা-হা-হা ! আমরা তিনজনেই যে ইঁদুর-কলে ধরা-পড়া ইঁদুর ! এখন কে কাকে উদ্ধার করে ?'

—'ভূষণ, লোকে তোমাকে পাগল বলে বটে, কিন্তু তোমার কথাবার্তা তো ঠিক পাগলের মতন নয় !'

—'লোকে ঠিক বলে গো, ঠিক বলে ! আমি পাগল নই তো কি ? ঐ সোনার আনারসের ছড়াই আমাকে পাগল করেছে।'

—'ছড়া আবার কারুকে পাগল করতে পারে না কি ?'

—'সোনার আনারসের ছড়ার মানে বুঝলে পাগল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ও বড় বিষম ছড়া গো, মানুষকে মত্ত করে তোলে !'

—'কিন্তু ছড়ার শেষটা তো তুমি এখনো আমাদের শোনাওনি !'

—'শুনবে ? তা শোনাতে আমার আপত্তি নেই। আমার মুখে এ ছড়াটা তো আরো কত লোকে শুনেছে, কিন্তু কেউ পারেনি এর মানে বুঝতে !'

—'আমিও মানে বুঝতে পারব না, তবু ছড়ার সবটা শুনতে ক্ষতি কি ?'

—'তবে শোনো—'

ভূষোকে বাধা দিয়ে হঠাৎ ঘরের বাহির থেকে সগর্জনে কে চিৎকার করে উঠল,—'খবর্দার ভূষো, খবর্দার ! ছড়াটা ওদের কাছে বললে তোকে আমরা এখনই খুন করে ফেলব !'

ভূষো ভয়ে কুঁচ্‌কে পড়ে বললে,—'শুনছ তো ? ঘরের বাইরে দুশমনরা আড়ি পেতেছে ? আর ছড়া বলে কাজ নেই বাবা !'

জয়ন্ত বললে,—'কাকে তুমি ভয় করছ ভূষণ ? ওদের বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর ! দেখলে তো, আমাদের ভয়ে ওরা দরজা ভাঙতে সাহসই করলে না !'

দরজার দিকে ত্রস্ত চক্ষে বার বার তাকাতে তাকাতে ভূষো বললে — 'তাহলে ছড়ার শেষটা বলব ?'

—'নিশ্চয়ই বলবে ! দেখি কে তোমার কি করে !'

ভূষো বললে ঃ

'বাঘ-রাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।
সেইখানেতে জলচারী,
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে,
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ ধরে লাইনগুলো মনে মনে আউড়ে নিয়ে বললে, —'ভূষণ, তোমার ছড়ার সবটাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।'

—'মানে বুঝতে পারলে ?'

—'পরে সে চেষ্টা করে দেখব বৈকি !'

—'পরে কি আর সময় পাবে ?'

—'কেন পাব না ?'

—'আমরা যে কলে-পড়া ইঁদুর !'

জয়ন্ত উত্তর না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বাইরে অন্ধকার তখন আর ততটা নীরন্ধ্র নয়। পুবের আকাশে আলোকের প্রথম ইঙ্গিত জাগতে আর বেশি দেরি নেই। বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন প্রভাতের প্রসন্ন স্নিগ্ধতা।

আচম্বিতে ওদিক্‌কার খোলা জানলাটার ওপাশে হল কালো অপচ্ছায়ার মতন একটা মূর্তির আবির্ভাব এবং চোখের পলক পড়বার

আগেই মূর্তিটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, ঘরের ভিতরে কি একটা জিনিস নিক্ষেপ করে !

পর-মুহূর্তে ভীষণ এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরটা ভরে উঠল বিষম তীব্র এক দুর্গন্ধে !

জয়ন্ত প্রায়বদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'জানলার দিকে চল—জানলার দিকে চল ! ওরা বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুঁড়েছে ! উঃ !'

কিন্তু তারা কেউ জানলা পর্যন্ত পৌঁছতেই পারলে না, সবাই মাটির উপরে পড়ে অসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল !

ষষ্ঠ

'ভোল্, ভোল্'

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত দেখলে, তার বুকের উপরে ঝুঁকে রয়েছে একখানা উদ্বিগ্ন মুখ! সে মুখ সুন্দরবাবুর।

সুন্দরবাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'হুম্, বাঁচলুম! জয়ন্তের জ্ঞান হয়েছে!'

জয়ন্ত শ্রান্তস্বরে বললে, 'আমার কি হয়েছে সুন্দরবাবু? চোখে কেন ঝাপ্সা দেখছি—মাথার ভিতরে বিষম যন্ত্রণা, নিঃশ্বাস টানতেও কষ্ট হচ্ছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমরা কোথায় গিয়েছিলে তা কি মনে পড়ছে না?'

—'কোথায়?'

—'প্রতাপ চৌধুরীর বাড়িতে।'

ধাঁ করে জয়ন্তের মনের পটে ফুটে উঠল যেন একখানা বিদ্যুতে আঁকা চলচ্চিত্র! দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তন! নিশীথ রাত্রি, মানিক-চাঁদের আবির্ভাব, প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ি, শত্রুদের আক্রমণ, অন্ধকার ঘর, ভূষো-পাগলার অট্টহাসি—তারপর বিষাক্ত বোমার বিস্ফোরণ!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সুন্দরবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না জয়ন্ত, না! ডাক্তারবাবু বলে গিয়েছেন, এখনো দু-তিন দিন তোমাকে বিছানাতেই শুয়ে থাকতে হবে।'

—'মানিক কোথায়, মানিক?'

ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে ক্ষীণস্বরে জবাব এল, 'জয়, এই যে আমি! তোমার আগেই আমার জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু শরীরে যেন আর পদার্থ নেই!'

—'ভগবানকে ধন্যবাদ, মানিকও আমার সঙ্গে আছে! ভূষো-পাগলার খবর কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাকেও এনেছি, তার জ্ঞান হয়েছে সকলের আগে!'

—'কোথায় সে?'

—'এই বাড়িরই অন্য একটা ঘরে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে।'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর বললে, 'সুন্দরবাবু, ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। —কালকের নাট্যাভিনয়ে আপনার আবির্ভাব হল কোন্ ভূমিকায়, কখন আর কোথায়?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি বড় বেশী বকাবকি করছ। আগে আর একটু সুস্থ হও, তারপর কাল সব শুনো।'

সত্য কথা। জয়ন্তের মাথার ভিতরটাও তখনও রীতিমত ধোঁয়াটে আর ঘোলাটে হয়ে ছিল এবং থেকে থেকে তার দমও যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দমন করে সে বললে, 'সুন্দরবাবু, সব কথা না শুনলে মন আমার শান্ত হবে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তা আবার আমি জানি না? ও মন আবার শান্ত হবে? হুম্! ও মন যে দুর্দান্ত মন! সব জানি, সব জানি!'

জয়ন্ত হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'জানেন তো কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এই আমি দুই চোখ বন্ধ করে খুলে রাখলুম কেবল দুই কান! এখন খুলুন আপনার মুখ!'

ওদিক্‌কার বিছানা থেকে মানিক তেমনি ক্ষীণ স্বরেই বললে, "কিন্তু সাবধান সুন্দরবাবু, সাবধান!'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে ঘরের এদিক-ওদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'সাবধান হতে বলছ কেন মানিক?'

—'ম্যালেরিয়ার মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়।'

—'হোক গে, তাতে আমার কি ?'

—'এখানে ম্যালেরিয়ার মশা আছে।'

—'এই বিশ্রী পাড়াগাঁয়ে যে লাখো লাখো ম্যালেরিয়ার মশা আছে, তা কি আমি জানি না ? কিন্তু আচমকা তুমি ধান ভান্‌তে শিবের গান গাইছ কেন ?'

—'জয়ন্ত আপনাকে মুখ খুলতে বলছে। কিন্তু যে মশারা বাইরে থেকে কুটুস্ করে কামড়ালেই ম্যালেরিয়ায় ধরে, মুখ খোলা পেয়ে সেই বেপরোয়া মশারা যদি দল বেঁধে আপনার বিপুল ভুঁড়ির অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে আপনি তাদের হজম করতে পারবেন কি ? তারা হুল ফুটিয়ে দেবে আপনার পিলে, লিভার আর হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির উপরে ! তখন ? তখন কি হবে ? এইসব ভেবে-চিন্তেই আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ! এখানে মুখ খোলা নিরাপদ নয় সুন্দরবাবু ! আমি আপনার বন্ধু, আপনার হাপরের মতন মস্ত উদর যে ম্যালেরিয়ার আস্তানায় পরিণত হয়, এটা আমি ইচ্ছা করি না। সাবধান !'

সুন্দরবাবু রেগে তিড়বিড় করতে করতে বললেন, 'মানিক ! তুমি হচ্ছো ঝাল ধানী-লঙ্কার মত অসহনীয় ! প্রায় মরতে বসেছ, তবু জোঁকের মত আমার পিছনে লাগতে ছাড়বে না ?'

মানিক ঠোঁট টিপে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললে, 'আপনাকে যে বড্ড ভালোবাসি সুন্দরবাবু। আপনাকে কি ছাড়তে পারি ?' এই বলেই সে বিছানার উপরে টপ্ করে উঠে বসে দুই বাহু বিস্তার করে বললে, 'আমি আপনাকে ছাড়ব ? আমি এখনি শয্যা ছেড়ে আপনাকে পরম শ্রদ্ধাভরে আলিঙ্গন করব !'

সুন্দরবাবু এক লাফে তার কাছে গিয়ে পড়ে চিৎকার করে বললেন, 'মানিক ! আমি নিষেধ করছি—তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না ! ডাক্তার বলেছেন, তাহলে তোমার অসুখ বাড়বে। শুয়ে পড়, এখনি শুয়ে পড় !'

মানিক খাট ছেড়ে নামবার চেষ্টা করে মাথা নেড়ে বললে, 'না, আমি আপনাকে ছাড়ব না ! আমি আপনাকে আলিঙ্গন করবই করব !' সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন এবং তারপর তাকে ধীরে ধীরে আবার বিছানার উপরে শুইয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মানিক, অকারণে বাক্য-বিষ ছড়িয়ে কেন আমায় জ্বালাও বল দেখি ? কেন তুমি খালি খালি আমাকে রাগিয়ে দাও ? তুমি কি জানো না, জয়ন্ত আর তোমাকে আমি কত ভালোবাসি ? হুম্ !'

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'মানিক, তোমার এই অসাময়িক প্রহসনের অভিনয় আজ আমার ভালো লাগছে না ! যেখানে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যুদ্ধ, সেখানে প্রহসন আমি পছন্দ করি না। আসুন সুন্দরবাবু, বলুন আপনার কথা।'

মানিক খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'ভাই জয়, জীবন আর মৃত্যু নিয়ে শখের খেলাই হচ্ছে যে আমাদের ব্যবসা ! প্রহসনের অভিনয় তো এখানেই সাজে !'

—'হাত জোড় করি ভাই মানিক ! তোমার দার্শনিকতার লেকচার থামাও, সুন্দরবাবুর কথা শুনতে দাও।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার কথা বলব কি ভাই জয়ন্ত, সব কথা আমি নিজেই এখনো ভালো করে বুঝতে পারিনি।'

'রাত্রিবেলায় তুমি আর মানিক তো প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ির দিকে যাত্রা করলে, আমি একলা ঘরে বসে বসে ভাবতে লাগলুম কত রকম দুর্ভাবনা ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, শেষ-রাতের অন্ধকার ঠেলে ফুটল সকালের আলো, তবু তোমাদের দেখা নেই !

'ভেবে ভেবে আমি পাগলের মতন হয়ে উঠলুম। বুঝলুম নিশ্চয়ই তোমরা কোন বিপদে পড়েছ। হয়তো তোমরা আর বেঁচে নেই, এমন সন্দেহও হল। সুব্রতবাবুও বললেন, মানুষ খুন করতে নাকি প্রতাপ চৌধুরীর একটুও বাধে না।

'হাজার হোক আমি পুলিসের লোক তো, এই কাজে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি—হুম্, ভেবে সারা হলেও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি না! দুশ্চিন্তার কালো মেঘের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম একটুখানি আশার আলো!

'সুব্রতবাবুকে নিয়ে ছুটলুম এখানকার থানায়। নিজের আর তোমাদের পরিচয় দিয়ে দারোগাবাবুর কাছে সব কথা খুলে বললুম। তিনি তখনি কয়েকজন চৌকিদার নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তোমাদের খোঁজে সকলে মিলে ছুটলুম প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ির দিকে।

'বাড়ির সদর দরজায় তখন আর বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল না। পাল্লা দু-খানা বন্ধ ছিল ভিতর দিক থেকেই। কিন্তু যখন ডাকাডাকির পরেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল না, তখন দরজা ভেঙেই আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম। তারপর দেখলুম, উঠানের উপরে পড়ে রয়েছে তোমাদের তিনজনের অচেতন দেহ। তারপর—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের দেহ ছিল কোথায়?'

—'বাড়ির একতলার উঠানের উপরে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের বোমায় আমরা জ্ঞান হারিয়েছিলুম দোতলার একখানা ঘরের ভিতরে।'

জয়ন্ত বললে, 'বোঝা যাচ্ছে শত্রুরা আমাদের দেহগুলোকে এক-তলায় নামিয়ে এনেছিল।'

—'কিন্তু কেন?'

—'খুব সম্ভব তারা চেয়েছিল আমাদের দেহগুলোকে স্থানান্তরে সরিয়ে ফেলতে! কিন্তু যথাসময়ে সদলবলে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হয়েছিল তাই রক্ষা, নইলে আমাদের কি দুর্দশা হোত কে জানে?'

—'জয়ন্ত, তুমি 'শত্রু শত্রু' করছ বটে, আমরা কিন্তু সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন শত্রুর একগাছা টিকি পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি।'

—'তারা আপনাদের দেখে চম্পট দিয়েছিল।'

—'তাও সম্ভবপর নয়। পাছে তারা পালায় তাই আমরা চারিদিক থেকে বাড়িখানাকে ঘিরে অগ্রসর হয়েছিলুম।'

—'তাহলে তারা পালাল কেমন করে ?'

—'সেইটেই তো সমস্যা ! আর একটা কথাও মনে রেখো, বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ছিল ভিতর দিক থেকে।'

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, 'হ্যাঁ, এটা একটা ভাববার কথা বটে। ও-বাড়ির সদরে বাইরে তালা দেওয়া থাকলেও ভিতরে বাস করে মানুষ। আবার ও-বাড়ির সদর ভিতর থেকে বন্ধ থাকলেও ভিতরে ঢুকে মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় না। এ এক অদ্ভুত রহস্য !'

ঠিক সেই সময়ে একটি নতুন লোক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'নমস্কার দারোগাবাবু। নতুন কোন খবর আছে ?'

—'আছে।'

—'কি ?'

—'প্রতাপ চৌধুরীর বাড়িতে আমার এক চৌকিদারকে পাহারায় রেখে এসেছিলুম জানেন তো ? আজ সে মারা পড়েছে।'

—'কেন ?'

—'কে তাকে খুন করেছে।'

—'খুন ?'

—'হ্যাঁ। আমরা যখন ঘটনাস্থলে যাই, তখনও সে বেঁচেছিল বটে, তবে সেটা না-বাঁচারই সামিল। কারণ দু-চার বার অস্ফুট স্বরে 'ডোল্' 'ডোল্' বলেই সে মারা পড়ে। তার বুকে আর মুখে ছোরা মারার চিহ্ন।'

জয়ন্ত বললে, 'ডোল্ মানে ?'

—'চৌকিদার ঠিক কি বলতে চেয়েছিল, আমিও তা বুঝতে পারিনি ! তবে এটা দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ির একতলায় সিঁড়ির খিলানের তলার একটা চৌবাচ্চার মতন বড় লোহার ডোল্

বা জলাধার আছে! চৌকিদারের দেহ পাওয়া যায় ঠিক তার পাশেই। কিন্তু তার সঙ্গে চৌকিদারের মৃত্যুর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বোধ হয় মরবার সময়ে লোকটা প্রলাপ বকছিল।'

—'আমারও তাই বিশ্বাস!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার বিশ্বাস অন্য রকম।'

—'কি রকম?'

—'আপনারা খুব সহজেই ব্যাপারটাকে হালকা করে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই হালকা নয়।'

—'কেন?'

—'চৌকিদার যে প্রলাপ বকছিল, তার কোন প্রমাণ আছে?'

—'প্রলাপ বলে অর্থহীন কথাকেই।'

—'কে বললে চৌকিদারের কথা অর্থহীন? আপনারা তার মুখে শুনেছেন 'ডোল্' শব্দটি। আপনারা কি 'ডোল্' বা জলাধার খুঁজে পাননি?'

—'কিন্তু খুঁজে পেয়েও আপনাদের কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে?'

—'সেইটেই বিবেচ্য। অন্তিমকালে চৌকিদারের কথা বলবার শক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। সে-সময়েও সে যখন কোনরকমে 'ডোল্' শব্দটি উচ্চারণ করে ঐদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, তখন তার কথার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অর্থ আছে। এই বিশেষ অর্থটি ধরতে পারলেই হত্যা-রহস্যের কিনারা হতে দেরি লাগবে না।'

দারোগাবাবু বললেন, 'ডোলটি আমি পরীক্ষা করেছি। তার তলায় পড়ে আছে ইঞ্চি পাঁচেক অতি ময়লা পোকা-ভরা জল—ব্যস, আর কিছুই নেই।'

—'অতি ময়লা পোকা-ভরা জল ? তার মানে সে জল কেউ ব্যবহার করত না ?'

—'তাই তো মনে হয়।'

—'তাহলে খানিকটা অব্যবহার্য জল ভরে ওখানে অত বড় একটা ডোল্ বসিয়ে রাখবার কারণ কি ?'

—'কেমন করে বলব ?'

জয়ন্ত হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'দারোগাবাবু, এখানে পালকি পাওয়া যায় ?'

—'যায়। কিন্তু কেন ?'

—'আমি এখনি ঘটনাস্থলে যেতে চাই।'

সুন্দরবাবু হাঁ-হাঁ করে বলে উঠলেন, 'তোমার দেহের এই অবস্থায় ? অসম্ভব, অসম্ভব !'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'খুব সম্ভব, খুব সম্ভব ! আমি তো পায়ে হেঁটে যাচ্ছি না ! আমি জানতুম আপনি আপত্তি করবেন, তাই তো পালকিতে চড়ে যাব রুগীর মত।'

মানিক বললে, 'আর আমি ?'

—'আপাতত তুমি শয্যাগত হয়েই থাকো। এক সঙ্গে দু-দুটো রুগীকে সুন্দরবাবু সামলাতে পারবেন কেন ?'

আবাব প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ি। তার চারিদিকে কড়া পুলিস-পাহারা।

উঠানের উপর দাঁড়িয়ে দারোগাবাবু বললেন, 'সিঁড়ির খিলানের তলায় ঐ দেখুন সেই ডোল্‌টা। ওরই পাশে চৌকিদারের দেহ পাওয়া যায়।'

জয়ন্ত ধীরে ধীয়ে এগিয়ে গেল। একটা গোলাকার লোহার জলাধার। উচ্চতায় আড়াই হাত এবং চওড়ায় তিন হাত। তলার দিকে পড়ে রয়েছে খানিকটা ঘোলা জল।

দারোগাবাবু কৌতুকপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, 'এর ভিতর থেকে আপনি কোন বিশেষ অর্থ আবিষ্কার করতে পারলেন কি?'

—'কৈ, এখনো তো কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।'

—'পরেও পারবেন না মশাই, পরেও পারবেন না! আমাদের হচ্ছে পেশাদার শিকারীর চোখ, যা দেখবার তা আমরা একদৃষ্টিতে দেখেনি!'

—'তা আর বলতে? আপনাদের সঙ্গে আবার আমার তুলনা? কিন্তু দারোগাবাবু, আপনার কাছে আমার একটি আরজি আছে।'

—'বলুন।'

—'ডোল্‌টার ভিতরে জল আছে অল্পই, ওটা বোধ হয় বেশী ভারী নয়। অনুগ্রহ করে আপনার চৌকিদারদের হুকুম দিন, 'অন্ধকার খিলানের তলা থেকে ডোল্‌টাকে উঠানের মাঝখানে টেনে আনতে। আমি ওটাকে আরো ভালো করে দেখতে চাই।'

—'খুব ভালো করে দেখুন, ভালো করে, প্রাণ ভরে, নয়ন ভরে দেখুন, আমার একটুও আপত্তি নেই। ওরে, তোরা ডোল্‌টাকে উঠানের মাঝখানে টেনে আন্ তো! আমাদের শখের গোয়েন্দা-মশাই ওটাকে ভালো করে দেখতে চান!'

দারোগাবাবু গলা চড়িয়ে হাসতে লাগলেন, কিন্তু সুন্দরবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন না। জয়ন্তকে তিনি চিনতেন। আগে আগে তাঁকেও হাস্য করে বারংবার ঠকতে হয়েছে। জয়ন্ত অকারণে কিছু করে না, দারোগার হাসি বন্ধ হতে আর দেরি নেই বোধ হয়। জয়ন্তের কথাবার্তায় পাওয়া যাচ্ছে যেন কি এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত। হুম্!

চৌকিদাররা ডোল্‌টাকে সশব্দে টানতে টানতে উঠানের মাঝখানে নিয়ে এল। জয়ন্ত সেদিকে ফিরেও তাকালে না।

দারোগাবাবু বললেন, 'ও মশাই, বলি আপনার হল কি? ডোল্‌টাকে ভালো করে দেখবেন বললেন না? তবে ওদিকে মুখ

ফিরিয়ে কি দেখছেন? ডোল্ তো আর ওখানে নেই। ···আরে, আরে, ও আবার কি!' তাঁর দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত হয়ে উঠল চরম বিস্ময়ে!

সুন্দরবাবু দুই পদ অগ্রসর হয়ে কেবলমাত্র বললেন, 'হুম্, হুম্!'

ঠোঁট টিপে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে জয়ন্ত বললে, 'দারোগাবাবু, সিঁড়ির তলায় ডোল্টা যেখানে ছিল, সেখানে এটা কি দেখছেন তো?'
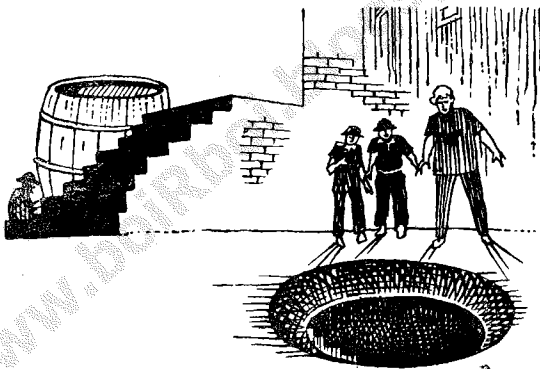
হাঁদারামের মতন মুখ করে দারোগা বললেন, 'একটা বড় গর্ত!'

—'খালি গর্ত নয়, গর্তের ভিতর দিকে নেমে গিয়েছে এক সার সিঁড়ি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'গুপ্তপথ।'

—'হ্যাঁ। যখনি দেখলুম সদর দরজা ভিতর বা বাহির থেকে বন্ধ থাকলেও বাড়ির লোকেরা ভিতরে বা বাহিরে আনাগোনা করতে পারে, তখনি আন্দাজ করলুম, এ-বাড়ির কোথাও-না-কোথাও গুপ্তপথের অস্তিত্ব আছে। তারপর শুনলুম চৌকিদারের অন্তিম উক্তি—'ডোল্'

'ডোল্'! এও শোনা গেল, চৌকিদারের যেখানে মৃত্যু হয় তার পাশেই পাওয়া গিয়েছে একটা মস্ত ডোল্। অবশ্য গুপ্তপথ পাওয়া যাবে যে ডোলের তলাতেই, তখনো পর্যন্ত সেটা আমি আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু এটুকু আমি নিশ্চিতরূপেই বুঝেছিলুম যে, এই ডোল্টাকে অবহেলা করে উড়িয়ে না দিলে কোন-না-কোন মূল্যবান তথ্য প্রকাশ পাবেই। আমার ধারণা যে ভুল নয়, এটা কি এখন আপনি স্বীকার করেন দারোগাবাবু?'

কিন্তু দারোগার অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল, তিনি করুণ চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, নীরবে।

—'আরো একটা কথা আন্দাজ করতে পারছি। চৌকিদারের দেহ কেন এইখানে পাওয়া গিয়েছে। চোখের সামনে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা 'ট্রাজেডি'র শেষ দৃশ্য! বাড়ির পলাতক লোক-গুলো বোধ হয় জানত না, এখানে কোন চৌকিদার মোতায়েন করা হয়েছে। কিংবা জেনেও, বিশেষ কোন প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই তারা আবার এই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল গুপ্তদ্বার দিয়ে। চৌকিদার তাদের দেখতে পায়! তারা পলায়ন করে। চৌকিদার তাদের পিছনে পিছনে এখান পর্যন্ত ছুটে আসে। পাছে সমস্ত গুপ্ত-কথা ব্যক্ত হয়ে যায় সেই ভয়ে তারা তখন চৌকিদারকে করে মারাত্মক আক্রমণ! তারপর গুপ্তপথে নেমে ডোল্টাকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে সরে পড়ে সকলে মিলে। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করুন! অত বড় ডোলে জল আছে মাত্র ইঞ্চি পাঁচেক। অতটুকু জল না রাখলেই চলত, তবু রাখা হয়েছে কেবল দুটি কারণে। প্রথমত জল থাকলে বাইরের কোন অতি কৌতূহলী চক্ষু সন্দেহ করতে পারবে না যে, ডোল্টা জলাধার ছাড়া অন্য কোন কারণে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ত অল্প জল না রাখলে ডোল্টাকে নীচে থেকে ঠেলে সরাতে বা টেনে গর্তের মুখে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হোত। কিন্তু অতি চালাক লোকেরা অতি বোকা হয় প্রায়ই। অত বড় ডোলে অত কম জল—

তাও পচা, পোকায়-ভরা আর অব্যবহার্য। এ-কথা শুনেই আমার মন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল এই সন্দেহে যে, ঐ ডোলে জল রাখা হচ্ছে একটা লোক-দেখানো কাণ্ড! খুব সূক্ষ্ম সন্দেহ, না দারোগাবাবু? এ-রকম সন্দেহের নিশ্চয়ই কোন মানে হয় না, কি বলেন?'

দারোগা দুই হাত জোড় করে বিনীতভাবে বললেন, 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না জয়ন্তবাবু। আমি মাপ চাইছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! জয়ন্তের কাছে যে শেষটা আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এ আমি আগেই জানতুম। কিন্তু যাক্ সে-কথা। এখন এই গুপ্তপথ নিয়ে কী করা যেতে পারে? হয়তো এই গুপ্ত পথের ভিতরে গেলে আশে-পাশে আমরা দেখতে পাব গুপ্তগৃহও, কি বল জয়ন্ত?'

—'তা আমি জানি না।'

—'হয়তো কোন গুপ্তগৃহের ভিতরে আমরা দেখতে পাব অপরাধীর দলকে। এখন আমাদের কি করা উচিত? সদল-বলে গর্তের ভিতরে গিয়ে নামব না কি?'

দারোগা বললেন, 'সেইটেই উচিত বলে মনে হচ্ছে। আমরা সশস্ত্র, দলেও ভারী। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবার এমন সুযোগ হয়তো আর পাব না। আপনার কি মত জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত রিভলবার বার করে বললে, 'সুড়ঙ্গের ভিতরে যে আমাদের নামাই উচিত, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই প্রস্তুত রাখুন নিজের নিজের অস্ত্র।'

সপ্তম

সুড়ঙ্গ

সকলে সুড়ঙ্গ-পথের সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিক নামতে লাগলেন। সর্বাগ্রে দারোগাবাবু।

কয়েকটা ধাপের পরেই সোজা পথ—অন্ধকার ও স্যাঁৎসেঁতে।

টর্চের আলোতে অন্ধকার তাড়িয়ে প্রত্যেকেই যে-কোন মুহূর্তে রিভলবারের ঘোড়া টেপবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

কেবল তাদের জুতোর শব্দগুলোই পাতালের স্তব্ধতা ভেঙে দিতে লাগল, তা ছাড়া অন্য কোনরকম সন্দেহজনক শব্দ নেই।

এক জায়গায় একটা কুঠরীর মত ঠাঁই পাওয়া গেল। তার তিন দিকে দেওয়াল, এক দিক খোলা। দরজা-টরজা কিছুই নেই এবং সেখানেও নেই জনপ্রাণীর চিহ্ন।

আরো খানিক এগুবার পর সুড়ঙ্গ-পথ শেষ হল। সেখানেও কয়েকটা ধাপ উঠে গিয়েছে উপর দিকে।

জয়ন্ত বললে, 'বোঝা যাচ্ছে এই সুড়ঙ্গটা কেবল লুকিয়ে আনা-গোনার জন্যেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সুড়ঙ্গের এই মুখটা ওরা বাইরের চোখের আড়ালে রেখেছে কেমন করে, সেইটেই এখন দ্রষ্টব্য।'

সে ধাপ দিয়ে উঠে গিয়ে উপর দিকে দুই হাত বাড়ালে। হাতে ঠেকল ঠাণ্ডা ধাতুর স্পর্শ। কি এ? লোহার দরজা?

একটু জোর করে ঠেলা দিতেই গঙ্গাজলের 'সিস্টার্ণ'-এর ডালার মত একটা গোলাকার ভারী জিনিস উলটে বাইরের দিকে গিয়ে পড়ল। এবং সুড়ঙ্গের ভিতরে নেমে এল মুক্ত পৃথিবীর আলো।

সকলে সুড়ঙ্গ ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

হাত পনেরো-ষোল চওড়া এবং হাত পঁচিশ-ছাব্বিশ লম্বা ঘাস-জমি,—জঙ্গল ও কাঁটা-ঝোপে ঘেরা।

জয়ন্ত এক-মনে কিছুক্ষণ লোহার ঢাক্‌নাখানা পরীক্ষা করে বললে, 'চিত্তাকর্ষক বটে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কি?'

—'এই ঢাক্‌নাখানা। দেখুন, এটা একটা বড় পাত্রের মত। এর ভিতরে মাটি ভরে ঘাস পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এইবারে দেখুন!' সে ঢাক্‌নাখানা আবার উলটে সুড়ঙ্গের মুখে স্থাপন করলে।

দারোগাবাবু বললেন, 'বাঃ, আশ-পাশের ঘাস জমির সঙ্গে সুড়ঙ্গের মুখটা একেবারে মিলিয়ে গেল যে! একে তো চারিদিকের কাঁটা-ঝোপের ভয়ে এখানে বাইরের কারুর আনাগোনা নেই—তার উপরে চোখে ধুলো দেবার এই সহজ, কিন্তু চমৎকার ফন্দি! কেউ এখানে এলেও কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না। আমরাও পারতুম না—যদি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে না আসতুম!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্!'

জয়ন্ত বললে, 'সুড়ঙ্গের এক মুখে জলের ডোঙ্গা, আর এক মুখে ঘাস-মাটি ভরা ঢাক্‌না! দুই-ই আছে প্রকাশ্য স্থানে, অথচ আসল রহস্য প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কত অল্প!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এত অনায়াসে যে চোখ ঠকাতে পারে, আমি তাকে মস্ত বড় ওস্তাদ বলে মানতে রাজী আছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কে সে?'

জয়ন্ত বললে, 'নিশ্চয়ই প্রতাপ চৌধুরী!'

দারোগাবাবু বললেন, 'কিন্তু তার আর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। আপনাদেরই মুখে শুনলুম, মানিকচাঁদের কাছে বাড়ি বেচে সে এখান থেকে চলে গিয়েছে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'মানিকচাঁদের কথা তখনো আমি বিশ্বাস করিনি, আর এখন বিশ্বাস না করবার মত একটা বড় সূত্রও পেয়েছি।'

—'সূত্র? কি সূত্র?'

—'সূত্রটা নতুন নয়, পুরানো। সেই ৯৯৯ স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট!'

—'মানে?'

—'ঐ দেখুন। শৌখীন প্রতাপ চৌধুরী যে সিগারেট খায়, তারই একটি আধ-পোড়া নমুনা এখানকার ঘাস-জমিকেও অলঙ্কৃত করেছে! সিগারেটটা যদিও এখন নিবে গিয়েছে, কিন্তু ভালো করে দেখলেই বোঝা যায়, ওটা টাটকা। খুব সম্ভব কাল রাত্রেই ওটা শোভা পেয়েছিল প্রতাপ চৌধুরীর মুখে। ওটা যদি বেশী দিন রোদে আর খোলা হাওয়ায় পড়ে থাকত, তাহলে ওর কাগজের উপরে পড়ত দাগ আর সোনালী অংশটার রঙও যেত জ্বলে। হায় প্রতাপ চৌধুরী, তুমি এত বড় ধূর্ত, কিন্তু তুচ্ছ সিগারেট কি না বারবার তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে? অবশ্য তোমার পক্ষেও বলবার কথা আছে। তুমি বলতে পারো,—'তোরা যে এত সহজে আমার এত সাধের সুড়ঙ্গ-রহস্য আবিষ্কার করে ফেলবি, সেটা স্বপ্নেও জানলে আমি কি এখানে দাঁড়িয়ে মনের সুখে সিগারেট টানবার চেষ্টা করতুম?' কিন্তু ঐ তো মুশকিল প্রতাপ চৌধুরী, ঐখানেই তো মুশকিল! অতি ধূর্তরা সেয়ানাপনায় নিজেদের অদ্বিতীয় বলে মনে করে, আর শেষ পর্যন্ত সেই নির্বুদ্ধিতাই তাদের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক! নয় কি দারোগাবাবু? আমি আপনার কাছে শিক্ষানবীস মাত্র, কিন্তু আমি কি ভুল বলছি?'

দারোগা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'নিজেকে শিক্ষানবীস বলে জাহির করে আর আমাকে আক্রমণ করবেন না জয়ন্তবাবু! আপনি যদি শিক্ষানবীস হন, আমাকে তাহলে মানতে হয় যে, আমি এখনো গোয়েন্দাগিরির আ-আ পর্যন্ত শিখিনি। যে ছোট বক্তৃতাটি দিলেন তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ; আর আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিও আশ্চর্য! আপনি হয়তো আকাশের শূন্যতার ভিতর থেকেও আসামী আবিষ্কার করতে পারেন।'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'না, অতটা পারি না! আমার ডানা নেই, আকাশের খবর রাখব কেমন করে?'

—'কিন্তু জয়ন্তবাবু, তবে মানিকচাঁদ কেন বলেছে যে প্রতাপ চৌধুরী এই বাড়ি বিক্রি করে স্থানান্তরে গিয়েছে?'

—'মানিকচাঁদ হচ্ছে প্রতাপের প্রধান সাকরেদ, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। প্রতাপ নিজে আড়ালে থেকে সুতো টেনে মানিকচাঁদের দলকে পুত্‌লোবাজির পুতুলের মত অভিনয় করাতে চায়। যদি দৈবগতিকে প্রতাপের সব ওস্তাদী ভেস্তে যায়, তা হলে ধরা পড়বে মানিকচাঁদ অ্যাণ্ড কোম্পানি, কিন্তু সে নিজে থাকবে একেবারে নিরাপদ ব্যবধানে!'

হঠাৎ সুন্দরবাবুর বিপুল ভুঁড়ি উঠল চমকে এবং তাঁর চক্ষে জাগল ত্রস্ততা। তিনি তাড়াতাড়ি জয়ন্তের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার কানে কানে বললেন, 'জয়ন্ত, দেখ, দেখ!'

জয়ন্ত সহজভাবেই বললে, 'দেখেছি সুন্দরবাবু! এই শত্রুপুরীতে এসে আমার চোখ ঘুরছে চতুর্দিকেই। দারোগাবাবু, খানিক তফাতেই একটা ঝোপ কি রকম দুলছে দেখুন। বড়ই সন্দেহজনক। বাতাসের জোর নেই, ঝোপ কেন দোলে?'

দারোগাবাবু সেই দিকে তাকালেন, ঝোপটা দুলতে দুলতে আবার স্থির হয়ে এল। বললেন, 'মনে হচ্ছে, ঐ ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে কেউ যেন আমাদের লক্ষ করছে!'

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, 'আমারও সেই সন্দেহ হচ্ছে।'

—'এখন কি করা উচিত?'

—'দারোগাবাবু, আপনারা হচ্ছেন সরকারের দুলাল, আইন আপনাদের হাত-ধরা। আমারও কাছে রিভলবার আছে বটে, কিন্তু সহসা গুলিবৃষ্টি করলে হয়তো সরকারের আইন এই শখের গোয়েন্দাকে ক্ষমা করবে না। আপনার উচিত ঐ সন্দেহজনক ঝোপটাকে লক্ষ করে গুলি চালানো। তারপর নরহত্যা হলেও একটা ওজর দেখিয়ে

আপনি হয় তো আইনের নাগপাশকে ফাঁকি দিতে পারবেন অনায়াসেই !'

দারোগাবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয় মশাই ! আর কি সে দিন আছে ? এখন একটু এদিক-ওদিক হলেই সারা দেশ জুড়ে খবরের কাগজওয়ালারা শেয়ালের মত এক-স্বরে কি রকম 'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' করে চ্যাঁচাতে থাকে, তা কি আপনি জানেন না ?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'সব জানি । কিন্তু এটা কি আপনি বুঝছেন না, ঐ ঝোপের আড়ালে যে আছে সে হয় তো এখন নিস্পন্দ হয়ে আমাদেরই পানে বন্দুক তুলে লক্ষ স্থির করছে ?'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে পায়ে পায়ে পিছিয়ে আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করলেন । যতদূর সম্ভব চুপি চুপি বললেন, 'পালিয়ে এস জয়ন্ত, তুমিও পালিয়ে এস !

দারোগাবাবু ম্রিয়মাণের মত বাধো-বাধো গলায় বললেন, 'তাহলে রিভলবার ছুঁড়ব না কি ?'

জয়ন্ত বললে, নিশ্চয় ! আপনি বাঁচলে বাপের নাম, জানেন না ?'

সেই বিশেষ ঝোপটির দিকে লক্ষ করে দারোগাবাবু রিভলবার তুলে ঘোড়া টিপে দিলেন।

রিভলবার গর্জন করতেই ঝোপের ভিতর থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল মানুষ নয়, একটা শূকর ! পরমুহূর্তেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সে আর একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে চোখের আড়ালে সরে পড়ল।

জয়ন্ত সকৌতুকে হাসতে হাসতে বললে, 'মাভৈঃ, মাভৈঃ ! শূওরটা যখন ঐ ঝোপের ভেতর ঢোকে তখনি তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আমি জানতুম, ওখানে মানুষ-জাতীয় কোন শত্রুই নেই।'

দারোগাবাবু খাপের ভিতর রিভলবার পুরতে পুরতে অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'তাহলে আমাদের মিছে ভয় দেখাবার জন্যে আপনি এতক্ষণ মশ্‌করা করছিলেন ?'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হুম্‌। জয়ন্তও মানিকে দলে ভিড়ল ? আমাদের নিয়ে তামাশা ? নাঃ, এ অসহনীয় !'

জয়ন্ত আরো জোরে হেসে উঠে বললে, 'মানিক যে আজ আমার

সঙ্গে নেই সুন্দরবাবু! তাই আমি তারই অভাব পূরণের জন্যে মানিকের ভূমিকায় অভিনয় করবার চেষ্টা করছি! কিন্তু যাক্ সে কথা। এখানে আর দেরি করে লাভ নেই। প্রতাপ চৌধুরী আর তার দলবল আজ বোধ করি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে না। চলুন, আমরাও যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান করি। ···হ্যাঁ, ভালো কথা। দারোগাবাবু, সুড়ঙ্গের দুই মুখ যেমন ছিল, ঠিক সেইভাবেই বন্ধ করে যেতে ভুলবেন না যেন।'

—'কেন?'

—'শত্রুরা যেন সন্দেহ করতে না পারে যে, আমরা তাদের সব গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।'

—'আপনি কি মনে করেন নরহত্যার পরেও তারা আবার এখানে আসতে সাহস করবে?'

—'না করাই তো উচিত। তবু সাবধানের মার নেই।'

রাস্তায় বেরিয়ে জয়ন্ত বললে, 'দেখুন সুন্দরবাবু, ঐ প্রতাপ চৌধুরীর কথা ভুলে গিয়ে আমাদের এখন কাজ করতে হবে ভূষো-পাগলাকে নিয়ে।'

দারোগাবাবু বললেন, বিলক্ষণ! এত বড় একটা খুনের মামলা ভুলে যাব? যা তা খুন নয়, পুলিস খুন!'

জয়ন্ত বললে, 'খুনের মামলা নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে হবে আপনাকেই। কোন খুনের মামলা তদারক করবার জন্যে আমরা এ গ্রামে আসিনি।'

দারোগাবাবু বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'তাহলে আপনারা আমাকে আর সাহায্য করবেন না?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'নিশ্চয়ই করব। আগে আমার সব কথা শুনুন। আমরা এখানে এসেছি সুব্রতবাবুর অনুরোধে। তিনি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন এক রহস্যময় মামলা। তার কথা এখানে বলবার দরকার নেই, তবে এইটুকু জেনে রাখুন, তার সঙ্গেও জড়িত

আছে ঐ প্রতাপ চৌধুরী। সুতরাং আসলে প্রতাপ চৌধুরীকে আমরা ছাড়ব না, আর সেও বোধ হয় আমাদের ছাড়বে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি ভূষো-পাগলার কথা কি বলছিলে জয়ন্ত ?'

—'এইবারে ভূষো-পাগলাকেই আমাদের দরকার।'

—'একটা বাজে পাগলার জন্যে হঠাৎ তোমার টনক নড়ল কেন ?'

—'এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

—'কি ?'

—'ভূষো-পাগলা বরাবরই সোনার আনারসের ছড়া চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে করতে এখানকার হাটে-ঘাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। এত দিন কেউ তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি। কিন্তু প্রতাপ চৌধুরী আজ হঠাৎ তাকে বন্দী করতে চায় কেন ?'

সুন্দরবাবু কোন জবাব না দিয়ে কেবল মাথার টাক চুলকোতে লাগলেন।

জয়ন্ত বললে, 'কেন, তা বুঝতে পারছেন না ? প্রতাপের সন্দেহ হয়েছে যে, ভূষো সোনার আনারসের গুপ্তকথা কিছু কিছু জানে।'

—'প্রতাপ তো এখানকারই লোক। এত দিন তার এ সন্দেহ হয়নি কেন ?'

—'এতদিন সে সোনার আনারস নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টাও করেনি। এ-সম্বন্ধে সে হঠাৎ সজাগ হয়েই আগে দিয়েছে সুব্রত-বাবুর উপরে হানা। তারপরেই তার দৃষ্টি পড়েছে ভূষো-পাগলার উপরে। বুঝেছেন ?'

—'হুম্। জয়ন্ত তোমার অনুমানই সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে।'

—'তাই আমাদেরও ঐ ভূষো-পাগলাকে ছাড়লে চলবে না। তার সঙ্গে কথা কয়ে আমার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, সোনার আনারসের অনেক গুপ্তকথাই সে জানে। সৌভাগ্যক্রমে সে আছে এখন আমাদেরই হাতে। তার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে দেখা যাক, আমার সন্দেহ সত্য কিনা।'

বাসায় ফিরে এসে দেখা গেল, মানিক বিছানার উপরে বসে সুব্রতর সঙ্গে গল্প করছে।

জয়ন্ত বললে, 'কি হে মানিক, এখন কেমন আছ?'

মানিক মুখ ভার করে বললে, 'যাও, যাও!'

জয়ন্ত হেসে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে অভিমান হয়েছে? তোমার শরীরের অবস্থা দেখেই নিয়ে যাইনি ভাই, আমার উপর অবিচার করো না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! তুমি সঙ্গে ছিলে না, বেঁচেছিলুম। অন্তত খানিকক্ষণ তোমার বাক্য-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলুম।'

মানিক ফিক্ করে হেসে ফেলে বললে, 'তাহলে বাক্য-যন্ত্রণা আবার শুরু হবে না কি?'

জয়ন্ত বললে, 'না মানিক, আজকের মত সুন্দরবাবুকে ক্ষমা কর! সুব্রতবাবু, ভূষো-পাগলা কেমন আছে?'

মানিক বললে, 'নিশ্চয়ই ভালো আছে। এই তো পাঁচ মিনিট আগেও সে চিৎকার করে সোনার আনারসের ছড়া আউড়ে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিল।'

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'সুব্রতবাবু, দয়া করে ভূষোকে একবার এখানে নিয়ে আস্‌তে পারবেন কি?'

'যাচ্ছি' বলে সুব্রত ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে সুব্রত ফিরে এসে বললে, 'ভূষোকে দেখতে পেলুম না।'

জয়ন্ত চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'মানে ?'

—'ভূষো ঘরেও নেই, এই বাড়ির ভিতরেও কোথাও নেই। কেবল তার ঘরের দেওয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'সোনার আনারস! সোনার আনারস! আমি চললুম সেই সোনার আনারসের সন্ধানে!'

অষ্টম

জলগ টিকটিকি

গভীর রাত্রে জয়ন্ত হঠাৎ ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে মানিকের।

মানিক ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে বললে, 'ব্যাপার কি জয়? আবার কোন বিপদ ঘটল না কি?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'বিপদ নয় মানিক, বিপদ নয়। শোনো—'

শোনা গেল, খানিক দূর থেকে কে আবৃত্তি করছে—

'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোট্‌কা জট।'

মানিক বললে, 'ঐ তো পলাতক ভূষো-পাগলার গলা।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, ভূষো যে এখানকার মাটি ছেড়ে নড়তে পারবে না, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলুম। মানিক, তোমার শরীর এখন সুস্থ হয়েছে?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু এ-কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

—'খুব সম্ভব ভূষো বাগানের পুকুর-পাড়েই আছে। আমি চুপি চুপি গিয়ে দেখতে চাই সেখানে সে কি করছে। তুমিও কি আমার সঙ্গে আসবে?'

এক লাফে নিচে নেমে মানিক বললে, 'সে কথা আবার বলতে।'

তাড়াতাড়ি জামা পরে দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

আকাশে একাদশীর চাঁদ। রাত্রেও মানুষের দৃষ্টি অচল নয়।

জয়ন্তের অনুমান সত্য। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল একটা মানুষের মূর্তি। নিশ্চয়ই ভূষো-পাগলা।

মিনিট-কয়েক সে নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বটগাছের পশ্চিম দিক ধরে হন্‌হন্ করে এগিয়ে যেতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'আজ আর ভূষোর সঙ্গ ছাড়া হবে না। ও কোথায় যায়, দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

—'কেন বল দেখি?'

—'আমি ভূষোকে সাধারণ পাগল বলে মনে করি না। আমার বিশ্বাস, ও অকারণে পাগলামির ঝোঁকে ওদিকে যাচ্ছে না, ওর ঐ পথ-চলার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।'

—'জয়ন্ত, তোমার এই সন্দেহের কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। খানিকক্ষণ কেটে গেল।

মানিক বললে, 'আমরা বোধহয় আধ ঘণ্টা ধরে পথ চলছি। এইভাবেই আজকের রাতটা পুইয়ে যাবে না কি?'

জয়ন্ত বললে, 'যেতে পারে। মানিক একটা বিষয় লক্ষ করেছ?

—'কি?'

—'ভূষো মাঠ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু একবারও বাঁয়ে কি ডাইনে ফিরছে না, সুব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে অগ্রসর হয়েছে একেবারে সোজাসুজি।'

—'তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয়?'

—'একটু পরেই বুঝতে পারব।'

আরো খানিকক্ষণ গেল। মানিক বললে, 'ক্ষ্যাপার পাল্লায় পড়ে আমরাও ক্ষেপে গেলুম নাকি?'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'না মানিক, না। ঐ দেখ, ভূষো দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা আজ এক ক্রোশ পথ পার হয়েছি।'

—'এতটা নিশ্চিত হলে কেমন করে?'

—'কারণ ভূষো-পাগলা এইখানে এসে থেমেছে।'

—'এ কি রকম হেঁয়ালি ?'

—'হেঁয়ালি নয় হে, হেঁয়ালি নয়! হেঁয়ালির ভিতরে আমি পেয়েছি অর্থের সন্ধান! দেখ, দেখ, ভূষোর রকম দেখ!'

ভূষো এইবারে সত্য-সত্যই পাগলের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল—পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে!

মানিক একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে সবিস্ময়ে বললে, 'ভূষোর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন কি খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না!'

—'কিন্তু কি খুঁজছে ?'

—'ভগবান জানেন। হয়তো পাগলটা ভেবেছিল এখানেই ফলে সোনার আনারস!'

—'আমিও তো ঐ রকমই একটা অসম্ভব আশা করেছিলুম।'

—'যাও, যাও, বাজে বোকো না!'

—'বাজে নয়, সত্যি বলছি। আমার দৃঢ় ধারণা, সুব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভূষো প্রায়ই এই পর্যন্ত আসে। কিন্তু যা পাবার আশায় এত দূর আসে, তা আর খুঁজে পায় না। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর!' কিন্তু কোথায় পরশ পাথর ? সেই দুঃখেই বোধ হয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!'

মানিক একটু ভেবে বললে, 'কিন্তু কথা হচ্ছে, ভূষো এতখানি পথ পার হয়ে ঠিক এইখানেই বা এসে থামল কেন ?'

মানিকের পিঠ চাপড়ে জয়ন্ত বললে, 'ঠিকই বলেছ। তোমার এই প্রশ্ন হচ্ছে একটা প্রশ্নের মত প্রশ্ন। এবারে ঐ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।'

—'কার কাছে উত্তর খুঁজবে ? ভূষোকে কিছু জিজ্ঞাসা করা মিছে, কারণ নিজেই সে কোন উত্তর খুঁজে পায়নি।'

—'ভায়া, উত্তর খুঁজব আমার নিজের মনের ভিতরেই। ভূষোর মুখ চেয়ে তো আমরা এখানে আসিনি।'

হঠাৎ ছুটোছুটি থামিয়ে ভূষো দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে আউড়ে গেল—

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
স্যিয্যি-মামার ঝিক্‌মিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলগ টিক্‌টিকি।—

হায় রে হায়, সব গুলিয়ে গেল, সব গুলিয়ে গেল। ওরে বাবা জলগ টিক্‌টিকি, কোথায় আছিস তুই, কে তোকে তাড়িয়ে দিলে বাপধন?'

ঠিক সেই সময়ে কাছের একটা ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল আর এক মনুষ্য-মূর্তি। সে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পিছন থেকে ভূষোর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'প্রশান্ত চৌধুরীর চর এখনো ভূষোর পিছনে লেগে আছে? নিশ্চয়ই ওকে আবার ধরে নিয়ে যেতে চায়। চল মানিক, আমরাই ওকে গ্রেপ্তার করি!'

জয়ন্ত ও মানিক গাছের আড়াল ছেড়ে বেগে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু লোকটা যেমন সাবধানী, তেমনি চটপটে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাদের দেখে ফেললে। পর-মুহূর্তেই সে একটা জঙ্গলের দিকে দৌড় মারলে তীরের মত!

তার পা লক্ষ করে জয়ন্ত ছুঁড়লে রিভলবার। কিন্তু রাত্রের ঝাপসা আলোয় লক্ষভেদ করতে পারলে না। লোকটা জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হল।

জয়ন্ত ও মানিক জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু পলাতকের কোন পাত্তাই মিলল না। দেখলে খালি চাঁদের আলোর ফিতে দিয়ে গাঁথা অন্ধকারকে।

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে ভূষো-পাগলাকেও দেখতে পেলে না।

মানিক বললে, 'পাগলা ভয় পেয়ে আবার পালিয়েছে। এখন কি করবে?'

—'অতঃপর ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরব। তারপর ঘুমিয়ে পড়ব। তারপর সকালে উঠে সুব্রতবাবুকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তারপর সদলবলে আবার এখানে আগমন করব।'

—'আবার এখানে আসবে?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়!'

—'কেন?'

—'জলগ টিক্‌টিকি প্রভৃতি আরো অনেক কিছুর সন্ধানে।'

—'ভুষোর সঙ্গে তুমিও টিক্‌টিকি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাও না কি?'

—'মাথা না ঘামিয়ে উপায় নেই !'

—'বুঝেছি জয় ! তুমি একটা কোন হদিস পেয়েছ।'

—'রহস্যের সিংহদ্বার খোলবার জন্যে একটা চাবিকাঠি কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু অনেক কালের পুরানো মরচে-পড়া চাবি, এখনো কুলুপে ভালো করে লাগছে না। অপূর্ব এই সোনার আনারসের ছড়া ! এর প্রত্যেক কথাটির অর্থ যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবিতারও চেয়ে গভীর ! কিন্তু জেনে রেখো, এ মামলার কিনারা হতে দেরি নেই।'

নবম

মরা নদীর শুকনো খাত

প্রভাত। জানলার বাইরে তুলছে নতুন রোদের স্বচ্ছ সোনার আঁচল এবং তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সবুজের দোলনায় তুলতুলে ফলশিশুদের হাসি-রঙীন মিষ্ট মুখগুলি।

প্রভাতী চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়েই জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা সুব্রতবাবু, এদেশে কখনো বাঘরাজা বলে কেউ ছিলেন কি?'

সুব্রত বললে, 'বাঘরাজা······বাঘরাজা? হ্যাঁ, বাবার মুখে শুনেছি, অনেক কাল আগে এ-অঞ্চলে এক প্রতাপশালী রাজবংশ ছিল, তাদের উপাধি 'বাঘ'।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! বাঘ আবার মানুষের উপাধি হয় না কি?'

জয়ন্ত বললে, 'হয় সুন্দরবাবু, হয়। আমার পরিচিতদের মধ্যেই 'বাঘ' উপাধিধারী লোক আছেন। হয়তো তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ একাই কোন ব্যাঘ্র বধ করেছিলেন, আর তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে লোকে তাঁকে দিয়েছিল ঐ উপাধি। পরে তাঁর বংশধররাও ঐ 'বাঘ' বলেই পরিচিত হয়। কেবল 'বাঘ' নয়, বাংলাদেশে 'হাতী' উপাধিধারী লোকও আছে। কিন্তু যাক্ ও-কথা। সুব্রতবাবু, আপনার কথায় আমার কৌতূহল প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। আপনি ঐ বাঘরাজাদের সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারেন কি?'

সুব্রত বললে, 'আমি বিশেষ কিছুই জানি না, আর আমার পক্ষে জানবার কথাও নয়। কারণ বাঘরাজাদের বংশ না কি পলাশীর যুদ্ধের আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে শুনেছি, আমার

প্রপিতামহেরও আগে আমাদেরই কোন পূর্বপুরুষ কোন্ এক বাঘ-রাজার দেওয়ানের পদ লাভ করেছিলেন।'

—'বাঘরাজাদের কোন চিহ্নই কি এ-অঞ্চলে বর্তমান নেই?'

—'কিছু না। আমার পিতামহ বলতেন, যেখানে বাঘরাজাদের রাজধানী ছিল, এখন সেখানে বিরাজ করছে নিবিড় জঙ্গল।'

—'সে জায়গাটা কোথায়?'

—'তাও আমি জানি না।'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা সুব্রতবাবু, আপনাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে কোন নদী-টদী আছে কি?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আমি এই রকম একটি নদী খুঁজছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।'

সুব্রত একটু বিস্মিত স্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনার প্রত্যেক প্রশ্নই কেমন রহস্যময়। হঠাৎ নদীর কথা কেন আপনার মনে উঠল?'

—'সে-কথা পরে বলব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

—'না, আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে কোন নদী নেই।'

জয়ন্ত হতাশভাবে বললে, 'নেই! তাহলে কি আমি মিছাই এত জল্পনা-কল্পনা করে মরলুম? সোনার আনারসের ছড়াটা কি একেবারেই বাজে?'

সুব্রত প্রায় আধ মিনিট ধরে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল বিস্ময়চকিত চোখে। তারপর থেমে থেমে বললে, 'সোনার আনারসের ছড়া? তার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক কি?'

—'সম্পর্ক একটা আছে বলেই অনুমান করেছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি আমার অনুমান সত্য নয়।'

সুব্রত বললে, 'দেখুন জয়ন্তবাবু, আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে আগে একটা নদী ছিল বটে।'

জয়ন্ত অত্যন্ত উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ছিল না কি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ-অঞ্চলে আগে একটা নদী ছিল, কিন্তু এখন সেটা শুকিয়ে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে দেখা যায় তার শুকনো খাত ?'

—'তারপর, তারপর ?'

—'এখনো বর্ষাকালে সেই খাত কিছুদিনের জন্যে জলে ভরে যায়। কিন্তু সেটা তো গ্রামের পশ্চিমে নয়—এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাইল তিন কি আরো কিছু বেশী পথ পেরিয়ে গেলে তবে সেই খাতটা পাওয়া যায়।'

জয়ন্ত যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললে, 'উত্তর-পশ্চিম দিকে। তাহলে আবার যে আমার হিসাব গুলিয়ে যাচ্ছে!' অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে, 'সুব্রতবাবু, যদিও আমি খেই খুঁজে পাচ্ছি না, তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

—'মানে ?'

—'সেই মরা নদীর শুকনো খাতটা স্বচক্ষে একবার দর্শন করব। এখনি চলুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে ধেৎ! খামখেয়ালের একটা মাত্রা থাকা উচিত। কোন মরা নদীর শুকনো খাত দেখে আমাদের কী ইষ্টলাভ হবে? তার চেয়ে সুব্রতবাবু যদি আরো এক পেয়ালা চা, আরো এক প্লেট চিঁড়ে-আলুভাজা আর বেগুনী-ফুলুরির ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে সেটা হবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।'

জয়ন্ত ফিরে বললে, 'মানিক, তোমারও কি এই মত ?'

মানিক এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে জয়ন্ত ও সুব্রতের কথাবার্তা শ্রবণ করছিল। সে মুখ তুলে বললে, 'ভাই জয়ন্ত, তোমাদের কথা শোনবার পর আমিও গভীর আঁধারে যেন কিঞ্চিৎ আলোর ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি! হুঁ, 'নায়ের পরে যায় কত না, খেলছে জলগ, টিক্‌টিকি!' এটি একটি মূল্যবান সঙ্কেত। কিন্তু 'পশ্চিমাতে পঙ্ক পোয়া, সুয্যি-মামার ঝিক্‌মিকি'—এ লাইনটির কোনই সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি না যে!'

—'আগে তো উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করা যাক্, তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।'

—'উত্তম। আমি প্রস্তুত। সুন্দরবাবু আপাতত চা এবং চিঁড়ে, আলুভাজা এবং বেগুনী-ফুলুরি নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, আমরা ততক্ষণে খানিকটা 'মর্নিং-ওয়াক' করে আসি।'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি যদি এখনি তোমাদের সঙ্গে এই চায়ের আসর ত্যাগ না করি, তাহলে এর পরে মানিকের দুষ্ট জিহ্বা যে কতখানি অসংযত হয়ে উঠবে, তা কি আমি জানি না? হুম্, আমি আর চা-টা খেতে চাই না, আমিও সকলের সঙ্গে যেতে চাই।'

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু এসে হাজির। জয়ন্ত দলে টেনে নিলো তাঁকেও।

দশম

রহস্যের চাবিকাঠি

সুব্রত বললে, 'এই সেই মরা নদীর শুকনো খাত।'

জয়ন্ত বললে, 'সরস্বতী নদীও শুকিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের নানা জায়গায় ঠিক এই রকমই খাত সৃষ্টি করেছে। এই মরা নদীটাও দেখছি আকারে আগে সরস্বতীর মতই ছিল।'

খাতটা চওড়ায় কলকাতার আদিগঙ্গার চেয়ে বড় হবে না। দক্ষিণ থেকে বরাবর উত্তর দিকে চলে গিয়েছে। খাতটা মাঝে মাঝে ভরাট হয়ে আছে এবং তার উপরে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় ঝোপ-ঝাপ ও জঙ্গল।

দক্ষিণ দিকে খাতটা যেখানে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে নীরবে কি ভাবতে লাগল জয়ন্ত। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'মানিক, খাতটা অর্থাৎ নদীটা বোধ হয় দক্ষিণ দিকেও এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা আর দেখা যাচ্ছে না ; কারণ, তা একেবারে ভরাট হয়ে সমতল মাঠের সঙ্গে মিলিয়ে আছে।'

মানিক বললে, 'তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নয়।'

দারোগাবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'একটা খাত নিয়ে এমন গভীর গবেষণার কারণ কি বুঝছি না।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আমারও ঐ মত। আমি বাসায় ফিরে যেতে চাই।'

সুব্রতও বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনার কি উদ্দেশ্য বলুন দেখি ?'

জয়ন্ত কারুর কোন কথার জবাব না দিয়েই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'হয়েছে মানিক, হয়েছে! আমি চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছি!'

দারোগাবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'চাবিকাঠি ? কিসের চাবিকাঠি মশাই ?'

—'রহস্যের।'

—'রহস্য আবার কি ?'

—'যদি জানতে চান, আমার সঙ্গে আসুন। এস মানিক !' জয়ন্ত দ্রুতপদে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

সুন্দরবাবু খানিকটা এগিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ও জয়ন্ত, একটু আস্তে চল ভাই, তোমার সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব কেন—আমার বপুখানি দেখছ তো ?'

জয়ন্ত গতিও কমালে না, উত্তরও দিলে না—সমানে এগিয়ে চলল।

দারোগাবাবু বললেন, 'এ যেন বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে।'

সুব্রত বললে, 'সোনার আনারসের ভিতরে যে ছড়াটা ছিল, জয়ন্তবাবু বোধ হয় তার মানে খুঁজে পেয়েছেন।'

দারোগাবাবু তপ্তস্বরে বললেন, 'ঐ ছড়াটার কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ভূষো হচ্ছে আস্ত পাগল, একটা বাজে ছেলেভুলনো ছড়া নিয়ে তার সঙ্গে মেতে থাকা আমাদের কি শোভা পায় ? ছড়া হচ্ছে ছড়া। তার মধ্যে কোন অর্থই থাকে না।'

সুব্রত বললে, 'আমারও তো ঐ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু জয়ন্তবাবুর বিশ্বাস অন্য রকম।'

—'নিজের বিশ্বাস নিয়ে নিজেই থাকুন, কিন্তু তিনি আমাদের নিয়ে টানাটানি করছেন কেন ? ঘাড়ে পড়েছে খুনের মামলা, এখন তার কিনারা করব, না ছড়ার অর্থ খুঁজে মরব ? আরে ছিঃ, এ যে দস্তুরমত ছেলেমানুষী !'

আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জয়ন্ত বলে, 'মানিক, কাল রাত্রে ভূষো ঠিক এইখানে এসেই চারদিকে ছুটোছুটি করেছিল না ?'

মানিক এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্ত।'

—'পূর্ব-দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখ।'

—'ওদিকে তো দেখছি মাঠের পরে রয়েছে একটা নিবিড় অরণ্য।'

—'সোনার আনারসের জয় হোক। এইবারে আমরা ঐ বনের ভিতরে প্রবেশ করব। পূর্ব-দক্ষিণ দিক ধরেই এগিয়ে চলব—কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়, আমাদের পদ-চালনা করতে হবে স্বাভাবিক ভাবেই। কতক্ষণ অগ্রসর হতে হবে জানো? ঠিক এক প্রহর।'

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললে, 'অর্থাৎ আরো তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের বনে বনে ঘুরতে হবে। ওরে বাবা!'

দারোগাবাবু বললেন, 'আরো তিন ঘণ্টা কি বলছেন মশাই? তিন ঘণ্টা লাগবে তো খালি এগিয়ে যেতেই, ফিরতেও তো লাগবে আরো তিন ঘণ্টা! তার মানে কোদালপুরে ফিরব আমরা রাতের অন্ধকারে!'

—'হুম্, তাই না কি? সারাদিন খালি তবে পথই হাঁটব, দানা-পানি কিছুই জুটবে না?'

—'তা ছাড়া আর কি?'

—'আমি কি পাগল? আমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে? আমি পারবো না—ব্যস, আমার এক কথা।'

জয়ন্ত কোন রকমে হাসি চেপে বললে, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু, আপনাকে উপোস করতে হবে না।'

—'উপোস করতে হবে না কি রকম? নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হোটেল পাওয়া যায় না কি?'

—'সুন্দরবাবু, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। মানিকের কাঁধে ঐ যে ব্যাগটি ঝুলছে, ওর ভেতরে খুঁজলে যৎকিঞ্চিৎ খাবার-টাবারও পাওয়া যেতে পারে।'

প্রবল মস্তক আন্দোলন করে সুন্দরবাবু বললেন, 'ডবল খাবারের লোভেও আমি আর ছয়-সাত ঘণ্টা ধরে হাঁটতে পারব না। এখনি আমার জিভ বেরিয়ে পড়তে চাইছে—হুম্!'

দারোগাবাবু বললে, 'আমিও সুন্দরবাবুর দলে। আমি খুনের

মামলার আসামী খুঁজছি—সোনার আনারসের ছড়া নিয়ে আমার কি লাভ হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'কি লাভ হবে? আপনি কি জানেন, ঐ খুনের মামলার আসামী প্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো আছে এই সোনার আনারসের রহস্য?'

—'কী সেই রহস্য?'

—'যদি জানতে চান, আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের আর অপেক্ষা করা চলবে না। প্রতাপ চৌধুরীও এই রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজছে, কিন্তু আমরা কার্যোদ্ধার করতে চাই তার আগেই। আমার কথায় অবিশ্বাস করবেন না—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ আপনারা দেখতে পাবেন একটা কল্পনাতীত দৃশ্য!'

একাদশ

মানিকের ব্যাগে অশ্বডিম্ব নেই

গহন বন তো গহন বন! অরণ্যের এমন নিবিড়তা কেউ কল্পনা করেনি। এত বুড়ো-বুড়ো গাছ খুব কম বনেই চোখে পড়ে—জন্মেছে তারা কোন্ মান্ধাতার আমলে, তাও আন্দাজ করবার যো নেই। কোথাও কোথাও তারা পরস্পরকে এমন জড়াজড়ি করে আছে এবং তাদের উপর দিকটায় লতাপাতারা এমনভাবে ঘন জাল বুনে রেখেছে যে, দুপুরের রোদও ভিতরে প্রবেশ করবার পথ পায়নি বললেও চলে।

সর্বত্রই ঝোপ-ঝাপ, কাঁটা-জঙ্গল এবং মানুষের মাথা-ছাড়িয়ে-ওঠা আগাছার ভিড়। সেইগুলোকে ঠেলে ঠেলে কোন রকমে পথ করে নিতে হয়। গায়ে পট-পট করে কাঁটা বেঁধে, আশেপাশে ফোঁস ফোঁস করে ভয়াবহ শব্দ শোনা যায়, মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পথিকদের দেহ হয় পপাত ধরণীতলে, কিন্তু তবু নির্বাপিত হল না জয়ন্তের উৎসাহবহ্নি!

সুন্দরবাবু মুখব্যাদান করে বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'দারোগাবাবু, ডানপিটে জয়ন্তটা আজ আমাদের শমন-সদনে প্রেরণ করতে চায় না কি?'

রুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে ফুলতে দারোগাবাবু বললেন, 'জানি না। এমন চূড়ান্ত ক্ষ্যাপামি জীবনে আর কখনো দেখিনি।'

—'হুম্! কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছি?'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা যাচ্ছি পূর্ব-দক্ষিণ দিকে।'

—'তাই না কি? চোখে তো দেখছি খালি ঝোপ-ঝাপ আর অন্ধকার। এর মধ্যে এসে তুমি কি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ফেলনি?'

—'উঁহু!'

—'কেমন করে জানলে?'

হাত তুলে একটা জিনিস দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, 'এই আমাদের পথ-প্রদর্শক।'

—'কি ওটা হে? ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না।'

—'কম্পাস।'

—'কিন্তু পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে এগিয়ে তুমি কি পরমার্থ লাভ করবে?'

—'শুনলে বিশ্বাস করবেন না।'

—'বিশ্বাস করব না কি রকম?'

—'উঁহু, বিশ্বাস করবেন না।'

—'আলবৎ করব, হাজার বার করব। তোমার ল্যাজ ধরতে যখন বাধ্য হয়েছি, তখন সোনার পাথরবাটি দেখেও আমার আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই।'

—'সোনার পাথরবাটি তো একটা অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য। এ হচ্ছে তারও চেয়ে অবিশ্বাস্য।'

—'ও বাবা, তাই না কি? শুনেই যে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে!'

—'তা যাবেই তো!'

—'অত প্যাঁচ কষছ কেন ভায়া? আসল ব্যাপারটা খুলেই বল না!'

—'শুনবেন তাহলে?'

—'শুনব বলে তো উভয় কান খাড়া করে আছি। স্পষ্ট করে বল, পথের শেষে গিয়ে তুমি কি দেখতে চাও?'

—'একটি প্রকাণ্ড অখণ্ডমণ্ডলাকার, দুগ্ধফেননিভ অশ্বডিম্ব।'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ অতি গম্ভীরভাবে অগ্রসর হলেন। তারপর আহত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্ত, তুমিও?'

—'মানে?'

—'তুমিও আমার সঙ্গে বাজে ঠাট্টা শুরু করলে মানিকের মত ?'

—'ঠাট্টা নয় সুন্দরবাবু, ঠাট্টা নয়! পথের শেষে গিয়ে যে কি দেখব, তা নিজেই আমি জানি না। কে জানে, আমার সমস্ত জল্পনা-কল্পনা শেষটা অশ্বডিম্বের মতই অলীক বলে প্রতিপন্ন হবে কি না!'

দারোগাবাবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'চমৎকার জয়ন্তবাবু, চমৎকার! তাহলে আপনি আমাদের এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাতে চান কেবল কাদা ঘেঁটে ফিরে আসবার জন্যে ?'

জয়ন্ত ঠোঁট টিপে একটুখানি হাসলে, কোন জবাব দেওয়ার দরকার মনে করলে না।

দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে ডাকলেন, 'সুন্দরবাবু!'

—'হুম্, হুম্! বড্ড রেগেছেন দেখছি।'

—হ্যাঁ, তাই।'

—'কিন্তু—'

—'এখন আর কিন্তু-টিন্তু নেই।'

—'তবে ?'

—'আপনি আর আমি দুজনেই পুলিসের লোক।'

—'বলা বাহুল্য।'

—'আমরা হচ্ছি কাজের মানুষ!'

—'অত্যন্ত!'

—'আমরা কি পাগলের মত, গাধার মত, অন্ধের মত অশ্বডিম্বের পিছনে ছুটতে পারি ?'

—'হুম্, হুম্, কিছুতেই না!'

মানিক এইবারে মুখ খুললে। বললে, 'এ কথা আপনি কি করে জানলেন দারোগাবাবু ?'

—'কি কথা ?'

—'গাধারা আর পাগলরা আর অন্ধেরা অশ্বডিম্বের পশ্চাতে ধাবমান হয় ?'

—'মানিকবাবু, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। সুন্দরবাবু !'

—'উঁ।'

—'আমাদের এখন কি করা উচিত জানেন ?'

—'মোটেই জানি না।'

—'আমাদের এখন উচিত, এইখানে থেকেই ধুলো-পায়ে বিদায় নেওয়া।'

—'অর্থাৎ আবার কোদালপুরে ফিরে যাওয়া ?'

—'ঠিক !'

দারোগাবাবুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সুন্দরবাবু করলেন একবার জয়ন্তের এবং আর একবার মানিকের মুখের উপরে দৃষ্টিপাত। তারপর মাথা নেড়ে করুণ সুরে বললে, 'হুম্, অসম্ভব !'

—'কি অসম্ভব ?'

—'এখন কোদালপুরে ফিরে যাওয়া।'

—'কেন ?'

—'জয়ন্তের পাগলামি আর মানিকের দুষ্ট রসনাকে আমি সমর্থন করি না বটে, কিন্তু বোধ হয় ওদের আমি কিছু কিছু—ওর নাম কি—ভালোবাসি। আমার পক্ষে ওদের ছেড়ে চলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। নিতান্তই যদি যেতে চান, তাহলে আপনাকে যেতে হবে একলাই।'

দারোগাবাবুর দুই চক্ষে ফুটল তীব্র ভাব। কিন্তু তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে অগ্রসর হতে লাগলেন সকলের পিছনে পিছনে। বোধ করি তিনি বুঝতে পারলেন যে, একলা এই বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে পথ হারাবার সম্ভাবনাই হবে বেশী।

জয়ন্ত নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমরা প্রায় পথের শেষে এসে পড়েছি—আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যেতে পারে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শুনলেন তো দারোগাবাবু! এতক্ষণ ধরে এত যমযন্ত্রণা যখন ভোগ করলুম, তখন আর মিনিট পনেরোর জন্যে অশান্তি সৃষ্টি করে লাভ কি? বিশেষ, উদরে হয়েছে এখন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার উদয়—আর খোরাক আছে ঐ মানিকেরই ব্যাগের জঠরে! আমরা এখান থেকে এখনি বিদায় নিতে চাইলে মানিক কি আর ব্যাগ খুলতে রাজী হবে?'

জোর মাথা নাড়া দিয়ে মানিক বললে, 'নিশ্চয়ই নয়!'

—'ওরে বাবা, ব্যস! এর ওপরে আর কোন কথা বলাই বাতুলতা! হাতের খোরাক পায়ে ঠেলে উপোস করে ধুঁকতে ধুঁকতে আমি যাব কোদালপুরে ফিরে? হুম্, হুম্, হুম্! অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব! অন্তত মানিকের ব্যাগের ভিতরে যে অশ্বডিম্ব নেই, সেটা আমি রীতিমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি!'

দারোগাবাবু নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তাঁর অবস্থা দেখলে মনে হয় একেবারে যাকে বলে—নাচার আর কি!

তারপর খানিকক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হল না। অরণ্যের অবস্থা তখনও একই রকম—আধা আলো আঁধার-মাখা রহস্যময় আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অগণ্য বনস্পতি মর্মর-ভাষায় রচনা করছে কোন অজানার পূজার মন্ত্র।

মানিক দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'পায়ের তলায় মাটি এখানে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে কেন?'

জয়ন্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'মানিক, মাটি এদিকে ঢালু হয়ে নেমে, ওদিকে আবার উঁচু হয়ে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। আগে নিশ্চয়ই এখানে একটা জলভরা খাত ছিল।'

সেই শুকনো খাতের অন্য পাড়ের উপরে রয়েছে একটা জঙ্গলময়

উঁচু টিপি,—যেন একটা ছোটখাটো পাহাড়। টিপিটা দখল করে আছে অনেকখানি জায়গা।

টিপির উপরে উঠে দেখা গেল তার চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়ে আছে রাশি রাশি সেকেলে ইট। আর একটা দৃশ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ওপাশে টিপিটা যেখানে নিচের দিকে নেমে শেষ হয়ে গিয়েছে, ঠিক সেইখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানা অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ! একেবারে ধ্বংসস্তূপ বললে ঠিক বলা হয় না, কারণ সর্বাঙ্গে ছোট-বড় অশথ-বট-নিম গাছের ভার বহন করে অট্টালিকার একটা অংশ এখনো দাঁড়িয়েছিল মহাকালের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদের মত।

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমার কল্পনা দেবী মিথ্যে কথা বলেননি। এই আমাদের পথের শেষ।'

সুন্দরবাবু উৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'সমাপ্তিটা আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'আরে মশাই, আমরা কোথায় এসেছি বুঝতে পারছেন না? সুব্রতবাবু, সারা পথটাই আপনি বোবার মতন কাটিয়ে দিয়েছেন। এইবারে মুখ খুলুন। বলুন দেখি, কোথায় এসেছি আমরা?'

—'আমি কেমন করে বলব?'

—'তাহলে শুনুন। এই যে চারিদিকে খাত-ঘেরা উঁচু টিপিটা দেখছেন, এটা হচ্ছে কোন পুরাতন দুর্গের শেষচিহ্ন। আর ঐ ভাঙাচোরা অট্টালিকা হচ্ছে সেকালকার কোন রাজার বাড়ি! খুব সম্ভব ঐখানেই বাস করতেন সেই বাঘ-রাজারা, যাঁদের সম্বন্ধে সোনার আনারসের ছড়ায় বলা হয়েছে

'বাঘ-রাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।'

বুঝলেন?'

সুব্রত বললে, 'আপনি কেমন করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন, এখনো তা বুঝতে পারছি না।'

—'যথাসময়ে তা বলব। এতক্ষণ পর্যন্ত ছড়া আমাদের ঠিক পথেই নিয়ে এসেছে। এইবারে দেখতে হবে ছড়ার শেষ দুই পংক্তির অর্থ আবিষ্কার করা যায় কি না। সুব্রতবাবু, অতঃপর হতভম্ব ভাবটা ত্যাগ করে আপনি কিঞ্চিৎ জাগ্রত হবার চেষ্টা করুন!'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'হয়তো আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হেঁয়ালি ছেড়ে সাদা ভাষায় কথা কও জয়ন্ত! তুমি কি করতে চাও?'

—'ঐ ভাঙা অট্টালিকার ভিতরে ঢুকতে চাই।'

—'কারণ?'

—'কারণ ছড়ার রচয়িতার হুকুম?'

দারোগাবাবু একটা শ্রান্ত, বিরক্তিজনক মুখভঙ্গি করলেন নির্বাক ভাবে।

দ্বাদশ

অন্দর-মহালের কুপঘর

অট্টালিকার এ-অংশটাকে বাইরে থেকে যতটা ভাঙাচোরা বলে মনে হচ্ছিল, ভিতরে এসে দেখা গেল তার দুর্দশা হয়নি ততটা।

মস্ত একটা উঠান—তার সর্বত্র আগাছার রাজত্ব। উঠানের চারি-দিকেই চকমিলান ঘর। কোন কোন ঘরের ছাদ বা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে এবং কোন কোন ঘরের দরজা বা জানলা নেই বটে, কিন্তু কয়েকটা ঘর এখনো অটুট অবস্থাতেই বিদ্যমান আছে।

এ-ঘর সে-ঘরের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে জয়ন্ত বললে, 'মনে হচ্ছে এ-অংশে ছিল রাজবাড়ির অন্দর-মহল। মানিক, এখানকার ভিত আর দরজা-জানলার স্থূলতা দেখ। এ-অংশটাকে বোধ হয় সুদৃঢ় আর সুরক্ষিত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল।'

মানিক বললে, 'হয়তো সেই জন্যেই রাজবাড়ির এদিকটা এখনো ভেঙে পড়েনি।'

—'খুব সম্ভব তাই।'

তখনো ভালো করে সন্ধ্যা নামেনি বটে, কিন্তু বাড়ির উঠানে হয়েছে আবছায়ার সঞ্চার। এবং নিচেকার ঘরগুলোর ভিতরে ঢুকলে চোখ হয়ে যায় প্রায় অন্ধ।

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের সঙ্গে একটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। মানিক, সেটা জ্বেলে ফেল তো, ওদিকের ঘরগুলো এখনো পরীক্ষা করা হয়নি।'

সুন্দরবাবু নীরস কণ্ঠে বললেন, 'সন্ধে না হতেই বাড়িখানাকে হানা-বাড়ি বলে সন্দেহ হচ্ছে। এখানে এত পরীক্ষা-টরীক্ষার দরকার কি আছে বাপু? এখানে দেখবার কি আছে?'

—'বলেছি তো আমি এখানে এসেছি অশ্বডিম্বের সন্ধানে। যতক্ষণ না তা পাই, খুঁজতে হবে বৈ কি!' জয়ন্ত বললে গম্ভীর কণ্ঠে।

মানিক আলো জ্বালতে জ্বালতে ততোধিক গম্ভীর স্বরে বললে, 'অশ্বডিম্বের ওমলেট অতিশয় সুস্বাদু। সুন্দরবাবু যদি ভক্ষণ করতে রাজী হন, আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করতে পারি।'

হাঁ কিংবা না, কিছুই বললেন না সুন্দরবাবু, কেবল মানিকের দিকে নিক্ষেপ করলেন একটি জ্বলন্ত ক্রোধকটাক্ষ। বোধ করি এই রকম কোন কটাক্ষেরই দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেব একদা ভস্ম করে ফেলেছিলেন মদন ঠাকুরকে। ভাগ্যে সুন্দরবাবু মহাদেব নন, এ-যাত্রায় তাই বেঁচে গেল মানিক।

পেট্রলের প্রদীপ্ত লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে জয়ন্ত একটা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে, 'মানিক!'

—'কি?'

—'ঘরের মাঝখানে কি রয়েছে দেখছ?'

—'হ্যাঁ। একটা বড় কূপ।'

—'কিন্তু ঘরের ভিতরে কূপ!'

—'তোমার মতে এদিকটা হচ্ছে রাজবাড়ির অন্দরমহল?'

—'হ্যাঁ।'

—'হয়তো এই ঘরটা ছিল রাজবাড়ির মেয়েদের স্নানাগার। সেকালে তো কলের জল ছিল না, তাই অন্তঃপুরের জন্যে এই কূপ খনন করা হয়েছিল।'

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মত বললে, 'মানিক, তোমার অনুমান অসঙ্গত নয়। কিন্তু—কিন্তু—' বলতে বলতে থেমে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর সে অগ্রসর হয়ে একটা তীব্র শক্তিসম্পন্ন মস্ত টর্চের আলোক-শিখা নিক্ষেপ করলে কূপের মধ্যে।

রীতিমত গভীর কূপ। জল চকচক করে উঠল তার অনেক নিচে।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে। তারপর হঠাৎ ফিরে বললে, 'মানিক, বার কর একগাছা লম্বা আর মোটা দড়ি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! দড়ি নিয়ে কি হবে শুনি?'

—'দড়ি অবলম্বন করে আমি এই কূপের ভিতরে গিয়ে নামব।'

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'বাপ রে, কেন?'

—'হয়তো ঐখানেই পাব অশ্বডিম্বের সন্ধান!'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু রসগোল্লার মতন করে তুলে বললেন, 'জয়ন্ত! ভাই জয়ন্ত! মিনতি করি, ক্ষান্ত হও! ছড়ার কথা তুমি সত্যি বলে মানো, অথচ ভুলে যাচ্ছ কেন যে, ছড়ায় লেখা আছে এখানে ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়?'

মানিক বললে, 'পানাই মানে কি জানেন?'

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না। আর জেনেও দরকার নেই আমার। কারণ ব্রহ্মপিশাচ যখন 'পানাই' বাজায়, তখন নিশ্চয়ই সেটা হচ্ছে কোনরকম ভয়ঙ্কর সৃষ্টিছাড়া বাদ্যযন্ত্র—মানুষের পক্ষে যা স্পর্শ করাও অসম্ভব!'

—'মোটেই নয়। 'পানাই' বলতে বোঝায় 'খড়ম্'! ব্রহ্মদৈত্যরা পায়ে খড়ম পরে, জানেন তো? এ হচ্ছে সেই খড়ম।'

—'হুম্! ব্রহ্মদৈত্যের পায়ের খড়ম! আমরা যেমন হাততালি দি, তারা বুঝি তেমনি পা-তালি না দিয়ে পায়ের খড়ম খুলে খটাখট আওয়াজ সৃষ্টি করে? হতে পারে—ব্রহ্মদৈত্যদের পক্ষে অসম্ভব কি বাবা? ভাই জয়ন্ত, দোহাই তোমার! ও পাতকুয়োর ভেতর ঢোকবার চেষ্টা তুমি কোরো না—হুম্!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'সুন্দরবাবু, ও-কথা যাক্। কিন্তু এইবারে আপনিও আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করুন দেখি!'

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'এ রকম ব্যাপারে আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

—'দড়ি বয়ে আমি যখন কূপের ভিতর নামব, তখন আর এক-

গাছা দড়িতে পেট্রলের লণ্ঠনটা বেঁধে ঠিক আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিচে নামিয়ে দিতে হবে। কেমন, এ কাজটা পারবেন তো?'

—'তা কেন পারব না!'

জয়ন্ত দড়ি ধরে কূপের গহ্বরে প্রবেশ করলে। পেট্রলের ঝুলন্ত লণ্ঠনটাও চারিদিক আলোকে সমুজ্জ্বল করে নিচের দিকে নামতে লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে। সেই বহুযুগের পুরাতন ও অব্যবহৃত কূপের জঠরে আচম্বিতে এই অভাবিত আলোক সমারোহে বিস্মিত হয়ে নানা ছিদ্র ও ফাটলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল দলে দলে হিলবিলে বৃশ্চিক ও ঊর্ধ্বপুচ্ছ কাঁকড়া-বিছে প্রভৃতি জীব। এক জায়গায় মুহূর্তের জন্যে মুখ বাড়িয়ে দুটো অগ্নিময় ক্রুদ্ধ চক্ষে তীব্র ঘৃণা বৃষ্টি করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল একটা অন্ধকারেরও চেয়ে কালো সাপ। কোন গর্তের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর চিৎকার!

সুন্দরবাবু চমকে বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা, পাতালের ভিতরে ওটা আবার চ্যাঁচায় কে ?'

সুব্রত বললে, 'তক্ষক।'

কূপের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, এইবারে লণ্ঠনটা আস্তে আস্তে উপরে তুলে নিন।'

জয়ন্ত আবার উপরে এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে পরিতৃপ্ত আনন্দের আভাস।

মানিক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি দেখলে জয়ন্ত ?'

—'আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়।'

—'অর্থাৎ ?'

—'অনেক নীচে, কূপের জল থেকে খানিক উপরে দেওয়ালের গায়ে আছে একটা লোহার দরজা।'

—'লোহার দরজা ?'

—'হ্যাঁ। বন্ধ দরজা। তার বাইরে রয়েছে মস্ত ছুটো কুলুপ।'

সুব্রত অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললে, 'এর অর্থ কি জয়ন্তবাবু ?'

—'আমার বিশ্বাস, ঐ দরজার ও-পাশেই আছে সোনার আনারসের সমস্ত রহস্য !'

—'সোনার আনারসের রহস্য ?'

—'হ্যাঁ সুব্রতবাবু। বাঘ-রাজাদের গুপ্তধন !'

পর-মুহূর্তেই চারিদিকের স্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে বজ্রস্বরে গর্জে উঠল ছু'ছুটো বন্দুক ! ছুটো বুলেট এসে লাগল দেওয়ালের উপরে সশব্দে।

জয়ন্ত বলে উঠল, 'শত্রুরা আসছে আক্রমণ করতে। ঐ দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চল···শিগগির !'

কূপঘরের ভিতর দিয়েই পাশের ঘরে যাবার দরজা। তার একখানা পাল্লা ভাঙা। সে ঘর থেকেও অন্য ঘরে যাবার আর একটা দরজা। তার পাল্লা আছে বটে, কিন্তু অর্গল নেই। তারও ওদিকে আছে দরজা

দিয়ে ও-পাশের ঘরে যাবার পথ—সকলে দ্রুতবেগে সেই তৃতীয় ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

জয়ন্ত ভিতর থেকে দরজার অর্গল তুলে দিলে।

খানিকক্ষণ কারুর মুখেই কথা নেই। শত্রুরা যে পিছনে আসছে, এমন সাড়াও পাওয়া গেল না।

হঠাৎ এ-ঘরের দরজার উপরে খট্‌ করে একটা শব্দ হল। জয়ন্ত তিক্তহাসি হেসে বললে, 'মানিক, আমরা বন্দী হলুম। এ-ঘরের দরজার বাইরে থেকে কে শিকল তুলে দিলে। সোনার আনারসের স্বপ্ন বুঝি ফুরিয়ে যায়!'

ত্রয়োদশ

ঈশ্বর-প্রেরিত দূত

দারোগাবাবু বললেন, 'বেশ জয়ন্তবাবু ! অকারণে এখানে টেনে এনে আপনি খুব বিপদে ফেললেন যা হোক !'

জয়ন্ত বললে, 'আমি নই, আমাদের এই বিপদের জন্যে দায়ী আপনার আসামী প্রতাপ চৌধুরীই ।'

—'কি বলছেন ?'

—'প্রতাপ চৌধুরীর কথা বলছি। আমরা এখন তারই হাতে বন্দী। সুব্রতবাবু, আপনাদের পূর্ব-পুরুষেরা অন্তিমকালে উত্তরাধিকারীদের কি বলে যেতেন ?'

—'বলে যেতেন, 'যদি কোন দিন বিশেষ অর্থাভাব হয় তা'হলে সোনার আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান' ।'

—'সোনার আনারসের মধ্যে একটা ছড়ায় কৌশলে লেখা ছিল ঐ অর্থের ঠিকানা, আজ আমরা যা আবিষ্কার করেছি । প্রতাপ চৌধুরীও এত দিন ধরে সেই ঠিকানাটাই আবিষ্কার করবার চেষ্টায় ছিল। এখানকার যত হাঙ্গামার আসল কারণই হচ্ছে তাই । আজ সে তার দল-বল নিয়ে গোপনে আমাদের অনুসরণ করেছিল,—উত্তেজনার মুখে পড়ে যে-সম্ভাবনার কথা ভুলে গিয়ে আমি বোকামি করেছি !'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, প্রতাপ চৌধুরী বেটা এখন কি করতে চায় ?'

—'নিশ্চয়ই সে আড়াল থেকে আমাদের সব কথা শুনেছে—আমাদের সব কার্যকলাপ লক্ষ করেছে। তাই গুপ্তধনের ঠিকানা জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আক্রমণ করেছিল। এখন আমরা অসহায়-ভাবে বন্দী। সে স্বাধীন। এইবারে সে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের লোহার।

দরজা খোলবার চেষ্টা করবে। হায় রে কপাল, আমাদের নৌকো কিনা ঘাটে এসেও ডুবে গেল!'

মানিক বললে, 'জয়, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কি ও-দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারব না?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না। একেলে দরজা হলে আমার কোনই ভাবনা ছিল না—আমি একলাই পারতুম ভেঙে ফেলতে। কিন্তু এই সেকেলে দরজাটা বিশেষ কারণে বিশেষভাবে তৈরি। মত্ত মাতঙ্গও ভাঙতে পারবে না এ দরজা! নীচেকার এই ঘরটাও অদ্ভুত, একটা জানলা পর্যন্ত নেই—দেওয়ালের অনেক উপরে আছে কেবল গোটা-কয়েক ফোকর, কিন্তু তাদের ভিতর দিয়ে মানুষের মাথাও গলবে না। কে জানে, কি উদ্দেশ্যে এ-রকম ঘর তৈরি করা হয়েছিল! আগে কি এখানে থাকত কয়েদীরা? হতে পারে, আশ্চর্য কি!'

সকলে গুম্ হয়ে বসে রইল বেশ খানিকক্ষণ। কারুরই যেন নেই কথা কইবার ইচ্ছা।

আচম্বিতে বাইরেকার নিস্তব্ধ রাত্রিকে বিদীর্ণ করে জাগ্রত হল বহু কণ্ঠস্বরে আনন্দ-কোলাহল!

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'ও আবার কি?'

জয়ন্ত শ্রান্ত, বিষণ্ণ স্বরে বললে, 'ঐ আনন্দ কোলাহল শুনেই বুঝতে পারছি, আজ প্রতাপ চৌধুরীর হস্তগত হয়েছে বাঘ-রাজাদের গুপ্তধন!'

সুব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

তার একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে মানিক দরদ-ভরা কণ্ঠে বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি।'

জয়ন্ত হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠে বললে, 'ধেৎ! দুঃখের নিকুচি করেছে! মানিক, চটপট বার কর 'ফ্লাস্কে'র চা আর ডিম। দু-একখানা হাতে-তৈরি রুটি আর দু-একটা কদলীও বোধহয় এখনো আমরা প্রত্যেকেই পেতে পারি! প্রতাপ চৌধুরী যখন কদলী-প্রদর্শন করলে, তখন দু-একটা কদলী আমরাই বা ভক্ষণ করব না কেন? আসুন

দারোগাবাবু, আসুন সুব্রতবাবু, আসুন সুন্দরবাবু! এত গোলযোগের পর কিঞ্চিৎ জলযোগ নিশ্চয়ই আপনাদের মন্দ লাগবে না?'

সুন্দরবাবু তৎক্ষণাৎ হলেন উৎফুল্ল। বললেন কেবল—'হুম্!'

—'মানিকের ব্যাগে কালকের জন্যে হয় তো আরো কিঞ্চিৎ খাদ্যের অস্তিত্ব থাকবে। তারপরে আমাদের ভাগ্যে আছে উপবাস—যত দিন না মরি ততদিন পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস! মন্দ কি? এই উপবাসকে আমরা যদি বলি প্রায়োপবেশন, তাহলে তো আমাদের মৃত্যু হবে গৌরবজনক! গ্রীক-বিজয়ী মহাবীর, অখণ্ড ভারতের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও তো যেচেই প্রায়োপবেশনে করেছিলেন প্রাণত্যাগ! আমরাই বা পারব না কেন?'

সুন্দরবাবু অভিযোগ-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'ঐ তো তোমাদের দোষ! খাবার আগেই উপবাস আর মৃত্যুর কথা তুলে মেজাজ খারাপ করে দাও কেন ভায়া! হুম্, আমার গলা দিয়ে আর রুটিও গলবে না!'

ঠিক সেই সময়ে বন্ধ দরজা ভেদ করে হঠাৎ জেগে উঠল একটা অস্বাভাবিক অট্টহাস্য!

হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা,—সে অট্টহাসি যেন আর থামতেই চায় না!

সকলের দেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! এমন অট্টহাসি কল্পনাতীত!

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'ব্রহ্মপিশাচ, ব্রহ্মপিশাচ—এইবারে আসছে ব্রহ্মপিশাচ!'

দারোগাবাবু অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে গেলেন ঘরের মেঝের উপরে! সুব্রতের মুখ দেখে মনে হয় সেও যেন অজ্ঞান হবার চেষ্টা করছে!

মানিক রিভলবার বার করে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্তের মতন বললে, 'ভূতই আসুক, আর মানুষই আসুক, আমি গুলির পর গুলি ছুঁড়ে তাকে ছিদ্রময় না করে ছাড়ব না!'

জয়ন্ত নিশ্চল এবং নিস্তব্ধ। এমন যুক্তিহীন অট্টহাস্যের অর্থই খুঁজে পেলে না।

তারপরেই হঠাৎ অট্টহাসি থামিয়ে কে বলে উঠল, 'হায় রে হায়, হায় রে পোড়াকপাল আমার! বাঘ-রাজাদের রাজ্য গেছে কিন্তু ছিল তাদের গুপ্তধন! তাও নিয়ে গেল দুশমনরা! আমার সুখের স্বপন ভেঙে গেল—এ দুঃখ রাখব কোথায় গো, রাখব কোথায়? হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা!'

জয়ন্তের ছুটে গেল সমস্ত জড়তা! বন্ধ-দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে করাঘাতের পর করাঘাত করতে করতে সে বললে, 'ভুষো-পাগলা, ভুষো-পাগলা, ভুষো-পাগলা!'

দরজার ও-পাশ থেকে শোনা গেল, 'আমাকে চিনেছ? চিনবেই তো, চিনবেই তো! তোমরা যে আমার বন্ধু! আমি যে এখানে এসেছি তোমাদের মুক্তি দিতেই!'

—'দাও, দাও, আমাদের মুক্তি দাও—তুমি হচ্ছো ঈশ্বর-প্রেরিত দূত!'

শিকল খোলার শব্দ। তারপরেই দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে ভুষো-পাগলা। জয়ন্ত সাদরে ভুষোকে আলিঙ্গন করে বললে, 'তুমি কি করে এখানে এলে?'

—'কি করে এলুম? কি করে এলুম? সে অনেক কথা! এখন খালি একটুখানি শুনে রাখো। তোমরাও যে এদিকে এসেছ আমি তা জানতুম না। বেড়াতে বেড়াতে দেখলুম, প্রতাপ চৌধুরী দলে বেশ ভারী হয়ে বনের দিকে যাচ্ছে। মনে কৌতূহল জাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের পিছু নিলুম। সোজা হাজির হলুম এইখানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠোনের লম্বা আগাছার ভিতরে হুমড়ি খেয়ে বসে এখানকার সব অভিনয় দেখলুম। তোমরা বন্দী হবার পরও কত কাণ্ডই যে হল! শেষটা দেখলুম, প্রতাপ চৌধুরীর দল আটটা বড় ঘড়া আর একটা মাঝারি আকারের সিন্দুক কাঁধে করে এখান থেকে সরে পড়ল! হায় রে হায়, কেমন করে এমন ব্যাপার সম্ভব হল, এখনো আমার মাথায় ঢুকছে না গো! আয়নাতে মুখ দেখে বৃদ্ধ বট এখনো গান গাইছে,

কিন্তু একটাও জলগ টিক্‌টিকি দেখা দিলে না বলেই তো আমার সব হিসাব একেবারে গুলিয়ে গেল ! সোনার স্বপন ভেঙে গেছে, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব ?'

জয়ন্ত তাকে প্রবোধ দিয়ে বললে, 'কোন ভয় নেই ভাই, মুক্তি যখন পেয়েছি, তোমার স্বপ্নকে সফল না করে আমরা ছাড়ব না ! কিন্তু কি বললে ? প্রতাপ চৌধুরীর দল কী কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছে ?'

—'আটটা ঘড়া আর একটা সিন্দুক !'

—'গুপ্তধন !'

—'হায় হায় হায় হায়—হুম্ !'

—'এখানে বসে হায় হায় করে কোনই লাভ নেই সুন্দরবাবু, জাগ্রত হোন—উঠে দাঁড়ান—ছুটে চলুন !'

—'ও বাবা, কোথায় ?'

—'প্রতাপ চৌধুরীদের পিছনে ।'

—'বল কি হে ? এমন রাতে, এমন অন্ধকারে, ঐ সর্বনেশে বনে ?'

—'নিশ্চয় ! চলুন, এখন প্রত্যেক মুহূর্তই মূল্যবান !'

—'তারা তো অনেকক্ষণ আগে রওনা হয়ে গিয়েছে, আমরা তাদের পিছু ধরতে পারব কেন ?'

—'বাজে কথায় সময় নষ্ট করবেন না । প্রতাপ চৌধুরীরা জানে আমরা বন্দী, তারা নিষ্কণ্টক । এত পরিশ্রমের পর আজ রাত্রে নিশ্চয়ই তারা কোদালপুর ত্যাগ করবার চেষ্টা করবে না । এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয় ।'

—'কিন্তু চা-রুটি-ডিমগুলো খেয়ে একটু চাঙ্গা হতেও কি পারব না ?'

দারোগাবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবুর কথা শুনেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠেছি—চুলোয় যাক্ চা-রুটি-ডিম ! আসামীকে ধরতে হবে আজই ।'

চতুর্দশ

সোনার আনারসের ছড়া

অন্ধকার অরণ্য ! আকাশে চাঁদ আছে বটে, কিন্তু দিনের সূর্য যেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, সেখানে রাতের চাঁদের কথা না তোলাই ভালো। ভয়াবহ বন হয়ে উঠেছে অধিকতর বিভীষণ।

জয়ন্ত বললে, 'ভাগ্যে সকালে বেরুবার আগে মানিকের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলুম ! সঙ্গে পেট্রলের লণ্ঠন আর 'টর্চ' না থাকলে এখানে আমাদের কি তুর্দশাই হোত !'

সুন্দরবাবু বললে, 'সঙ্গে আলো না থাকলে আমি এখানে আসতুম না কি ?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা, পথ চলতে চলতে আমি এইবারে কতগুলো কথা বলব, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। কথাগুলো আর কিছু নয়, সোনার আনারসের গুপ্তকথা।

সোনার আনারসের ছড়ার কথা মনে করুন। সহজভাবে দেখলে ছড়াটাকে অর্থহীন বলে মনে হয়। কিন্তু একটা অর্থহীন ছড়াকে বংশানুক্রমে এত যত্নে রক্ষা করা যায় না, আর কেবল সেই ছড়াকেই চুরি করবার জন্যে বাড়িতে চোর আসে না। বিশেষ, সুব্রতবাবুর পূর্বপুরুষরা স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন—অর্থাভাবের সময়ে ঐ ছড়ার মধ্যেই পাওয়া যাবে অর্থের সন্ধান ! এই সব কারণে প্রথমেই করলুম ছড়াটার মানে বোঝবার চেষ্টা।

'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা
খুঁজছে মাটি মোট্‌কা জট !'

আমি যা মানে করলুম তা হচ্ছে এই : আয়না—অর্থাৎ পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে পত্র-মর্মর-ধ্বনি করছে। তার মাথায় আছে বকের বাসা। আর তার ডাল থেকে মোটা-সোটা জটগুলো নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত। সুব্রতবাবুর বাগানে ঠিক এই রকম একটি বটগাছের সন্ধান পেয়ে আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হল।

ছড়াটার মানে কেবল আমিই বুঝিনি। ভূষো-পাগলা আর প্রতাপ চৌধুরীও বুঝেছিল। কিন্তু বিশেষ এক জায়গায় তারা অর্থের খেই হারিয়ে ফেলে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে আমিও সেই পর্যন্ত এগিয়ে সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছিলুম, তারপর মাথা খাটিয়ে হঠাৎ পাই আলোকের সন্ধান। সে-জায়গাটা হচ্ছে এই :

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যি-মামার ঝিক্‌মিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলগ টিকটিকি।'

মানে হচ্ছে, বটগাছের পশ্চিম দিকে সোজা পাঁচ পোয়া পথ অগ্রসর হতে হবে। সেখানে চারিদিকে ঝিক্‌মিক করছে সূর্যালোক। নদীর উপরে ভেসে যাচ্ছে নৌকোর ('না' বলে নৌকোকেই) পর নৌকো, আর জলে খেলা করছে কারা? না 'জলগ টিকটিকি'রা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এখানে জলবাসী টিকটিকি হচ্ছে কুমির—কারণ তাকে দেখতে অনেকটা গৃহবাসী টিকটিকির বৃহৎ সংস্করণেরই মত!

অর্থ হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোল বাধল। কারণ, বটগাছ পিছনে রেখে পশ্চিম দিকে সোজা পাঁচ পোয়া পথ এগিয়ে কোন নদী দেখা যায় না। এই জন্যেই এই পর্যন্ত এসে ভূষো-পাগলা রোজ হতভম্ব হয়ে ঘুরে মরত ; আমাকেও প্রথমটা বোকা বনে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু আমি এত সহজে হার মানতে রাজী নই। মাথা খাটিয়ে সুব্রতবাবুকে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, সত্যই এ অঞ্চলে আগে একটি

নদী ছিল কিন্তু এখন তা শুকিয়ে গিয়েছে, কেবল কোদালপুরের উত্তর-পশ্চিম দিকে তিন মাইলের কিছু বেশী দূরে গেলে আজও তার মরা খাত দেখা যায়। তারপর যথাস্থানে গিয়ে কি করে আন্দাজ করলুম যে, নদীটার গতি ছিল সেখান থেকে দক্ষিণ মুখে, আপনারা সকলেই তা জানেন। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সেইখানে ফিরে এলুম,—বটগাছ থেকে পশ্চিম মুখে সোজা পাঁচ পোয়া পথ পেরুলে যেখানে এসে উপস্থিত হওয়া যায়।

'অগ্নিকোণে নেইকো আগুন,
—কাঙাল যদি মানিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্ট ভাগে।'

অর্থ—(পশ্চিমে পাঁচ পোয়া পথ পার হয়ে নদীর ধারে গিয়ে দেখবে) অগ্নিকোণে—অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এক অরণ্য। কাঙাল যদি ঐশ্বর্য চায় তাহলে ঐ গভীর বনের ভিতর দিয়ে অগ্নিকোণের দিকে লক্ষ রেখে এক প্রহর বা তিন ঘণ্টা (দিন-রাতকে আট অংশে ভাগ করলে এক প্রহর হয়) ধরে অগ্রসর হবে।

'বাঘ-রাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।'

ছড়ার এইখানটায় কিঞ্চিৎ কবিত্ব প্রকাশ করে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে, এক প্রহর ধরে এগুবার পর পাওয়া যাবে বাঘ-রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

'সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।'

অর্থ—বাঘ-রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন একটি ঠাঁই আছে. যেখানে জলের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে আলো আর আঁধার। 'সর্প-নৃপ' কে? বাসুকি—রাজ্য যাঁর পাতালে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কে? ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ বাসুকির রাজ্য জলময় পাতালে লক্ষ্মী বাস করছেন ঐশ্বর্য নিয়ে।

এতক্ষণে আপনারা বুঝেছেন বোধ হয়, ঘরের ভিতর কূপ দেখে আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল কেন? প্রথমত, ঘরের ভিতরে কূপ, বেশ একটু অসাধারণ নয় কি? দ্বিতীয়ত, কূপের তলদেশটাই সর্পরাজ বাসুকির জলময় পাতালের এক অংশ বলে ধরে নেওয়া যায়। তৃতীয়ত, মাঝে মাঝে এও শুনেছি যে, কোন কোন সেকেলে কূপ আর পুষ্করিণীর ভিতর থেকে পাওয়া গিয়েছে গুপ্তধন।

গুপ্তধনের গুপ্তকথা শুনলেন, এইবার অন্য দু'চারটে কথা শুনুন। আমার কি বিশ্বাস জানেন? প্রতাপ চৌধুরীর বাড়িতে এখনো পুলিস পাহারা আছে, সুতরাং সে বাড়ির ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে না। অন্তত আজকের রাত্রের জন্যে তাকে আশ্রয় নিতে হবে সেই সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যেই। তারপর কাল সে হয়তো লোকজন আর গুপ্তধন নিয়ে কোদালপুর থেকে হবে অদৃশ্য।

অতএব ভোরের আলো ফোটবার আগেই আমাদের অবতীর্ণ হতে হবে সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে। শত্রুরা দলে হালকা নয়। কাজেই আমাদেরও দলে ভারী হতে হবে। সঙ্গে যখন দারোগাবাবু আছেন তখন সেজন্যে ভাবনা নেই! সুড়ঙ্গে হানা দেবার আগে থানা থেকে একদল চৌকিদার সংগ্রহ করলেই চলবে। কিন্তু খুব সম্ভব আমরা সহজেই আসামীদের গ্রেপ্তার করতে পারব। প্রতাপের এখন শত্রুভয় নেই। সে আর তার দলের লোকরা পথশ্রমে নিশ্চয়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো আমরা গিয়ে দেখব তারা সকলেই করছে নিদ্রা-দেবীর আরাধনা।

এই প্রতাপ চৌধুরীকে চোখে দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।

সেই-ই আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। নাটকের সর্বত্রই সে অভিনয় করছে, বারবার আমাদের নাস্তানাবুদ করে মারছে, অথচ একবারও চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করলে না। অপরাধীদের জগতে তাকে একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বলে স্বীকার করতে হয়। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে।'

পঞ্চদশ

অন্ধকারের পর আলো

গল্প এক রকম ফুরিয়েই গিয়েছে। আর বেশী কিছু বলবার নেই।

জয়ন্তের অনুমানই সত্য হল। শেষ-দৃশ্যে বইল না রক্তগঙ্গার ঢেউ! নেই চমকানি, নেইকো রোমাঞ্চ।

সুড়ঙ্গে চুপি-চুপি নেমে জয়ন্তরা দেখলে, প্রতাপ চৌধুরী সদলবলে নিদ্রিত। প্রত্যেকেই দেখছিল বোধ করি সফল আশার সুখস্বপ্ন।

কারুর ঘুম ভাঙবার আগেই চৌকিদাররা তাদের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মত। ঘুমের জড়তা ছোটবার আগেই প্রত্যেকের হাতে পড়ল দড়ি বা হাতকড়ি। যেটুকু ধস্তাধ্বস্তি হল তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

রিভলবারটা আবার খাপে পুরে রেখে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'সুব্রতবাবু, কোন্ মহাত্মার নাম প্রতাপ চৌধুরী?'

সুব্রত অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিলে।

সুড়ঙ্গের মধ্যে যে তিনদিক-ঘেরা ও একদিক-খোলা কুঠরির মত জায়গা ছিল, সেইখানে একটা খুব সেকেলে পেটিকার উপরে একটি লোক ঘাড় হেঁট করে বসে ছিল। হৃষ্টপুষ্ট ভদ্র চেহারা, ধব-ধবে ফরসা রঙ, অতি শৌখীন জামা-কাপড়। দেহের কোথাও এতটুকু শয়তানির ছাপ নেই। সে যে-কোন সম্ভ্রান্ত সমাজে গিয়ে অনায়াসে মেলামেশা করতে পারে। অন্যান্য দুশমন চেহারার পাশে তাকে দেখাচ্ছিল কেমন খাপছাড়া। যেন বাংলা সাপ্তাহিকের পদ্যগুলোর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা!

জয়ন্ত একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রতাপ মুখ তুললে—মিষ্ট হাসিমাখা মুখ। বললে, 'কি দেখছ?'

—'তুমি প্রতাপ চৌধুরী ?'

—'আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।'

—'সিংহের মত বিক্রম প্রকাশ করে তুমি কলে পড়লে ইঁদুরের মত ?'

—'কপাল !'

—'কপাল নয়, নিজের বোকামি।'

—'কি রকম ?'

—'এই সুড়ঙ্গে না এলে তুমি ধরা পড়তে না।'

—'কেমন করে জানব তোমরা সুড়ঙ্গের খবর রাখো ?'

—'গল্পের এক-চক্ষু হরিণও এই রকম বোকামি করেছিল।'

—'তার উপরে তোমরা ছিলে দূর-বনে বন্দী।'

—'এক ঈশ্বর-প্রেরিত দূত এসে আমাদের মুক্তি দিয়েছে।'

—'কে ?'

—'ভূষো-পাগলা।'

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে ভূষোর দিকে তাকালে। তার হাসিমুখ হল গম্ভীর। তার দুই চক্ষে ঠিকরে নিবে গেল দুটো বিদ্যুৎ-কণিকা।

ভূষো পিছিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

জয়ন্ত বললে, 'ভয় কি ভূষো, ভয় কি ? পিঞ্জরের সিংহ হয় পরম বৈষ্ণব।'

প্রতাপ হাসতে লাগল। বললে, 'ঠিক। যখন পিঞ্জরের বাইরে ছিলুম তখন আমার উচিত ছিল, ও আপদটাকে পথ থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া। তা দিইনি বলে এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে।'

—'যা গত, তা নিয়ে বুদ্ধিমান শোচনা করে না।'

—'তাও ঠিক। ধন্যবাদ। তুমি দেখছি দার্শনিক।'

—'আপাতত তোমার সঙ্গে আর বেশি আলাপ করবার সময় নেই, এইবার তোমাকে যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

—'আমি প্রস্তুত। কিন্তু তার আগে দুটো কথা বলে যাই। ঐ

যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটা ঘড়া দেখছ, ওর প্রত্যেকটার মধ্যেই আছে দুই হাজার করে বাদশাহী মোহর। ঘড়াগুলোও পরীক্ষা করেছি। প্রত্যেকটাই সোনার ঘড়া। আর এই যে পেটিকার উপরে আমি বসে আছি, এর ভিতরে আছে রাশি রাশি জড়োয়া গয়না আর নানারকম রত্ন—তাদের দাম ঠিক করবার সময় এখনো পাইনি। তোমরা জানো তো, এই গুপ্তধনের উপরে এখন তোমাদের কোনই দাবি নেই। কারণ, অলিখিত আইনবলে, বেওয়ারিশ গুপ্তধনের অধিকারী হয় আবিষ্কার-কর্তাই। এই গুপ্তধন আবিষ্কার করেছি আমিই। অতএব আমিই এর অধিকারী। কেমন, এ কথা মানো তো?'

—'তারপর?'

—'আপাতত এই গুপ্তধন তোমার জিম্মায় রেখে গেলুম। যথা-সময়ে তোমাকে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে। বুঝলে জয়ন্ত?'

—'হিসাব নেবে কে?'

—'আমি।'

—'তুমি না তোমার প্রেতাত্মা?'

—'মানে?'

—'তুমি নরহত্যা করেছ। তোমার তো শেষ অবলম্বন ফাঁসিকাঠ সম্বল।'

—'আমিই যে নরহত্যা করেছি, আদালতে সেটা প্রমাণ করতে পারবে তো?'

—'ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিলেও তোমাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বা কারাগারে বাস করতে হবে।'

—'মূর্খ! কোন কারাগার বা ফাঁসিকাঠ আমার জন্যে তৈরি হয়নি আজো।'

—'বেশ, দেখা যাবে।'

—'হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। দেখা যাবে।'

জয়ন্ত ফিরে বললে, 'দারোগাবাবু, কয়েদীদের যথাস্থানে প্রেরণ করুন।'

প্রতাপ চৌধুরী সদলবলে যাত্রা করলে চৌকিদার প্রভৃতির সঙ্গে থানার পথে।

সুন্দরবাবু সাগ্রহে বললেন, 'এইবারে দেখা যাক ঘড়াগুলো আর ঐ পেটিকার মধ্যে কি আছে!'

জয়ন্ত বললে, 'গুপ্তধন সুব্রতবাবুর হাতে তুলে দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ করলুম। আমার আর মানিকের আর কিছুই দেখবার দরকার নেই।'

—'হুম্, সে কি হে?'

জয়ন্ত সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফিরে বললে, 'সুব্রতবাবু, এই রইল আপনার গুপ্তধন। কিন্তু বিদায় নেবার আগে আপনার কাছে আমার অনুরোধ আছে।'

—'আজ্ঞে, অনুরোধ নয়,—হুকুম !'

—'বেশ, তাই। শুনুন। ভূষো-পাগলা গুপ্তধনের বিফল স্বপ্ন দেখে নিজের জীবনকে প্রায় ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আজ সে না থাকলে আপনি প্রাণেও বাঁচতেন না, আর গুপ্তধন থেকেও হতেন বঞ্চিত। অতএব এই বিপুল ঐশ্বর্যের ষোলো ভাগের মাত্র এক ভাগ তাকে দান করতে কি আপনার আপত্তি আছে?'

—'নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়। আজ থেকে ভূষো হবে আমার পরম আত্মীয়ের মত।'

—'উত্তম। তারপর, ষোলো ভাগের আর এক ভাগ থেকে আপনি যদি সুন্দরবাবু আর দারোগাবাবুকে আধা-আধি বখরা দেন, তাহলে আমি অত্যন্ত বাধিত হবো।'

—'অবশ্যই দেবো। আপনাদেরও তো এই গুপ্তধনের উপর দাবি আছে।'

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে উঠল। বললে, 'গুপ্ত বা ব্যক্ত কোন ধনের লোভেই আমরা কোন কাজ করি না। গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে শখ। ভগবান আমাকে আর মানিককে যা দিয়েছেন, তা আমাদের পক্ষে যথেষ্টরও বেশী। তাতেই আমরা খুশী। এস হে মানিক! সুড়ঙ্গের ভিতর আর কীটের মতন বাস করি কেন, বাইরে এতক্ষণে পাখিরা গাইছে প্রভাতী গান—নতুন সূর্য সোনায় মুড়ে দিচ্ছেন পৃথিবীকে। চল, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমরাও যোগ দিই শুভ্র আলোকের পবিত্র অভিনন্দনে।'
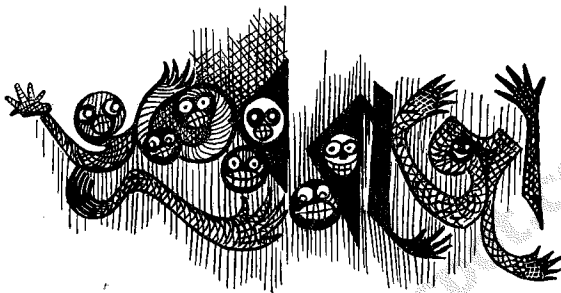
কোন কোন ব্যক্তির অদ্ভুত ধারণা আছে যে, বাঙালী ছেলেমেয়েদের হাতে ভূতের গল্প দিলে, পরিণত বয়সে তারা ভীরু হয়ে পড়বে। মস্ত ভুয়ো কথা। সাহসে ও বীরত্বে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা অতুলনীয়, এ-কথা অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু ও-দেশে ছেলেদের জন্যে যত ভূতের গল্পের বই আছে, এ-দেশে এখনো তার শতাংশের একাংশ বইও লেখা হয় নি! পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য সমস্ত দেশেই স্বাভাবিকভাবে আজ পর্যন্ত যে শিশুসাহিত্য গড়ে উঠেছে, ভূত-প্রেতের কথা অন্তত তার এক-চতুর্থাংশ অধিকার করে আছে! লেখকের তেমন কিছু ভূতুড়ে গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে 'ভূতের রাজা' মালা গাঁথা হল।

সম্পাদিকা

ভূতের রাজা

সরকারী কাজে বিদেশে থাকি। ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।

সাঁওতাল পরগনার যে-জায়গায় আমার কর্মস্থল ছিল, সেখান থেকে রেল স্টেশনে যেতে হলে প্রায় ত্রিশ মাইলেরও উপর পথ পার হতে হবে। পাহাড়ে পথ—এক এক মাইল হচ্ছে দু'তিন মাইলের ধাক্কা। তার উপরে রাতের বেলায় পথে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গেও আলাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়! সকালবেলায় বেরুলেও মাঝপথে সন্ধ্যা হবেই। তখন একটা আশ্রয়ের দরকার।

মাঝ-পথের কাছাকাছি স্থানীয় রাজার একটি শিকার-কুঠি ছিল। রাজা বা তাঁর বন্ধুরা শিকারে বেরুলে এই কুঠি হ'ত তাঁদের প্রধান আস্তানা।

রাজার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁকে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, শিকার-কুঠিতে একটা রাতের জন্যে আমাকে মাথা গোঁজবার জায়গা দিতে হবে।

ম্যানেজার বললেন, 'এখন শিকারের সময় নয়, কুঠি খালি পড়ে আছে। আপনি এক রাত কেন, এক মাস থাকতে পারেন। এখানকার পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টেলর সাহেবও আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম করবেন। কুঠিতে আরো ঘর আছে, আপনারও থাকবার অসুবিধা হবে না। কিন্তু—'

—'কিন্তু কি ?'

—'কিন্তু আপনি সেখানে রাত কাটাতে পারবেন কি ?'

—'কেন পারব না ?'

—'লোকের মুখে শুনি, কুঠিতে নাকি অপদেবতার ভয় আছে।'

—'অপদেবতা ?'

—'হ্যাঁ, অপদেবতা ছাড়া আর কি বলব ? কুঠির পাশেই শাল-বনের ভেতর সাঁওতালদের এক ভূতুড়ে দেবতা আছে। সেই দেবতা নাকি ভূতের রাজা। তার ভয়ে সাঁওতালরা পর্যন্ত সন্ধ্যার পর ও-পাড়া মাড়ায় না। তারা বলে, তাদের দেবতা নাকি রাতের বেলায় কুঠির ভেতরে ঘুমোতে আসে।'

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, 'বেশ তো, মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে রাত্রিবাস করব, এটা তো মস্ত পুণ্যের কথা! আমি রাজী!'

ম্যানেজার বললেন, 'আমি অবশ্য ও-সব ছেলেমানুষী কথায় ততটা বিশ্বাস করি না, তবু বলা তো যায় না—'

যথাসময়ে ডুলিতে চড়ে রওনা হয়ে, সন্ধ্যার কিছু আগেই শিকার-কুঠিতে পৌঁছলুম।

ডুলি-বেয়ারা বলে গেল, মাইল তিনেক তফাতে একটা গাঁয়ে গিয়ে তারা আজকের রাতটা কাটাবে; কাল সকালে আবার ডুলি নিয়ে আসবে।

কুঠির বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে বসে টেলর সাহেব তামাকের পাইপ টানছিলেন। সাহেবের সঙ্গে আমারও বেশ পরিচয় ছিল।

আমাকে দেখে সাহেব বললেন, 'এই যে, গুপ্ত যে! তুমি কোথায় যাচ্ছো ?'

—'ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।···তুমি ?'

—'আমি 'হোমে' যাচ্ছি। তুমি কি আজ এখানে থাকবে ?'

—'হ্যাঁ সায়েব !'

—'বেশ, বেশ, দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটানো যাবে, এ ভালোই হল।'

—'দুজন কেন সাহেব, তিনজন।'

—'তিনজন আবার কে? তুমি কি আমার আর্দালীর কথা বলছ? ও, তাকে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না।'

—'না সায়েব, তোমার আর্দালীর কথা বলছি না।'

—'তবে কি কুঠির দ্বারবানের কথা ভাবছ? না, সে রাত্রে এখানে থাকে না।'

—'না না, আমি দ্বারবানের কথাও বলছি না।...তুমি কি শোনোনি সায়েব, সাঁওতালদের এক দেবতা রাত্রে আমাদের সঙ্গী হতে পারেন?'

টেলর হেসে বললে, 'ওহো, শুনেছি বটে! তা, সে রূপকথার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।...তুমি কর নাকি?'

—'করলে, একলা এখানে রাত কাটাতে আসি?'

টেলর পাইপে তিন-চারটে টান মেরে বললে, 'দেখ, গুপ্ত, সাঁওতালদের এই দেবতাটিকে আমি দেখেছি। এমন বীভৎস দেবতা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে।'

—'পছন্দ হয়েছে?'

—'হ্যাঁ। তাই ঠিক করেছি, কাল যাবার সময়ে তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ইংলণ্ডে আমার বাড়ির বৈঠকখানায় তাকে সাজিয়ে রেখে দেবো। আমার বন্ধুরা তাকে দেখলে খুব তারিফ করবেন।'

আমি হেসে বললুম, 'তা'হলে বোঝা যাচ্ছে, কাল থেকে দেবতা আর কুঠির ভেতরে শুতে আসবে না? তবে এইবেলা তাঁকে একবার দর্শন করে আসি।...তাঁর আড্ডা কোথায়?'

টেলর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ঐ যে, ঐখানে! মিনিট-খানেকের পথ।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। কুঠির পাশেই অনেকগুলো শাল-গাছ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই ছায়ায় একটা পাথুরে টিপির উপরে মানুষের মত উঁচু একটা মূর্তিকে দেখতে পেলুম।

মূর্তিটা রঙ-করা কাঠের। তার দেহ মাপে মানুষের মতন বটে, কিন্তু তার মুখ দানবের মতন প্রকাণ্ড! আর সে মুখের ভাব কি ভয়ংকর! দেখলেই বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে থাকে।

মাথার চুলগুলো সাপের মতন ঝুলছে, কান দুটো হাতীর মতন, মুখখানা খানিক সিংহ আর খানিক ভাল্লুকের মতন, দু'দুটো গোল গোল কাঁচের চোখ আগুনের মত জ্বলছে। হাঁ-করা বড় বড় দাঁতওয়ালা
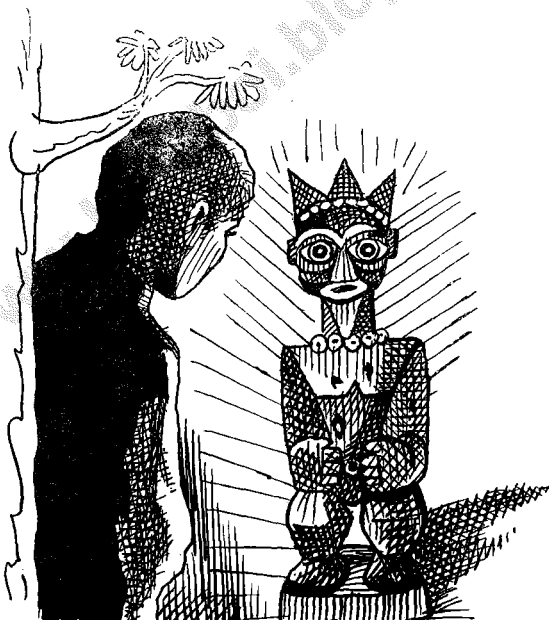
মুখের ভিতর থেকে রাঙা টকটকে, লক্‌লকে জিভের আধখানা বাইরে বেরিয়ে পড়ে ঝুলছে! কাঁধ ও মুণ্ডের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয়, কে যেন একটা লিক্‌লিকে সরু বাঁখারির উপরে মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে। হাত দুখানা বাঘের থাবার মত। কোমরের কাছ থেকে পা পর্যন্ত দেহের কোন অঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। কাঠকে কুঁদে আর কোন অঙ্গ গড়াই হয় নি। মূর্তির গায়ের রঙ আলকাতরার মতন কালো আর মুখের রঙ খানিক সাদা, খানিক তামাটে ও খানিক হলদে!

ভাবলুম, এ মূর্তি যদি সত্য সত্য রাত্রে কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসে, তা'হলে আমাদের ঘুম এ জীবনে আর ভাঙবে কি?

...ধীরে ধীরে কুঠির দিকে ফিরে এলুম। টেলর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল। আমাকে দেখে সে বললে, 'গুপ্ত, খুব ঝড়-বৃষ্টি আসছে, ঐ দেখ!'

সত্য কথা। পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন কালো কষ্টিপাথর হয়ে গেছে। ঝড় উঠতে আর দেরি নেই।

ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে।

অনেক রাত। টেলরের নিমন্ত্রণ নিয়ে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ আগে 'ডিনার' খেয়েছি। এখন টেলর তার ঘরে হয়তো দিব্যি আরামে নিদ্রা দিচ্ছে—কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

ভূত-টুত কিছু মানি না—তবু কেন জানি না, মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছে! রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালী দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত আনাগোনা করছে। যত তাদের ভুলবার চেষ্টা করি আজেবাজে নানান কথা ভেবে—তত তারা মনের উপরে চেপে বসে, নরম মাটির উপরে ভারী পায়ের দাগের মত।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝম্‌-ঝম্‌ রম্‌-রম্‌ ! মাঝে মাঝে ঝোড়ো, দমকা হাওয়া হা-হা-হা-হা করে উঠছে !—যেন কোন আহত আত্মার কান্না ! চারিদিক থেকে বনের গাছপালাগুলো মর্‌-মর্‌-মর্‌-মর্‌ করে যেন কোন শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে ! তারই ভিতর থেকে একবার শুনলুম হায়েনার অট্টহাসি, একবার শুনলুম শৃগাল দলের মরাকান্না, একবার শুনলুম বাঘের গর্জন !···

হঠাৎ আমার ঘরের দরজার উপর দুম্‌দুম্‌ করে আঘাত হল ! ধড়মড় করে আমি বিছানার উপরে উঠে বসলুম—সে কি আসছে ? সে কি আসছে ?

দরজার উপরে আর কোন আঘাত হল না ! ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় দরজা নড়ে উঠেছে নিশ্চয় ! নিজের কাপুরুষতার জন্যে মনে মনে নিজেই লজ্জিত হয়ে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে বাহির থেকে খন্‌খনে ঝাঁঝালো গলায় গান শুনলুম ঃ—

'লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্‌ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড় !'

এ তো সাঁওতালী ভাষা। নিশ্চয়ই কোন সাঁওতাল গান গাইছে। কিন্তু এত রাত্রে, এমন ঝড়-বাদলে, এই হিংস্র জন্তু ভরা গভীর অরণ্যের মধ্যে কে সাঁওতাল মনের আনন্দে শখ করে গান গাইতে আসবে ?

আবার দরজার উপরে ঘন ঘন আঘাত হল—এবারে আরো জোরে।·· আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয়, এ যে সত্য-সত্যই কে দরজা ঠেলছে আর ঠেলছে !'···তবে কি সে এসেছে ? তবে কি সে এখানে ঘুমোতে এসেছে ?

আবার গান শুনলুম ! এবারে আমার খুব কাছে, একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে। সেই তীব্র খন্‌খনে গলার গান !—

'লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্‌ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড় !'

হঠাৎ উলটো বিপদ ! কুঠির ভিতর দিক্‌কার দরজায় ঘন ঘন আঘাত ! ভিতরে-বাহিরে বিপদ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে

বসেছি, এমনি সময়ে শুনলুম—'গুপ্ত! গুপ্ত! ভগবানের দোহাই, খোলো—দরজা খোলো শীগগির!'

এ তো টেলরের গলা!...আঃ! বাঁচলুম! তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

টেলর হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল—তার চোখ-মুখ পাগলের মত, তার হাতে বন্দুক!

আমি তাকে দু'হাতে চেপে ধরে বললুম, 'মিঃ টেলর, হয়েছে কি? এত রাত্রে কি দরকার তোমার?'

টেলর দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'গুপ্ত, আমার ঘরের দরজায় ক্রমাগত কে লাথি মারছে আর গান গাইছে! তুমিই কি আমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকছিলে?'

আমি বললুম, 'না, না! আমি আমার বিছানা ছেড়ে এক পা-ও নড়িনি! কিন্তু আমারও ঘরের দরজা যে কে নাড়ছে, আর গান গাইছে!...ঐ শোনো!'

দুম্‌দুম্ করে আমার ঘরের দরজায় আবার দু-বার প্রচণ্ড আঘাত হল—সঙ্গে সঙ্গে সেই গান :—

'লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়!'

আচমকা আবার একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে দরজা জানলার উপরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খড়্‌খড়ি দুমদাম করে খুলে গেল!...সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্ট দেখলুম, বারান্দার উপরে কার একটা জীবন্ত ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে? কে ও? কে ও? ওকি সেই-ই—যে প্রতি রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসে...আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল!

টেলরের বন্দুক গুড়ুম্ করে গর্জে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা সাঁৎ করে বারান্দার একপাশে, আমাদের চোখের আড়ালে সরে গেল। টেলর চেঁচিয়ে উঠল, 'গুপ্ত! গুপ্ত! জানলা বন্ধ করে দাও—জানলা বন্ধ করে দাও!'

পা চলতে চাইছিল না। কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালী কাপুরুষ, সেই ভয়ে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে দমন করে আমি জানলার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলুম।

টেলর টলতে টলতে আমার বিছানার উপরে বসে পড়ে বললে, 'গুপ্ত! কিছু মনে করো না, আমি আজ তোমার বিছানাতেই তোমার সঙ্গে রাত কাটাব!'

বাইরে আবার কে গান গাইলে :—

'লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘাণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়্!'

সকালবেলা। কিন্তু তখনো সমানভাবে বৃষ্টি ঝরছে আর ঝরছেই।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সারা আকাশখানা যেন কালো মেঘের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা; সূর্যকে যেন আজ কোন অন্ধকার-রাহু গ্রাস করে ফেলেছে। যতদূর নজর চলে খালি দেখা যায় অগণ্য শ্যামল তরুর বিরাট সভা আর শৈল-মালার গর্বোন্নত শিখর এবং তারই ভিতরে এসে পড়ছে তীরের চকচকে ফলার মত বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারাগুলো। কোথাও পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ বা কোন জীবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—পথের উপর দিয়ে ক্রুদ্ধ জলস্রোত যেন কোন অদৃশ্য শত্রুকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে!

হঠাৎ বারান্দার এক কোণে চোখ গেল। কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একজন শুয়ে রয়েছে! কাছে গিয়ে ডাকলুম, 'এই। কে তুই?'

বার কয়েক ডাকাডাকির পর কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা সাঁওতালী মুখ বেরুল।

—'কে তুই!'

—'আমি ঠাকুরের পূজারী।'

—'ঠাকুর! কে ঠাকুর?'

—'যিনি ঐ শালবনে থাকেন।'

—'এখানে কি করছিস ?'

—'ঠাকুর রোজ রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসেন, তাই আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসি ।'

—'কাল রাত্রে তাহলে তুই-ই দরজা ঠেলছিলি ?'

—'আমিও ঠেলছিলুম, ঠাকুরও ঠেলছিলেন ।'

—'আর গান গাইছিল কে ?'

—'আমি ।'

এমন সময় টেলরও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে সব কথা খুলে বললুম। টেলর তো শুনেই মহা ক্ষাপ্পা, ঘুষি পাকিয়ে পুরুতের দিকে ছুটে যাবা মাত্র সে এক লাফে বারান্দার রেলিং টপকে বাইরে পড়ে, বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

টেলর বললে, 'রাস্কেলকে ধরতে পারলে একবার দেখিয়ে দিতুম ! ওঃ, সারারাত কি অশান্তিতেই কেটেছে !'

আমি বললুম, 'যাক্, যা হবার তা তো হয়ে গেছেই ! এখন আমাদের কি উপায় হবে ! কুঠির দ্বারবানও এল না, ডুলি-বেয়ারারাও এই দুর্যোগে বোধহয় আসবে না । আমরা যাব কেমন করে ?'

টেলর বললে, আমাকে যেমন করেই হোক আজ যেতে হবেই। বোম্বে যাবার টিকিট পর্যন্ত আমি কিনে ফেলেছি। উপায় থাকলে তোমাকেও আমি স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতুম। কিন্তু আমার 'টু-সিটার' গাড়ি—আমি, আমার আর্দালী, তুমি, তোমার চাকর আর তোমার মালপত্তর অতটুকু গাড়িতে তো ধরবে না, কাজেই তোমাকে এখানে ফেলে রেখেই আমাকে যেতে হবে।···আর্দালী !'

টেলরের আর্দালী এসে সেলাম করলে।

টেলর বললে, 'আমার মালপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে তোলো। তারপর শালবন থেকে সেই কাঠের পুতুলটা তুলে নিয়ে এস।'

আমি বললুম, 'তুমি কি সত্যি সত্যিই ঐ পুতুলটা ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে চাও ?'

টেলর বললে, 'নিশ্চয় ! আমার যে কথা সেই কাজ !'

আবার রাত এল। বৃষ্টি এখনো থামেনি, আমি এখনো কুঠিতে বন্দী হয়ে আছি।

টেলর চলে গেছে এবং যাবার সময়ে সাঁওতালদের ভূতের রাজাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সে আর এই কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসবে না।

চোখে ঘুম আসছিল না। একখানা ইংরেজী নভেল বার করে পড়তে বসলুম। ঘণ্টা দেড়েক পরে তন্দ্রার আবেশ এল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে শয়নের উপক্রম করছি, এমন সময়ে শুনলুম, বাইরের সিঁড়ির উপরে আওয়াজ হল, ঠক্ ঠক্ ঠক্ !

ঠিক যেন কাঠের আওয়াজ ! ঠক্ ঠক্ করতে করতে আওয়াজটা আমার ঘরের কাছ-বরাবর এল, তারপর দরজার উপরে শুনলুম ধাক্কার পর ধাক্কা ! কী আপদ ! টেলর তো পুতুলটাকে নিয়ে কোন্ সকালে বিদায় হয়েছে, এ আবার কে জ্বালাতে এল !

নিশ্চয়ই সে সাঁওতাল পুরুত ব্যাটা ! সে হতভাগা রোজ রাত্রে এইখানে আরাম করে ঘুমোয় আর চারিদিকে রটিয়ে দেয় কুঠির ভিতরে ভূতের রাজা শুতে আসেন !

ধাক্কার জোর ক্রমেই বেড়ে চলল।···একবার ভাবলুম দরজা খুলে পুরুতটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দি। তারপর মনে হল সে কাজ ঠিক হবে না। এই দুর্যোগে বিজন জঙ্গলের ভিতরে রাত্রে একলা আমি এখানে আছি, যদি কোন দুষ্টলোক কুমতলবে এসে থাকে ?

বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার এক জায়গায় একটা ছ্যাঁদা ছিল, বন্দুকের নলটা সেইখানে রেখে চেঁচিয়ে বললুম, 'কে আছ চলে যাও, নইলে এখনি আমি বন্দুক ছুঁড়ব !'

কোন জবাব নেই, দরজার উপরে ধাক্কাও থামল না।

—'এখনো আমার কথা শোনো, নইলে—'

বাইরে বিশ্রী গলায় কে হাসতে লাগল—হিহি হিঃ, হিহি হিঃ, হিহিহিহিহি—

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম,— সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপরে ধাক্কাও থেমে গেল।

ঠক্ ঠক্ করে একটা আওয়াজ ঘরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল—তারপর কুঠির সিঁড়ির উপরে শব্দ শুনলুম ঠক্ ঠক্ ঠক্!

খানিক পরে অনেক দূর থেকে আবার সেই বিশ্রী হাসি শোনা গেল, হিহি হিঃ, হিহি হিঃ, হিহিহিহিহি—

সে হাসি অমানুষিক···শরীরের রক্ত যেন জল করে দেয়।

শেষ রাতে জল ধরে গেল।

সকালে দরজা খুলতেই কাঁচা সোনার মতন কচি রোদ এসে ঘরখানা যেন হাসিতে ভরিয়ে তুললে! রোদ দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল।

বারান্দায় বেরিয়েই দেখি, এককোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে! তেড়ে গিয়ে মারলুম তাকে এক ধাক্কা! ধড়মড় করে সে উঠে বসল। সেই সাঁওতাল পুরুতটা!

ক্রুদ্ধস্বরে বললুম, 'কাল আবার কি করতে এখানে এসেছিলি? ভারী চালাকি পেয়েছিস, না?'

লোকটার মুখের ভাব একটুও বদলাল না। শান্তস্বরে বললে, 'আমার ঠাকুর কাল এখানে ঘুমোতে এসেছিলেন, আমিও তাই এসেছিলুম।'

—'তোর ঠাকুর কোথায়? সায়েব তো তাকে নিয়ে চলে গেছে!'

—'আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন!'

—'মিথ্যা কথা! আমি নিজের চোখে দেখেছি, টেলর তাকে নিয়ে চলে গেছে।'

—'আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেইখানেই আছেন!'

কুঠি থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটে পাশের শালবনে গিয়ে হাজির হলুম। সবিস্ময়ে দেখলুম, ভূতের রাজা চোখ পাকিয়ে লক্‌লকে জিভ বার করে ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে!

আর—আর, ও কি? মূর্তির পেটের উপরে একটা গর্ত—ঠিক যেন বন্দুকের গুলির দাগ! গর্তের চারপাশে রক্ত জমাট হয়ে আছে—মূর্তির আরো নানা জায়গাতেও রক্তের চিহ্ন!

তবে কি আমার বন্দুকের গুলিই—ভাবতে পারলুম না, মূর্তির দিকে আর তাকাতেও পারলুম না, কেমন একটা অজানা ভয়ে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল—প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

কলকাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে এই বিবরণ পড়লুম ঃ—

'সাঁওতাল পরগনার পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে টেলর কর্ম হইতে অবসর লইয়া বিলাতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে এক বিপদে পড়িয়া খুব সম্ভব তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন। স্থানীয় জঙ্গলের ভিতরে তাঁহার মোটর গাড়ি পাওয়া গিয়াছে। মোটরের উপরে, ভিতরে ও চারিপাশে রক্তের দাগ, কিন্তু মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দালীর কোনই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ সন্দেহ করিতেছে, মিঃ টেলর ও তাঁহার আর্দালীকে ব্যাঘ্র বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে। নিকটস্থ জঙ্গলে এক নরখাদক ব্যাঘ্রেরও খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।'

সেই ভূতুড়ে মূর্তির গায়ে যে রক্তের দাগ লেগেছিল, তা'হলে সে রক্ত হচ্ছে হতভাগ্য টেলরের আর তার আর্দালীর গায়ের রক্ত?

এবং সেই সাঁওতাল পুরুতটাই নিশ্চয় কোনগতিকে খবর পেয়ে ভূতের রাজাকে আবার শালবনে ফিরিয়ে এনেছিল?

মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলুম, শিকার-কুঠিতে আর কখনো রাত্রিবাস করবো না! কিসে কি হয়, কে জানে?

কে ?

॥ ১ ॥

উড়িষ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। আমি আর রূপলাল। এদেশ-সেদেশ ঘুরে ভুবনেশ্বরে গিয়ে হাজির হলুম।

এক দুপুরবেলায় খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে গেলুম। যাওয়ার সময় পাণ্ডা সাবধান করে দিলে, আমরা যেন সন্ধ্যা হবার আগেই ফিরে আসি; কারণ খণ্ডগিরিতে নাকি নরখাদক বাঘের বিষম উপদ্রব হয়েছে। বাঘের কবলে পড়ে এক মাসের মধ্যে পাঁচ-জনের প্রাণ গিয়েছে।

এ-কথা শুনে ভয় পেলুম না, কারণ আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল।

খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। এবং বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সারা আকাশ কালো করে শুরু হল ঝড় ও বৃষ্টি।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ডাকবাংলোর ভিতরে আশ্রয় নিলুম।

বিকাল গেল, সন্ধ্যাও উত্‌রে গেল। কিন্তু সে ঝড়-বৃষ্টি তবু থামল না।

বাংলোর বেয়ারা এসে বললে, 'বাবু, আজ আপনারা এখান থেকে যাবেন কেমন করে?'

রূপলাল বললে, 'কেন, যেমন করে এসেছি তেমনি করেই ফিরে যাব। অর্থাৎ দু'পায়ে ভর দিয়ে।'

বেয়ারা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আজ আর তা পারবেন না। একে এই ঝড়-জল, তার ওপরে—শুনেছেন তো?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, বাঘের উপদ্রবের কথা বলছ ত? শুনেছি।'

বেয়ারা বললে, 'খালি বাঘ নয়, পেত্নীর ভয়ও আছে!'

রূপলাল বললে, 'তাহ'লে আজ আমরা এই বাংলোতেই রাত কাটাব। জীবনে কখনো পেত্নী দেখিনি। আজ তাকে দেখব। আর, যদি পছন্দ হয়, তাহলে সেই পেত্নীটিকে বিয়ে করে দেশে ফিরব।'

বেয়ারা বললে, 'বাবু, আপনি জানেন না তাই ঠাট্টা করছেন। বেশ, আপনারা তা'হলে আজ এখানে থাকবেন তো?'

আমরা বললুম, 'হ্যাঁ।'

বেয়ারা বললে, 'তা'হলে আপনাদের জন্যে রান্নাবান্নার আয়োজন করি-গে।'—এই বলে সে চলে গেল।

রাত হল। বৃষ্টি এখনো ঝরছে, ঝড় এখনো গর্জন করছে।

॥ ২ ॥

রাত্রে খেতে বসেছি, এমন সময় বাংলোর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, এমন স্থানে এই দুর্যোগে দরজা ঠেলে কে?

বেয়ারা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

বাহির থেকে ভীত, কাতর নারী-কণ্ঠে সাড়া এল, 'শীগগির দরজা খুলে দাও! নইলে প্রাণে মারা গেলুম!'

উড়ে বেয়ারাটা সেইখানে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

আমি বললুম, 'অমন করছো কেন? যাও, দরজা খুলে দাও।'

বেয়ারা এক পা-ও নড়ল না, সেইখানে দাঁড়িয়ে তেমনি করেই কাঁপতে লাগল।

রূপলাল তার ভয় দেখে হাসতে হাসতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বেয়ারা ছুটে গিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বললে, 'পায়ে পড়ি বাবু, দরজা খুলবেন না! ও মানুষ নয়!'

রূপলাল বললে, 'বলেছি ত, আমি পেত্নী বিয়ে করতে চাই! ও মানুষ না হলেই আমি বেশী খুশি হবো।'

বাহির থেকে আবার আর্তস্বরে শোনা গেল, 'বাঘ! বাঘ! রক্ষা কর! রক্ষা কর!'

রূপলাল আর বাধা মানলে না, বেয়ারাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে একটানে সে দরজার খিলটা খুলে দিলে।

একটা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে দরজা ঠেলে তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করলে একটি স্ত্রী-মূর্তি। তাকে ভালো করে দেখবার আগেই বাতাসের ঝাপটে ঘরের আলোটা গেল নিবে!

বেয়ারাটা হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

সেই অন্ধকার রাত্রি, সেই ঝড়-বৃষ্টির হুলুস্থুল, সেই পার্বত্য অরণ্যের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, সেই অভাবিত ও অজানা নারী-মূর্তির আকস্মিক আবির্ভাব এবং আলোকহীন ঘরের ভিতরে বেয়ারার সেই ক্রন্দন-স্বর,—এই সমস্ত মিলে চারদিকে কেমন একটা ছম্‌ছমে অস্বাভাবিক ভাব সৃষ্টি করলে!

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'রূপলাল, শীগগির দরজাটা বন্ধ কর, আমি আবার আলোটা জ্বেলে নি।'

রূপলাল দরজায় খিল তুলে দিলে। আমি আলোটা জ্বাললুম।

কৌতূহলী চোখে ফিরে দেখলুম, ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে একটি অসীম রূপসী মেয়ে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে! তার এলোমেলো চুলগুলো এলিয়ে মুখ, কাঁধ ও বুকের উপর এসে পড়েছে এবং তার সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। মেয়েটির বয়স হবে আঠারো কি উনিশ।

ঘরের আর একদিকে মেঝের উপরে উবু হয়ে বসে, দুই হাতে মুখ ঢেকে উড়ে বেয়ারাটা তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মেয়েটি প্রথমেই আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'ও লোকটি অমন করে কাঁদছে কেন?'

রূপলাল হাসতে হাসতে বললে, 'ওর ধারণা আপনি একটি নিখুঁত পেত্নী!'

মেয়েটি চমকে উঠল। তারপর মুখের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে বললে, 'আমায় কি পেত্নীর মত দেখতে? কিন্তু সে কথা থাক্, বড় বিপদ থেকেই আপনারা আমায় উদ্ধার করলেন!'

তার বিপদের ইতিহাস হচ্ছে এই। সে খণ্ডগিরি দেখতে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি আসাতে এতক্ষণ সে একটা গুহার ভিতরে ঢুকে আত্মরক্ষা করছিল। হয়ত সেই গুহার ভিতরেই সে রাতটা কাটিয়ে

দিত, কিন্তু গুহার খুব কাছেই বাঘের ভীষণ গর্জন শুনে প্রাণের ভয়ে সে এখানে পালিয়ে এসেছে।

রূপলাল নিজের সিল্কের চাদরখানা খুলে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললে 'আপনার কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেছে। পাশের ঘরে গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে আপাতত এই চাদরখানা ব্যবহার করতে পারেন। ...কিন্তু আজ রাতে খাবেন কি? আমাদের তো খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে।'

মেয়েটি পাশের ঘরে যেতে যেতে বললে, 'এক রাত না খেলে কেউ মরে না।'

॥ ৩ ॥

আমি ও রূপলাল আলোর শিখাটা খুব কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। বন্দুকটাকে শুইয়ে রাখলুম ঠিক আমাদের মাঝে।

শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলুম বন-জঙ্গলের উপরে, পাহাড়ের উপরে বৃষ্টি-বালার অশ্রান্ত নৃত্য-নূপুরধ্বনি।

রূপলাল আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'আচ্ছা ভাই, ওই মেয়েটির ইতিহাস কি তোমার কাছে একটু উদ্ভট বলে মনে হল না?'

আমি বললুম, 'কেন?'

রূপলাল বললে, 'ও মেয়েটি কে? ওর কি কোন অভিভাবক নেই? অত বড় মেয়েকে কেউ কি একলা এই বিদেশে ছেড়ে দেয়? ওর মাথায় সিঁদুর নেই, গায়েও একখানা গয়না নেই, ওর সবই যেন কেমন রহস্যময়!'

আমি পাশ ফিরে শুয়ে বললুম, 'ওই সব বাজে কথা ভেবে তুমি মাথা গরম করতে থাকো, ততক্ষণে আমি এক ঘুম ঘুমিয়ে নি।'

আমার যখন বেশ তন্দ্রা আসছে তখন শুনলুম, রূপলাল আপন মনে বলছে, 'অমন সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু তার চোখ দুটো কি তীক্ষ্ণ! ওর চোখ দুটো যেন ওর নিজের চোখ নয়, যেন কোন হিংস্র জন্তুর চোখ!'

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না। হঠাৎ কি একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলুম। তারপর চোখ খুলেই যে দৃশ্য দেখলুম সারা জীবনে কোনদিন তা ভুলতে পারব না।

এ-ঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজার দিকে পিছন করে মাটির উপরে স্থিরভাবে বসে আছে প্রকাণ্ড একটা বাঘ!

আমার বুকের গতি হঠাৎ যেন থেমে গেল। অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে স্তম্ভিত নেত্রে বাঘটার দিকে তাকিয়ে রইলুম, সেও তাকিয়ে রইল আমার দিকে। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ইতিমধ্যে অল্পে-অল্পে হাত সরিয়ে পাশের বন্দুকটা আমি চেপে ধরলুম।

বাঘটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ল লাফ মারবার জন্যে।

চোখের নিমেষে আমিও বন্দুকটা নিয়ে উঠে বসলুম এবং তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম।

একটা উলটো ডিগবাজি খেয়ে বাঘটা পাশের ঘরে গিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-কণ্ঠে বারবার ভীষণ আর্তনাদ! দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ! দ্রুত পদধ্বনি! তারপরে সব আবার স্তব্ধ!

বন্দুক হাতে করে অভিভূতের মত বিছানার উপরে বসে রইলুম,—রূপলাল জেগে বিছানার উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠল, 'কে চেঁচালে অমন করে? বন্দুক ছুঁড়লে কেন?'

আমি বললুম, 'বাঘ, বাঘ! এখন ও-ঘরে গিয়ে ঢুকেছে! সেই মেয়েটি চিৎকার করছে!'

—'সর্বনাশ! বাঘ বোধহয় তাকেই ধরেছে'—বলতে বলতে বেগে

রূপলাল পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। আমিও বন্দুক আর লণ্ঠনটা নিয়ে তার সঙ্গে ছুটলুম।

পাশের ঘরে কেউ নেই। খালি একটা খোলা দরজা দিয়ে হু-হু করে জোলো হাওয়া আসছে।

রূপলাল বেদনা-বিদীর্ণ স্বরে বললে, 'আর কোন আশা নেই। অভাগী শেষটা সেই বাঘের কবলেই গিয়ে পড়ল! কিন্তু বাঘ এখানে এল কেমন করে?'

রূপলালের কথার কোন জবাব দিলুম না। আমি তখন আর একটা ব্যাপার সবিস্ময়ে লক্ষ করছিলুম। ঘরের ভিতর থেকে একটা একটানা রক্তের রেখা বাহিরের দিকে সোজা চলে গিয়েছে। পরে পরে একখানা করে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ। মানুষের পা!

সবিস্ময়ে বললুম, 'দেখ রূপলাল, দেখ! কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

রূপলাল অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর থেমে থেমে ধীরে ধীরে বললে, 'এত রক্ত, কিন্তু একটাও বাঘের পায়ের দাগ নেই কেন? এ পায়ের দাগগুলো দেখলে মনে হয়, যেন কোন মানুষের একখানা পা আহত হয়েছে আর সেই আহত পায়ের রক্ত ছড়াতে ছড়াতে সে এ-ঘর থেকে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। বাঘ যদি সেই মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যেত তা'হলে তাকে মুখে করে টেনে-হিঁচড়েই নিয়ে যেত, আর তা'হলে এখানে কখনই এমন পায়ের ছাপ পড়তো না।'

সেই রক্তের দাগ ধরে আমরা বাইরে বেরিয়ে গেলুম।

এবারে দেখলুম কাদার উপর দিয়ে একজোড়া মানুষের পায়ের ছাপ বরাবর বনের দিকে চলে গিয়েছে।

রূপলাল মাথা নেড়ে বললে, 'তুমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছ নিশ্চয়। সেই মেয়েটি আবার পালিয়েছে, বাঘ-টাঘ কিছুই এখানে আসেনি!'

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'আমি নিজের চোখে বাঘ দেখেছি, নিজের হাতে গুলি করেছি, আর সে নিশ্চয় আহত হয়েছে!'

রূপলাল বললে, 'তোমার গুলি খেয়ে বাঘ কি পাখি হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল? দরজার সামনে এই কাদামাটি, কিন্তু এখানে বাঘের পায়ের দাগ কোথায়? ঘরের ভিতরে মেয়েটি ছিল, কেবল সেই-ই যে বেরিয়ে গেছে তার স্পষ্ট চিহ্ন কাদার উপরে রয়েছে! কোন বাঘ ঘর থেকে বেরোয়নি! আমার বোধ হয় তোমার গুলিতে সেই মেয়েটি আহত হয়ে পালিয়ে গেছে!'

হঠাৎ একটা বিচিত্র সম্ভাবনা আমার মাথার ভিতরে জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি রূপলালকে টানতে টানতে আবার ঘরের ভিতরে এনে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সভয়ে আমি বললুম, 'রূপলাল, রূপলাল! পৃথিবীর সব দেশের লোকেরই একটা বিশ্বাস আছে, কোন কোন বাঘ নাকি আসলে বাঘ নয়! রূপলাল, আজ রাত্রে যে স্ত্রীলোকটা এখানে এসেছিল, সে কে? গুলি করলুম বাঘকে, চিৎকার করলে একটা স্ত্রীলোক! এর মানে কি?—সে কে? সে কে?'

রূপলাল অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও তা'হলে ওই উড়ে বেয়ারাটার কথাই সত্যি?'

মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরী

॥ ১ ॥

আমি ঔপন্যাসিক। কেবল এইটুকু বললেই সব বলা হয় না, আমি উপন্যাস লিখে টাকা রোজগার করি—অর্থাৎ আমি যদি উপন্যাস না লিখি তা'হলে আমার পেটও চলবে না। অর্থাৎ উপন্যাস লেখা হচ্ছে আমার পেশা।

কিন্তু এ পেশা বুঝি আর চলে না। বাড়িতে রোজ এত লোকের ভিড়—মাসিকপত্রের সম্পাদকের তাগাদা, চেনা-অচেনা লোকের আনাগোনা, বন্ধুবান্ধবদের তাস-দাবার আড্ডা, এই সব সামলাতে সামলাতেই প্রতিদিন কেটে যায়। যখন একলা হবার সময় পাই তখন আসে ঘুমের সময়।

কাজেই কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছাড়তে হল। স্থির করলুম অন্তত একখানা উপন্যাস না লিখে আর কলকাতায় ফিরব না। বিদেশে নিশ্চয়ই বাসায় এত চেনা-অচেনা লোকের ভিড় হবে না।

সিধে চলে গেলুম ঝাঁঝা জংশনে। একখানি ছোটখাটো বাংলো ভাড়া নিলুম। সকালে ও বিকালে বেড়িয়ে বেড়াই, দুপুর ও সন্ধ্যা বেলাটা কেটে যায় উপন্যাস লেখায়।

ভিড়ের ভয়ে বিদেশে পালিয়ে এলেও মানুষের সঙ্গ বিনা মানুষের প্রাণ বাঁচে না। ঝাঁঝায় এসেও তিন-চারজন লোকের সঙ্গে আমার

অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা হল। একজন হচ্ছেন মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরী। তিনি বিধবা। তাঁর স্বামী পেশোয়ারে কাজ করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি ঝাঁঝায় এসে বাস করছেন। তাঁর সন্তানাদি কেউ নেই। ধর্মে তিনি খ্রীষ্টান।

আমার আর একজন নতুন বন্ধুর নাম অমূল্যবাবু। এ ভদ্রলোকের বয়স হবে বছর পঞ্চাশ। কলকাতার কোন কলেজে প্রোফেসারি করতেন, এখন অবকাশ নিয়ে এইখানে বসেই লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটিয়ে দেন। অমূল্যবাবু পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে সারাজীবনই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, মৃত্যুর পরে জীবের কি অবস্থা হয় তাঁর মুখে সর্বদাই সে কথা শুনতে পাওয়া যায়।

এখানকার রেলের ডাক্তার গোবিন্দবাবুর সঙ্গেও আলাপ হল। তিনি খুব সাদাসিধে ভালোমানুষ লোক এবং সন্ধ্যা হলেই ভূতের ভয়ে কাতর হয়ে পড়েন। সূর্যাস্তের পর তিনি প্রাণান্তেও অমূল্যবাবুর বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে রাজী হন না, কারণ পাছে তাঁকে কাছে পেয়ে অমূল্যবাবু দু'চারটে পরলোকের কাহিনী শুনিয়ে দেন।

॥ ২ ॥

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি অমূল্যবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিলুম। কথা হচ্ছিল পৃথিবীতে সত্য সত্যই পিশাচের অস্তিত্ব আছে কিনা?

অমূল্যবাবুর বিশ্বাস, পৃথিবীতে সেকালেও পিশাচ ছিল, একালেও আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'পিশাচ কাকে বলে?'

অমূল্যবাবু বললেন, 'প্রেতাত্মাদের আমাদের মত দেহ নেই— একথা তুমি জানো। দেহ না থাকলেও দুষ্ট প্রেতাত্মাদের আকাঙ্ক্ষা

প্রায়ই প্রবল হয়ে থাকে। কিন্তু দেহের অভাবে তারা সে আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না। তাই অনেক সময় দুষ্ট প্রেতাত্মারা মানুষের অরক্ষিত মৃতদেহের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন সেই মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠে জীবিত মানুষদের ধরে রক্তশোষণ করে। এই জীবন্ত মৃতদেহগুলোই পিশাচ নামে খ্যাত।'

অমূল্যবাবু এমন দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলি বললেন যে, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমি বললুম, 'প্রায়ই শুনতে পাই অমুক লোক রক্তস্বল্পতা রোগে মারা গিয়েছে। আপনি কি বলতে চান যে পিশাচরাই তাদের মৃত্যুর কারণ?'

অমূল্যবাবু বললেন, 'অনেক সময় হতেও পারে, অনেক সময় নাও হতে পারে।'

ঠিক এই সময়ই মিসেস্ কুমুদিনী অমূল্যবাবুর বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'কিসের গল্প হচ্ছে?'

আমি বললুম, 'অমূল্যবাবু আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন।'

কুমুদিনী একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললেন, 'ও, ভূতের গল্প বুঝি? বেশ, বেশ, ভূতের গল্প শুনে ভয় পেতে আমি ভালোবাসি! অমূল্যবাবু, আমাকে একটা ভয়ানক ভূতের গল্প বলুন না!'

অমূল্যবাবু বললেন, 'ভয়ানক ভূত কাকে বলে আমি তো জানি না। তবে আজ আমি পিশাচের গল্প করছিলুম বটে।'

কুমুদিনী খানিকক্ষণ নীরবে অমূল্যবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আচ্ছা অমূল্যবাবু, পিশাচের কথা সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন কি?'

অমূল্যবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সত্যি বিশ্বাস করি। খালি তাই নয়, আমার ধারণা সম্প্রতি এই ঝাঁঝাতেই বোধহয় পিশাচের উপদ্রব শুরু হয়েছে।'

আমি সচমকে অমূল্যবাবুর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালুম।

কুমুদিনীরও মুখ ভয়ে ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু সে-ভাবটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার এমন গাঁজাখুরি ধারণার কারণ কি শুনি?'

অমূল্যবাবু স্থিরভাবেই বললেন, 'সম্প্রতি এখানে রক্তস্বল্পতা রোগে মৃত্যুর হার বড় বেড়ে উঠেছে। এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।'

কুমুদিনী উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেশ তো অমূল্যবাবু, আপনি একটা পিশাচকে বন্দী করবার চেষ্টা করুন না!'

অমূল্যবাবু শুষ্কস্বরে বললেন, 'হুঁ। সেই চেষ্টাই করব।'

ভূত না মানলেও ভূতের ভয় যে ছাড়ে না, অমূল্যবাবুর ওখান থেকে সেদিন আসতে আসতে সে প্রমাণটা ভালো করেই পেলুম। সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রত্যেক আনাচে-কানাচে মনে হতে লাগল, যেন সত্য সত্যই কোন জীবন্ত মৃতদেহ আমার দিকে লক্ষ স্থির করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে!

॥ ৩ ॥

অমূল্যবাবু প্রতিদিন সকালে আমার বাসায় এসে চা পান করতেন।

সেদিন সকালেও বাংলোর বারান্দায় বসে আমরা দুজনে চা পান করছি, এমন সময়ে দেখলুম সামনের পথ দিয়ে ডাক্তার গোবিন্দবাবু কোথায় যাচ্ছেন।

আমি চেঁচিয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা পান করবার জন্যে আহ্বান করলুম।

গোবিন্দবাবু কাছে এসে বললেন, 'চা পান করতে আমি রাজী আছি, কিন্তু ভায়া, শীগগির! আমার একটুও দেরি করবার সময় নেই।'

আমি বললুম, 'কেন, আপনার এত তাড়াতাড়ি কিসের?'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরীর মালীর ছেলের ভারী অসুখ! বোধহয় বাঁচবে না।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি অসুখ?'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'রক্তস্বল্পতা—অর্থাৎ অ্যানিমিয়া।'

অমূল্যবাবু চা পান করতে করতে হঠাৎ পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'ডাক্তার, ঝাঁঝায় এত অ্যানিমিয়ার বাড়াবাড়ির কারণ কি বলতে পারো?'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'না। কিন্তু এই রোগের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি!'

অমূল্যবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরীর মালীর ছেলেকে আমি জানি। তার নাম গদাধর, সে রোজ আমাকে ফুল দিয়ে যায়। তিনদিন আগেও তাকে আমি দেখেছি, জোয়ান সোমত্ত ছেলে! আর তুমি বলছ ডাক্তার, এরই মধ্যে তার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে! অ্যানিমিয়া রোগে এত তাড়াতাড়ি কারুর অবস্থা খারাপ হয় না। চল ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমরাও গিয়ে গদাধরকে একবার দেখে আসি।'

আমার বাংলো থেকে মিসেস্ চৌধুরীর বাংলোয় যেতে চার পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। মিসেস্ চৌধুরীর বাগানের এক কোণে মালীর ঘর। আমরা সকলে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলুম।

ঘরের ভিতরে একপাশে বুড়ো মালী মাথায় হাত দিয়ে ম্লানমুখে বসে আছে। গদাধর শুয়ে আছে একখানা চৌকির উপরে। তার মুখ এমন বিবর্ণ ও রক্তশূন্য যে দেখলেই মনে হয়, মৃত্যুর আর বেশী দেরি নেই।

ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে চুপি চুপি আমাদের বললেন, 'আজকের রাত বোধহয় কাটবে না।'

অমূল্যবাবু গদাধরের পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর রোগীর গায়ের কাপড়টা খুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কি দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে গদাধরের গলা ও বুকের মাঝখানে একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, 'ডাক্তার, এটা কিসের দাগ?'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'ওটা ক্ষতচিহ্ন বলেই মনে হচ্ছে। যা নোংরা ঘর, ইঁদুর-টিঁদুর কামড়েছে বোধহয়!'

অমূল্যবাবু গদাধরের বাপকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছেলেকে সেবা করে কে?'

বুড়ো মালী বললে, 'বাবু, গিন্নীমা (অর্থাৎ মিসেস্ চৌধুরী) গদাধরকে বড় ভালোবাসেন, ঠিক নিজের ছেলের মতন। ওকে দেখা-শুনো করেন তিনিই, ওর জন্যে দিনে তাঁর বিশ্রাম নেই রাতে তাঁর ঘুম নেই!'

অমূল্যবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, 'রোগীর ভালোরকম যত্ন-সেবা হচ্ছে না। গদাধরকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাব! ডাক্তার, তোমার রেলের দু-চারজন কুলিকে ডাকো, গদাধরকে তারা এখনি আমার বাড়িতে নিয়ে চলুক। আমার বিশ্বাস একে আমি নিশ্চয় বাঁচাতে পারব!'

অমূল্যবাবুর এই অদ্ভুত বিশ্বাসের কারণ কি আমরা বুঝতে পারলুম না। রোগ হয়েছে রোগীর দেহে, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি নিয়ে গেলে তার কি উপকার হতে পারে? যাক্, কথামতই কাজ করা হল।

গদাধরকে যখন বাগানের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই সময় মিসেস্ কুমুদিনী তাঁর বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে নেমে এসে তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, 'একি ব্যাপার, গদাধরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

অমূল্যবাবু বললেন, 'আমার বাড়িতে। এখানে ওর ঠিকমত সেবা আর চিকিৎসা হচ্ছে না।'

কুমুদিনীর দুই চোখে একটা ক্রোধের ভাব ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'বেশ, আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন। গদাধর আরাম হলে আমার চেয়ে খুশী আর কেউ হবে না।'

॥ ৪ ॥

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। গাছপালার আর্তনাদ ও মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপর থেকে হুড়হুড় করে বৃষ্টি ধারা নেমে আসার শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

অনেক রাতে আচম্বিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসে মনে হল, জানলার শার্সির উপরে বাইরে থেকে কে যেন ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ করছে!

প্রথমটা ভাবলুম আমারই মনের ভুল। বাইরে তখনো সমান তোড়ে বৃষ্টি ঝরছে, বাজ ডাকছে ও ঝড় হৈ-হৈ করছে, এমন দুর্যোগে শার্সির উপরে করাঘাত করতে আসবে কে?

হয়ত ঝোড়ো-হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকতে চায়!

আবার বিছানার উপরে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তখনই শার্সির উপরে আবার শব্দ হল—ঠক্ ঠক্ ঠক্। ঠক্ ঠক্ ঠক্। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

সবিস্ময়ে বিছানার উপর থেকে লাফিয়ে পড়লুম! আর তো কোনই সন্দেহ নেই! কে এল? এই বন-জঙ্গল-পাহাড়ের দেশে এই ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকারে কে আমার ঘরের ভিতর ঢুকতে চায়?

অজানা বিদেশে বলে শোবার সময় বালিশের তলায় রোজই

একটা 'টর্চ' রেখে দিতুম। টপ্ করে 'টর্চ'টা তুলে নিয়েই জ্বেলে জানলার উপরে আলোটা ফেললুম! সেই তীব্র আলোকে দেখলুম, বন্ধ শার্সির উপরে দুই হাত ও মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি! ঝোড়ো হাওয়ায় রাশি রাশি কালো কালো লম্বা চুল এসে তার সারা মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং সেই চুলের ফাঁকে ফাঁকে আগুনের মতন দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে তার দুটো বিস্ফারিত চক্ষু!

পরমুহূর্তে মুখখানা আলোক-রেখার ভিতর থেকে সাঁৎ করে সরে গেল!

এ কী দুঃস্বপ্ন! ভয়ে মুষড়ে আলো নিবিয়ে বিছানার উপরে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লুম!

আতঙ্কে সারারাত আর ঘুম হল না। কেবলই মনে হতে লাগল, শার্সির কাঁচ ভেঙে ওই বুঝি এক অমানুষিক মূর্তি ঘরের ভিতরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে!

॥ ৫ ॥

জানলা দিয়ে সকালের আলো ঘরের ভিতর এসে পড়েছে, কিন্তু তখনো আমি জড়ভরতের মত বিছানার উপরে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। এমন সময় বাইরে থেকে শুনলুম আমার নাম ধরে ডাকছেন অমূল্য-বাবু। আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম।

অমূল্যবাবু ঘরের ভিতরে এলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত ভোরে আপনি যে! গদাধরের অসুখ বেড়েছে নাকি?'

অমূল্যবাবু বিছানার উপর উঠে বসে হাসিমুখে বললেন, 'অসুখ বেড়েছে কি, এই অল্প সময়েই গদাধর প্রায় সেরে উঠেছে!

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'বলেন কি ! কি করে সারল ?'

অমূল্যবাবু বললেন, 'গদাধরের কোন অসুখ তো হয়নি, সে পড়েছিল পিশাচের পাল্লায় !'

চেষ্টা করেও আমি হাসি থামাতে পারলুম না। কৌতুকভরে বললুম, 'আপনি কি চারিদিকেই এখন পিশাচের স্বপ্ন দেখছেন ?'

অমূল্যবাবু অটলভাবেই বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা হয় বল, আমি কোনই প্রতিবাদ করব না। গদাধর কেন বেঁচেছে জানো ? কাল দিনরাত তার শিয়রে বসে আমি পাহারা দিয়েছি বলে। কারুকে তার ত্রিসীমানায় আসতে দিইনি ! কাল রাতে আবার কেউ যদি তার রক্ত-শোষণ করত, তা হলে আজ আর তাকে জীবিত দেখতে পেতে না।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'রক্তশোষণ ! অমূল্যবাবু, কী আপনি বলছেন ? কে তার রক্তশোষণ করত ?'

অমূল্যবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার ও-কথার কোন জবাব আগে আমি দেব না। কাল রাতে আমি স্বচক্ষে কি দেখেছি তোমার কাছে আগে সেই কথাই বলতে চাই। তুমি জানো, আমার বাড়ি দোতলা। গদাধরকে আমি দোতলার ঘরেই শুইয়ে রেখেছিলুম। পাহারা দেবার জন্যে তার পাশে বসে কাল সারারাত আমি কাটিয়ে দিয়েছি। কালকের রাতের ঝড়-বৃষ্টির কথা তুমিও টের পেয়েছ বোধহয়। মাঝরাত্রে ঝড়-বৃষ্টির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। সেই সময় বই পড়তে পড়তে হঠাৎ আমি মুখ তুলে দেখি, জানলার ঠিক বাইরেই একটা স্ত্রী-মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দোতলার ঘর, মাটি থেকে সেই জানলাটা অন্তত বিশ ফুট উঁচু, সেখানে কোন স্বাভাবিক মানুষের মূর্তির আবির্ভাব যে সম্ভবপর নয়, একথা তুমি বুঝতেই পারছ ! আমি অবাক হয়ে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। ঘরের আলো তার মুখের উপরে গিয়ে পড়েছিল, তাকে দেখেই আমি চিনতে পারলুম। কে সে, কিছু আন্দাজ করতে পারো ?'

আমি হতভম্বের মত ঘাড় নেড়ে জানালুম—না।

অমূল্যবাবু বললেন, 'সে মূর্তি হচ্ছে মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরীর। ···কুমুদিনী খুব হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ালুম। তারপর শার্সি খুলে খড়খড়ির পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলুম সজোরে! আমাকে বাধা দেবার জন্যে মূর্তিটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল—কিন্তু বাধা দিতে পারলে না। আমার মনে হল, জানলা বন্ধ করবার সময় তার ডান হাতখানা পাল্লার তলায় পড়ে চেপ্টে গেল! তারপরেও জানলার উপরে আরো কয়েকবার করাঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম, কিন্তু সেদিকে আমি আর ভ্রুক্ষেপও করলুম না। এখন বল, আমার কথা পাগলের গল্প বলে মনে হচ্ছে?'

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলুম, 'অমূল্যবাবু, অমূল্যবাবু! আপনি কী বলছেন! মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরী—'

অমূল্যবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'শোনো। টেলিগ্রামে আমি আর এক খবর আনিয়েছি। পেশোয়ারে মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরীর স্বামী মারা যান অ্যানিমিয়া রোগে। আর মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরীও তাঁর মৃত্যুর পনেরো দিন আগে দেহত্যাগ করেছেন!'

আমার সর্বশরীর কেমনধারা করতে লাগল, টেবিলের একটা কোণ ধরে তাড়াতাড়ি চেয়ারের উপরে বসে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে অমূল্যবাবুর কাছে আমিও কাল রাত্রে যা দেখেছি, সেই ঘটনাটা খুলে বললুম।

অমূল্যবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন।

ফিরে দেখলুম, বাংলোর সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে উঠলেন মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরী! তাঁকে দেখেই সর্বপ্রথমে আমার চোখ পড়ল তাঁর ডান হাতের দিকে। তাঁর ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা!

কুমুদিনীও আসতে আসতে অমূল্যবাবুকে আমার ঘরে দেখেই

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তাঁর মুখে-চোখে এমন একটা অমানুষিক বিশ্রী ভাব জেগে উঠল যা কোনদিন কোন মানুষেরই মুখে আমি লক্ষ্য করিনি !

তারপরেই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে তীরের মতন তিনি বারান্দার উপর থেকে নেমে গেলেন এবং সেই রকম বেগেই সামনের দিকে ছুটে চললেন।

আমি দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'মিসেস্ চৌধুরী সাবধান! ট্রেন, ট্রেন—'

কিন্তু আমার মুখের কথা মুখেই রইল; আমার বাংলোর সামনে দিয়ে যে রেলপথ চলে গেছে, কুমুদিনী তার উপরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, একখানা ইঞ্জিন হুড়মুড় করে একেবারে তাঁর দেহের উপর এসে পড়ল—

ভয়ে আমি দুই চোখ বুজে ফেললুম—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম তীক্ষ্ণ এক মর্মভেদী আর্তনাদ, তারপরেই সব স্তব্ধ!

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে রইলুম, আমার চারিদিকে পৃথিবী যেন ঘুরতে লাগল এবং সেই অবস্থাতেই শুনলুম অমূল্যবাবু বলেছেন, 'স্থির হও ভাই, স্থির হও! ট্রেনে যে চাপা পড়ল, ও কোন মানুষের দেহ নয়, ও হচ্ছে কোন পিশাচের আশ্রিত দেহ!'

॥ ৬ ॥

ঝাঁঝার গোরস্থানে মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরীর দেহ কবর দেওয়া হল।

তারপর মাসখানেক কেটে গেল। এই ভীষণ ঘটনার ছাপ আমাদেরও মনের উপর থেকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটা বিষয় সম্বন্ধে এখনো আমাদের মনের ধাঁধা ঘুচল না।

ঝাঁঝায় রক্তস্বল্পতা রোগের বাড়াবাড়ি এখনো কমলো না কেন, তাই নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

অমূল্যবাবু পর্যন্ত ধাঁধায় পড়ে গেছেন। তিনিও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'তাই তো হে, রক্তস্বল্পতা রোগটা এখানে সংক্রামক হয়ে দাঁড়াল নাকি? এর কারণ তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!'

কিছুদিন পরে একদিন নদীর ধার থেকে ফিরতে আমার রাত হয়ে গেল। সে রাতটা ছিল চমৎকার, পরিপূর্ণ পূর্ণিমা নদীর জলকে যেন মেজে-ঘষে রূপোর মত চকচকে করে তুলেছে এবং চারিদিক ধব্-ধব্ করছে প্রায় দিনের বেলার মত। এই পূর্ণিমার শোভা দেখবার জন্যেই এতক্ষণ আমি নদীর ধারে অপেক্ষা করছিলুম।

বিভোর হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বাসার পথে ফিরে আসছি। গভীর স্তব্ধতার ভিতরে ঝিল্লীরব ছাড়া আর কোন কিছুরই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পথও একান্ত নির্জন।

প্রাণে হঠাৎ গান গাইবার সাধ হল—এমন রাতের সৃষ্টি তো গান গাইবার জন্যেই!

কিন্তু গান গাইবার উপক্রম করতেই সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল!

পথের একটা মোড় ফিরে প্রায় আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরী!

আমার দেখবার কোন ভ্রম হয়নি, তেমন উজ্জ্বল পূর্ণিমায় ভ্রম হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

ভাগ্যে কুমুদিনী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাই আমাকে তিনি দেখতে পেলেন না। আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে সরে গেলুম।

কুমুদিনী সেই পথ ধরে একদিকে অগ্রসর হলেন, আমি স্তম্ভিত নেত্রে লক্ষ্য করলুম, তাঁর দেহ যেন মাটির উপর দিয়ে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে না—শূন্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একখানা মেঘের মতন!

পথের বাঁকে সেই অদ্ভুত ও ভীষণ মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং আমিও ছুটতে লাগলুম রুদ্ধশ্বাসে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে!

ছুটতে ছুটতে একেবারে অমূল্যবাবুর বাড়িতে! অমূল্যবাবু বৈঠকখানায় একলা বসে বই পড়ছিলেন, হঠাৎ আমাকে সেইভাবে সেখানে গিয়ে পড়তে দেখে নির্বাক বিস্ময়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন।

আমি প্রায়-রুদ্ধস্বরে বলে উঠলুম,—'মিসেস্ চৌধুরী, মিসেস্ চৌধুরী! অমূল্যবাবু, এইমাত্র মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হল!'

অমূল্যবাবু সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'তার মানে?'

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'নদীর পথ দিয়ে ফিরে আসছিলুম, মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরী প্রায় আমার পাশ দিয়ে এইমাত্র চলে গেলেন।'

—'তুমি ঠিক দেখেছ?'

—'আপনাকে যেমন ঠিক দেখছি, তাঁকেও ঠিক তেমনি দেখেছি।'

—'ওঠো, ওঠো! আর দেরি নয়, এখনি আমার সঙ্গে চল। এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।'

অমূল্যবাবু হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বাগানের কোণ থেকে একটা শাবল ও একখানা কোদাল তুলে নিয়ে কোদালখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এস!' আমি যন্ত্রচালিতের মতন তাঁর সঙ্গে চললুম।

আবার সেই নদীর পথ। চারিদিক তেমনি নীরব ও নির্জন, আকাশে তেমনি স্বপ্নময় চাঁদের হাসি। নিবিড় বনজঙ্গল ও পাহাড়ের পর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে যেন ছবিতে আঁকা। কিন্তু সে সব দৃশ্য দেখবার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না, আমার প্রাণ থেকে সমস্ত কবিত্ব তখন কর্পূরের মতন উবে গিয়েছিল। ঘাসের উপরে বড় বড় গাছের ছায়া নড়ছে আর আমি চমকে চমকে উঠছি। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা পেঁচা চেঁচিয়ে উঠল, শিউরে উঠে আমি ভাবলুম, ঝোপে-ঝাপে আড়ালে-আবছায়ায় যে-সব অশরীরী দুষ্ট আত্মা রক্ত-তৃষায় উন্মুখ হয়ে আছে, ওই নিশাচর পাখিটা যেন তাদেরই সাবধান করে জানিয়ে দিলে—তোমরা প্রস্তুত হও, পৃথিবীর শরীরী প্রাণী আসছে।

ওই তো ঝাঁঝার গোরস্থান! কবরের পর কবর সারি সারি দেখা যাচ্ছে, তাদের উপরে ইটের বা পাথরের গাঁথুনি। পাশ থেকে নদীর জলের তান ভেসে আসছে অশ্রান্ত তালে। আমার মনে হল, এতক্ষণ ওই সব কবরের পাথরের উপরে যে-সব ছায়াদেহ বসে বসে রাত্রিযাপন করছিল, আচম্বিতে জীবিত মানুষের আবির্ভাবে অন্তরালে গিয়ে নদীর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে তারা ভয়াবহ কানাকানি করছে!

একটা ঝোপের ভিতরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে অমূল্যবাবু বললেন, 'এইখানে স্থির হয়ে লুকিয়ে বসে থাকি এস। সাবধান, কোন কথা কোয়ো না।'

সারারাত সেইখানে আড়ষ্ট হয়ে দুজনে বসে রইলুম। সেদিনকার সে-রাতটাকে আর পৃথিবীর রাত বলে মনে হল না, ইহলোকে থেকেও আমরা যেন পরলোকের বাসিন্দা হয়েছি!

চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে। পূর্বদিকে ধীরে ধীরে যেন মৃত রাত্রির বুকের রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। ভোর হচ্ছে।

হঠাৎ অমূল্যবাবু আমার গা টিপলেন। চমকে ফিরে দেখি, নিবিড় বনের ভিতর থেকে মেঘের মত গতিতে এক অপার্থিব নারী-মূর্তি বাইরে বেরিয়ে আসছে—মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরী!

অমূল্যবাবু আমার কানে কানে বললেন, 'আজকের রাতের মত পিশাচীর রক্তপিপাসা শান্ত হল।'

মিসেস্ চৌধুরীর দেহ ধীরে ধীরে গোরস্থানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একটা কবরের উপরে গিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আচমকা শূন্যে দুই হাত তুলে এমন প্রচণ্ড তীক্ষ্ণস্বরে হী-হী-হী-হী-হী-হী-হী-হী করে অট্টহাস্য করে উঠল যে আমার সমস্ত বুকটা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল! সে কী পৈশাচিক শীতল হাসি! ······তারপর দেখলুম, তার দেহটা ধীরে ধীরে মাটির ভিতরে নেমে যাচ্ছে! খানিক পরেই সে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল!

পূর্ব-আকাশে সূর্যের প্রথম ছটা জেগে উঠল। অমূল্যবাবু এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আর অপেক্ষা নয়! শীগগির আমার সঙ্গে এস!'

আমরা মিসেস্ চৌধুরীর কবরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। অমূল্য-বাবু বললেন, 'আমি শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ি আর তুমি কোদাল দিয়ে মাটি তোলো!'

তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করলুম না, কারণ আমি তখন আচ্ছন্নের মত ছিলুম। তিনি যা বলেন, আমি তাই করি।

অল্পক্ষণ পরেই কফিনটা দেখা গেল। অমূল্যবাবু বললেন, 'দেখ, এইবারে আমি কফিনের ডালাটা খুলব তারপর আমি যা করব তুমি তাতে আমাকে বাধা দিও না। খালি এইটুকু মনে রেখো, কফিনের ভেতরে যে দেহ আছে তা কোন মানুষের দেহ নয়!'

অমূল্যবাবু দুই হাতে টেনে কফিনের ডালাটা খুলে ফেললেন। আমি স্তম্ভিত চক্ষে দেখলুম কফিনের ভিতর শুয়ে আছে মিসেস্ চৌধুরীর পরিপূর্ণ দেহ! সে দেহ দেখলে মনে হয় না তা কোন দিন ট্রেনে কাটা পড়েছিল! সেটা একমাস আগে কবর দেওয়া কোন গলিত মৃতদেহও নয়! তার তাজা মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল, তার ওষ্ঠাধরের চারপাশে তরল রক্তধারা লেগে রয়েছে এবং তার জীবন্ত চোখ দুটো সহাস্য দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে!

অমূল্যবাবু দুই হাতে শাবলটা হঠাৎ মাথার উপরে তুলে ধরলেন, তারপর সজোরে ও সবেগে শাবলটা মৃতদেহের বুকের উপরে বসিয়ে দিলেন!

ইঞ্জিনের বাঁশীর আওয়াজের মত এক তীব্র দীর্ঘ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারপর সব চুপচাপ।

চিলের ছাতের ঘর

॥ ১ ॥

আমার ছেলেবেলার বন্ধু মানিক। সেবারে মানিক তার বাড়ির আর সকলকার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিল, জায়গাটার নাম না হয় আর বললুম না।

কিছুদিন পরে মানিকের কাছ থেকে এই চিঠিখানি পেলুম,—

ভাই অমল,

তোমার জন্যে বড় মন কেমন করছে,—কারণ এ-দেশটা এত সুন্দর যে, তোমাকে না দেখালে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না।

যে-বাড়িতে আছি, সেখানিও চমৎকার। একদিকে ধু-ধু মাঠ, দু'দিকে নিবিড় বনের রেখা এবং আর একদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় ও তাদের কোল দিয়ে নাচতে নাচতে বয়ে যাচ্ছে একটি রূপোলী নদী।

তুমি আজকেই মোটঘাট বেঁধে নিয়ে রওনা হও। আমাদের চিলের-ছাতের ঘর থেকে চারিদিকের দৃশ্য খুব স্পষ্ট দেখা যায়। তুমি কবি বলে মা তোমার জন্যে এই ঘরখানি 'রিজার্ভ' করে রেখেছেন।

আসতে দেরি হলে জরিমানা দিতে হবে। এখানকার খবর সব ভালো। ইতি

তোমার মানিক

মানিকের মা আমাকে খুব 'কম্প্লিমেণ্ট' দিয়েছেন—আমি নাকি কবি! বাংলাদেশে কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় কিনা! সুতরাং এত বড় একটা উপাধি লাভের পরেও মানিকের আমন্ত্রণ রক্ষা না করলে খুবই একটা অকৃতজ্ঞতার কাজ করা হবে! অতএব মোট-ঘাট বাঁধতে শুরু করলুম।

॥ ২ ॥

মানিকের বাড়িতে এসে উঠেছি।

বাড়িখানি পুরানো হলেও প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড এবং দেখতেও পরমসুন্দর। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত এক বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়ে সেই উঁচু বাড়িখানা প্রত্যেক পথিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এদিকে-ওদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে প্রথম যখন অমলের সঙ্গে বাগানের পথ দিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলুম, হঠাৎ একদিকে আমার চোখ পড়ল। বিলাতি 'পাম' গাছ দিয়ে ঘেরা এক টুকরো জমির ভিতরে ছোট্ট একটা স্মৃতিস্তম্ভের মত কি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওটা কি মানিক?'

মানিক বললে, 'কবর।'

—'কবর!'

—'হ্যাঁ। এ বাড়িখানা আগে এক সায়েবের ছিল। তার মেম মারা গেলে পর তাকে এইখানেই কবর দেওয়া হয়।'

এমন সময় মানিকের কুকুর 'লিলি' মনিবের সাড়া পেয়ে সেইখানে এসে হাজির হল। তারপরেই রেগে গরর-গরর করতে লাগল! দেখলুম, সে কবরের দিকে তাকিয়ে গর্জন করছে। কিন্তু কবরের দিকে তাকিয়ে আমি তো কিছুই দেখতে পেলুম না।

বললুম, 'মানিক, তোমার কুকুর কি দেখে ক্ষেপে গেল ?'

মানিক বললে, 'জানি না। লিলি ঐ কবরটাকে দেখলেই ক্ষেপে যায়,—যেন সে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে চায়।'

আমি বললুম, 'না মানিক, ও তো লড়াই করতে চায় বলে মনে হচ্ছে না,—ওকে দেখলে মনে হয়, ও যেন মহা-ভয়ে পাগল হয়ে গেছে।'

মানিক হেসে বললে, 'জাতে আর নামে বিলিতী হলেও লিলি আমাদের কাছে এসে হিন্দুধর্ম অবলম্বন করেছে। হিন্দুর বাড়িতে ক্রিশ্চানের কবর ও বোধহয় পছন্দ করে না।···কিন্তু ও-কথা এখন থাক। চল, তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকলুম। যেমন প্রকাণ্ড বাড়ি তেমনি মস্ত মস্ত ঘর। সে-সব ঘরের অবস্থা এখন ভালো নয়,—কোথাও চুন-বালি খসে পড়েছে, কোথাও মেঝে ছ্যাঁদা করে ইঁদুরেরা বড় বড় গর্ত বানিয়েছে, কোথাও কড়ি-কাঠ থেকে বাদুড়েরা দলে দলে ঝুলছে।

মানিক বললে, 'এ বাড়িখানা অনেক দিন খালি পড়েছিল। এই মেড়ুয়াদের দেশে কুসংস্কার বড় বেশী, বোধহয় ঐ কবরের ভয়েই এ-বাড়িখানা এতদিন কেউ ভাড়া নিতে চায় নি।'

আমি বললুম, 'বসত-বাড়িতে আমিও কবর-টবর পছন্দ করি না। জীবন আর মৃত্যুর কথা একসঙ্গে মনে পড়লে বেঁচে সুখ পাওয়া যায় না।'

মানিক বললে, 'আমরা কিন্তু আজ তিন হপ্তা ধরে এখানে খুব সুখে বাস করছি। ও কবর ফুঁড়ে উঠে কোনদিন কোন মেম-পত্নী আমাদের সঙ্গে গল্প করতে আসেনি।···নাও, এখন ওপরে উঠে তোমার ঘর দেখবে চল।'

চওড়া এক কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলুম। এক সময়ে এই সিঁড়ি যে দেখতে খুব চমৎকার ছিল, এখনো তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু আজ এ সিঁড়ি এমন জীর্ণ হয়ে গেছে যে, আমাদের পায়ের চাপে যন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করতে লাগল।

॥ ৩ ॥

চিলের ছাতের ঘর বলতে আমরা যা বুঝি, এখানি সে-রকম নয়—এ ঘরখানা নূতন ধরনের। এ-শ্রেণীর ঘর প্রায়ই খুব ছোট হয়, কিন্তু এ ঘরখানা বেশ বড়সড়। এর একদিকে কাঠের সিঁড়ি উপরে এসে উঠেছে এবং তার পরেই ঘরখানা শুরু হয়েছে। তিন দিকে সারি সারি বারোটা লম্বা-চওড়া জানলা ও ঘরের ম্যাটিংমোড়া মেঝের উপরে কতকগুলো পুরানো সোফা, কৌচ, চেয়ার, ড্রেসিং-টেবিল, ওয়াসিং স্ট্যাণ্ড ও একখানি মস্ত বড় লোহার খাট। সিঁড়ি ছেড়ে ঘরের মেঝেতে পা দিয়েই—কেন জানি না—আমার মনে হল, এ-জায়গাটা যেন খালি নয়, এখানে যেন কি একটা অদৃশ্য ও বীভৎস রহস্য একান্তে অনেক দিন ধরে গোপনে বাস করছে। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অজানা আতঙ্কে আমার সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যেন এখানে একটুও হাওয়া নেই, আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'মানিক, ঘরের জানলা-দরজাগুলো বন্ধ করে রেখেছ কেন? খুলে দাও, খুলে দাও।'

মানিক আমার কথামত কাজ করলে। বাহির থেকে খোলা আলো আর হাওয়া ঘরের ভিতর ছুটে এল শিশুর মত সকৌতুকে! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের সকল গ্লানি কেটে গেল!

একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখের উপরে ভেসে উঠল, অপূর্ব চিত্রপট!

প্রথমেই দেখলুম পাহাড়ের পর পাহাড়ের শিখর ক্রমেই উঁচু হয়ে আলোমাখা নীলাকাশের দিকে উঠে গেছে—যেন ভগবানের পূজার থালার মধ্যে নৈবেদ্যের সার সাজানো রয়েছে! তাদের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক গান-পাগলিনী, নৃত্যশীলা নদী! সেই কালো পাহাড়-

মালার তলার রৌদ্রদীপ্ত নদীটিকে দেখে মনে হচ্ছে, অচপল কাজল-মেঘের তলায় চঞ্চল বিদ্যুতের একটি চকচকে রেখা !

তারপরেই আবিষ্কার করলুম, আমার জন্যে নির্দিষ্ট এই ঘরের তলাতেই রয়েছে সেই কবরটা ! মনটা আবার খুঁতখুঁত করতে লাগল।

ফিরে বললুম, 'দেখ মানিক, এমন সুন্দর জায়গায় যে-সায়েবটি বাড়ি তৈরী করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি কবি ছিলেন। কিন্তু কবির চোখ পেয়েও এমন মনোরম স্থানে তিনি নিজের স্ত্রীর দেহকে গোর দিলেন কেন, সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না !'

মানিক বললে, 'এখানকার লোকেদের মুখে এক গাঁজাখুরি গল্প শুনেছি। মারা গেলে পর মেমের দেহকে নাকি প্রথমে গোরস্থানেই নিয়ে গিয়ে গোর দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরদিনই দেখা যায়, মড়াসুদ্ধ কফিনটা কবরের পাশে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে ! কফিনটাকে আবার গর্তে পুরে মাটি চাপা দেওয়া হল। কিন্তু পরদিন সকালে আবার সেই দৃশ্য ! উপরি-উপরি তিনবার এই দৃশ্যের অভিনয় হবার পর গোরস্থানের পাদ্রী বললেন, 'এই পাপীর দেহ গোরস্থান ধারণ করতে রাজী নয়। একে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হোক।' তখন সকলে বাধ্য হয়েই দেহটাকে এই বাড়ির ভিতরে এনে গোর দিলে। সেই থেকে 'পাপী' কবর থেকে আর পালাবার চেষ্টা করে নি।'

আমি বললুম, 'পাদ্রী-সায়েব মেমের দেহকে পাপীর দেহ বললেন কেন ?'

মানিক বললে, 'মেমটা নাকি আত্মহত্যা করেছিল !—কিন্তু আজগুবি গল্প আমি বিশ্বাস করি না—এ সব হচ্ছে বানানো কথা !'

॥ ৪ ॥

ঘরের চারিধারে চোখ বুলিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ-ঘরের এই পুরানো আসবাবগুলো কোত্থেকে এল ?'

মানিক বললে, 'আসবাবগুলো হচ্ছে সেই সায়েবের। তাঁর মেম এই ঘরেই বাস করত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আসবাবগুলো যেমন ছিল, তেমনি ভাবেই রেখে দিয়েছেন। আমাদেরও মানা করে দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন এ-ঘর থেকে কোন জিনিস না সরিয়ে রাখি।'

হঠাৎ খাটের ঠিক মাথার উপরেই দেওয়ালে-টাঙানো একখানা প্রকাণ্ড 'অয়েল-পেন্টিং'য়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। স্ত্রীলোকের ছবি। আসলে মানুষের দেহ যত বড় হয়, সেই আঁকা ছবির দেহটিও তার চেয়ে ছোট নয়।

শুধালুম, 'ও কার ছবি মানিক ?'

মানিক বললে, 'সেই মেমের। কাছে গিয়ে দেখ না, মেমটি দেখতে ঠিক ডানা-কাটা পরীর মত ছিল না!'

পায়ে পায়ে ছবির কাছে এগিয়ে গেলুম। পটে আঁকা আছে এক বুড়ীর চেহারা,—তার বয়স পঁইষট্টির কম হবে না। লিক্‌লিকে দেহ, বাঁখারির মতন সরু বাহু, সাদা শনের মতন চুলগুলো কাঁধের উপর এসে পড়েছে। ঠোঁটের কোণে অত্যন্ত কুৎসিত হাসি, নাকটা টিয়া-পাখির মতন বাঁকানো, আর তার কোটরে-ঢোকা কুৎকুতে চোখ দুটো! —ওঃ, সেই চোখ দুটোর ভিতর থেকে যে ক্রূর দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে, আমি কিছুতেই তা বর্ণনা করতে পারব না! আমার মনে হল, গোখরো সাপের চেয়েও ভয়ানক সেই চোখ দুটো যেন এখনো জ্যান্ত হয়ে আছে! ছবিতে-আঁকা মূর্তি ও তার চোখ যে এত বেশী স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়, এটা কখনো কল্পনা করতে পারি নি! বিলিতী কেতাবে-

আঁকা ডাইনী মূর্তি যেন রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে !

মানিক বললে, 'কি হে অমল, এই মেম-সাহেবটিকে তোমার পছন্দ হল ?'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আমি বললুম, 'পছন্দ। যাকে দেখে এই ছবিখানা আঁকা হয়েছে, সে-মানুষটির প্রকৃতি নিশ্চয়ই খুব জঘন্য ছিল। তোমার এই মেমের ছবি যদি ঘর থেকে সরিয়ে না রাখো, তাহলে রাত্রে আমি দুঃস্বপ্ন দেখব !'

মানিক বললে, 'কিন্তু ঘর থেকে যে কিছু সরাতে মানা আছে।'

আমি বললুম, 'তাহলে আমাকে অন্য ঘরে দাও !'

মানিক একটু ভেবে বললে, 'আচ্ছা, এস আমরা দুজনে মিলে

ছবিখানাকে নামিয়ে ঘরের বাইরে রেখে দি। তারপর বাড়ি ছাড়বার সময়ে ছবিখানাকে আবার দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে গেলেই চলবে।'

খাটের উপরে উঠে দুজনে মিলে সেই প্রকাণ্ড ছবিখানাকে নামাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু উঃ, সে কি বিষম ভারী ছবি,—ওজনে যেন একজন মানুষের দেহের মতই ভারী।

মানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ছবি কখনো এত ভারী হয়।'

অবশেষে কষ্টেসৃষ্টে ছবিখানাকে নামিয়ে, ঘরের বাইরে ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে রেখে এলুম।

মানিক হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে চমকে উঠে বললে, 'ওকি অমল, তুমি হাত কাটলে কেমন করে? তোমার হাতে অত রক্ত কেন?'

তাড়াতাড়ি হাত তুলে দেখি, সত্যিই তো! আমার দুখানা হাত-ই যে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

তারপরেই মানিকের দুই হাতের দিকে তাকিয়ে আমিও বলে উঠলুম, 'মানিক, মানিক! তোমার হাতেও যে রক্ত!'

মানিক নিজের হাতের দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে বললে, 'তাই তো। কখন যে হাত কেটেছে, আমি তো কিছুই টের পাইনি!'

দুজনে তখনি ছুটে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেললুম। তারপর আপন আপন হাতের দিকে তাকিয়ে আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। আমাদের কারুর হাতেই কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই!

তবে এ কিসের রক্ত? এ কী রহস্য?

॥ ৫ ॥

সে রাত্রে চাঁদের আলো এসে বাইরের অন্ধকারের সমস্ত ময়লা ধুয়ে দিয়েছিল এবং দূরের নদী পাহাড় বনকে দেখাচ্ছিল ঠিক পরীস্থানের স্বপ্নময় দৃশ্যের মত।

সেইদিকে মোহিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

আচম্বিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল! কি জন্যে ঘুম ভাঙল, সেটা বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু এটা বেশ অনুভব করলুম, ঘরের ভিতরে নিশ্চয়ই কোন একটা অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে!

ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসে চেয়ে দেখি, কালো মেঘের চাদরে চাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে গেছে!

ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ আমার নাকে এলো—মেডিকেল কলেজে যে-ঘরে পচা মড়া কাটা হয়, একবার সেই ঘরে ঢুকে আমি ঠিক এই রকম দুর্গন্ধই পেয়েছিলুম!

হঠাৎ আমার মাথার উপর কে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললে,—আমার স্তম্ভিত বুকটা ঢিপঢিপ করলে লাগল।

ভাবলুম, মনের ভুল! হয়তো জানলা দিয়ে হাওয়ার দমক এসে আমার চুলে লেগেছে।

একটু সরে বসে বিছানা হাতড়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা পেলুম। একটা কাঠি জ্বেলে তুলে ধরে তাড়াতাড়ি ঘরের চারিদিকটা একবার দেখে নিলুম।

দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। কিন্তু যা দেখেছি, সেইটুকুই যথেষ্ট!

মানিক আর আমি দুজনে মিলে যে ভারী ছবিখানাকে ধস্তাধস্তি করে নামিয়ে বাইরে রেখে এসেছিলুম, সেই ছবিখানা ঘরের দেওয়ালে যেখানে ছিল আবার ঠিক সেইখানেই টাঙানো রয়েছে!

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কি করব,—হঠাৎ আমার কাঁধের উপর কে যেন একখানা হাত রাখলে,—বরফের মত ঠাণ্ডা কনকনে একখানা হাত।

ভয়ে পাগলের মত হয়ে গিয়ে আমি সামনের দিকে সজোরে এক

ঘুষি ছুঁড়লুম এবং পরমুহূর্তেই কে যেন সশব্দে দড়াম করে মেঝের উপরে পড়ে গেল!

আমিও আর অপেক্ষা করলুম না,—তীরের মত ছুটে ছাতের ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলুম।

সিঁড়ির ঠিক তলাতেই একটা লণ্ঠন হাতে করে উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়েছিল মানিক। আমাকে দেখেই শুধোলে, 'ব্যাপার কি? তোমার ঘরে ও-কিসের শব্দ হল?'

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'তোমাদের সেই ডাইনীর ছবি আবার ঘরে ফিরে এসেছে।'

—'ধ্যেৎ। যত বাজে কথা। ছবির কি পা আছে? দাঁড়াও, দেখে আসি।'—এই বলে মানিক দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল।

কিন্তু তারপরেই শুনলুম মানিকের উচ্চ আর্তনাদ এবং তার পরেই দেখলুম, সে একসঙ্গে তিন-চারটে সিঁড়ি টপকে নীচে নেমে আসছে। আকুল স্বরে সে বললে, 'ঘরের ভিতরে পচা মড়ার গন্ধ আর ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা বুড়ীর পচা আর গলা মড়া!'

হঠাৎ আমার নিজের গায়ের দিকে নজর পড়ল—আমার কাঁধের উপর থেকে একটা রক্তের ধারা গা বয়ে নেমে আসছে। এই কাঁধেই সেই বরফের মত ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়েছিলুম।

খামেনের মমি

॥ ১ ॥

য়ুরোপ বেড়িয়ে ফিরছি। ফেরবার মুখে একবার জাহাজ থেকে নেমে নীলনদের দেশ—অর্থাৎ মিশরদেশকে দেখতে গেলুম।

প্রাচীন মিশর আর নেই। যে মিশরের অতীত কীর্তি, বিপুল সভ্যতা, বিচিত্র শিল্প-গৌরব, দিগ্বিজয়ী রাজগণ ও পরাক্রমশালী পুরোহিতবৃন্দ সমস্ত জগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাকে আজ কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যায়। তার পিরামিড ও দেবপূজার মন্দির আজও অক্ষয় হয়ে মরুভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে তার সন্তানদের আজও দেখা যায়, সেদিনকার নীলনদ আজও সেই একই সঙ্গীত গেয়ে সমুদ্রের সন্ধানে ছুটে চলে, কিন্তু প্রাচীন মিশরীদের একজনও বংশধর পৃথিবীর বুকে আজ বর্তমান নেই। একটা অত বড় জীবন্ত জাতি কেমন করে এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তা ভাবলে রহস্য বলে মনে হয়। আজ যাদের মিশরী বলে ডাকা হয়, তারা হচ্ছে এক সম্পূর্ণ নূতন ও আধুনিক জাতি।

এই নূতন জাতির দেশে গিয়ে সেই মৃত পুরাতন জাতির অনেক শিল্পকীর্তি ও গৌরবের নিদর্শন দেখলুম। মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। কার্ণাকের মন্দিরের সামনে বসে বসে খানিকক্ষণ পুরাতন মিশরকে ভাবতে চেষ্টা করলুম।

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ বেদুইন আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করলে। তারপর আমার আরও কাছে সরে এসে চুপি চুপি বললে,—'হুজুর, 'মমি' কিনবেন? খুব ভালো 'মমি'।'

সেকালকার নানান্ জিনিস কেনা ছিল আমার একটা মস্ত বাতিক। 'মমি' কাকে বলে সকলেই জানেন বোধ হয়। প্রাচীন মিশরীরা বিশ্বাস করত, মানুষের প্রাণ বেরিয়ে গেলেও সে মরে না। শেষ-বিচারের দিন দেবতাদের কাছে গিয়ে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে জবাব-দিহি করতে হয়। ওসিরিস্ হচ্ছেন শেষ বিচারকর্তা ও অমর জীবনের দেবতা। প্রাচীন মিশরীরা মানুষের মৃতদেহগুলোকে রাসায়নিক ঔষধের প্রভাবে নষ্ট হতে দিত না। কবরের ভিতরে সেই অক্ষয় দেহগুলোকে তারা রেখে দিত—চূড়ান্ত বিচারের দিন ওসিরিসের সামনে গিয়ে আবার তারা জীবন্ত হয়ে নিজেদের কাহিনী বলবে বলে। এই রকম রাসায়নিক ঔষধের প্রভাবে সুরক্ষিত মৃতদেহেরই নাম 'মমি'। পুরাতন সমাধি খুঁড়ে এমনি অসংখ্য মমি পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেরই যাদুঘরে ও খেয়ালী লোকের বাড়িতে খুঁজলে এই রকম মমি আজ দেখতে পাওয়া যাবে। কলকাতার যাদুঘরেও একটি মমি আছে—যদিও সেটি আজ আর আস্ত নেই।

অনেক দিন থেকে আমারও একটি মমি কেনবার শখ ছিল। যথেষ্ট দর কষাকষির পর বেদুইন-বুড়োর কাছ থেকে যে মমিটা আমি কিনলুম, তার ভিতরে কিছু নূতনত্ব ছিল। এটি হচ্ছে একটি অত্যন্ত বামনের মমি—মাথায় আড়াই ফুটের বেশী হবে না। চার হাজার বছর আগে এই বামন-অবতারটি প্রাচীন মিশরের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এ রকম সুরক্ষিত মমি বড় একটা চোখে পড়ে না। দেখলেই মনে হয় প্রাণ পেলে আজও যেন এ হেসে খেলে চলে বেড়াতে পারে।

এই বামনের মমি নিয়ে সানন্দে ভারতগামী জাহাজে গিয়ে উঠলুম।

॥ ২ ॥

লোকে বলে, আমার বাড়িটি নাকি একটি ছোটখাটো মিউজিয়াম। অতীতের ও বর্তমানের নানান্ দেশের নানান্ অদ্ভুত জিনিস দিয়ে আমার বৈঠকখানাটি সাজানো। তারই মাঝখানে একটি 'গ্লাস-কেসে'র ভিতরে আমি সেই বামনের মমিটিকে দাঁড় করিয়ে রাখলুম।

মা তো রেগেই অস্থির! অত্যন্ত ভয় পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'ছি, ছি, গেরস্তের বাড়িতে কোন্ দেশের কোন্ জাতের একটা শুকনো পচা মড়া এনে রাখা! সংসারের অকল্যাণ হবে যে রে!'

অনেক বন্ধুও বিদ্রোহ প্রকাশ করলে। কোন কোন বেশী-ভীতু বন্ধু সন্ধ্যার পর আর আমার বৈঠকখানায় ঢুকতে রাজী হতেন না। আমি কিন্তু সমান অটল। সকলকে বোঝাতে লাগলুম,—কোন ভয় নেই, মরা গরু ঘাস খায় না। চার হাজার বছর আগে যে মরেছে, এই বিংশ শতাব্দীতে আর সে কারুকে ভয় দেখাতে পারবে না।

কিন্তু মাসখানেক পর থেকে একটা নতুন ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগলুম। যখন মমিটা কিনেছিলুম, তখন এই বামন-মূর্তির দুই চোখ ছিল বন্ধ! কিন্তু আজকাল দেখছি, এর চোখ দুটো ধীরে ধীরে খুলে আসছে! মাস-দুয়েক পরে সেই বামন সম্পূর্ণরূপে চোখ মেলে তাকালে! যদিও সে চোখে পলক পড়ে না এবং তাতে জীবনের কোন লক্ষণই নেই, তবু এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখে আমারও মনটা কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিন্তু আমার এক ডাক্তার-বন্ধু শেষটা আমায় বুঝিয়ে দিলে, জল বায়ুর পরিবর্তনের জন্যেই এই ব্যাপারটা ঘটেছে। জলবায়ুর পরিবর্তনে দরজা-জানলার কাঠ যেমন ফাঁক হয়ে যায়, এও তেমনি আর কি!

ডাক্তার-বন্ধুর কথা শুনে আমার মনের খটকা গেল বটে, কিন্তু দিন-কয় পরে আর এক আশ্চর্য কাণ্ড !

অনেক রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনলুম, বাইরের ঘর থেকে কিসের শব্দ আসছে !—যেন কেউ কোন আলমারির কাঁচের উপরে ঘন ঘন করাঘাত করছে—ঝন্-ঝন্-ঝন্-ঝন্-ঝন্-ঝন্ !

কী ব্যাপার ? বৈঠকখানায় চোর-টোর ঢুকল নাকি ?—ধড়-মড়িয়ে বিছানার উপরে উঠে বসলুম।

সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে আরো জোরে আর একটা শব্দ হল। ঝন্-ঝন্ করে যেন একরাশ কাঁচ ভেঙে পড়ল ! আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না, চোর ধরবার জন্যে দ্রুতপদে বাইরের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম।

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে কিন্তু চোর-টোর কিছুই দেখতে পেলুম না—কেবল 'গ্লাস-কেস'টা ভাঙা এবং বামনের মমিটা ঘরের মেঝের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে !

অবাক হয়ে গেলুম বটে, তবু মনকে এই বলে প্রবোধ দিলুম যে, হয়ত কোনগতিকে মমিটা টলে কাঁচের উপরে এসে পড়াতে 'গ্লাস-কেস'টা ভেঙে এই ব্যাপার ঘটেছে।

পরদিন 'গ্লাস-কেস'টা মেরামত করিয়ে মমিটাকে তার ভিতরে আবার রেখে দিলুম। কারুকে ব্যাপারটা জানানো দরকার মনে করলুম না। যদি বলি, হাজার হাজার বছরের পুরানো মমি আমার 'গ্লাস-কেস' ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেছে, তা'হলে লোকে আমাকে পাগলের ওষুধ খেতে বলবে। সত্য সত্যই তা অসম্ভব !

॥ ৩ ॥

শরীরটা সেদিন ভালো ছিল না। সন্ধ্যার সময়ই রাত্রের আহারাদি সেরে নিয়ে, বৈঠকখানার সোফায় বসে বিশ্রাম করছিলুম।

হঠাৎ দরওয়ান এসে জানালে, একজন বিদেশী লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। আগন্তুকের একখানা কার্ড সে আমায় দিলে। তাতে লেখা রয়েছে—এমিন্ পাশা, কাইরো।

বিস্মিত হলুম। ইজিপ্টের রাজধানী কাইরো, সেখানকার কারুকে আমি চিনি না, কে এই এমিন্ পাশা? আমার কাছে তার কি দরকার? যা হোক, দরওয়ানকে বললুম, তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে।

মিনিট-খানেক পরে যে মূর্তি ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল তাকে দেখবার কল্পনা আমি করিনি। মাথায় সে প্রায় সাড়ে ছয় ফুট উঁচু, তার উপরে একটা 'ফেজ' টুপি থাকার দরুন তাকে আরো বেশী লম্বা দেখাচ্ছিল। চওড়ায় তার দেহ রীতিমত শীর্ণ। একটা কম্ফর্টার দিয়ে প্রায় তার সারা মুখ ও গলা ঢাকা—তার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে কেবল চশমাপরা দুটো তীক্ষ্ণ চোখ এবং নাক ও গালের সামান্য অংশ মাত্র। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো একটা কোট ও ইজের। আগন্তুককে দেখেই মনের ভিতর কেমন একটা অজানা অদ্ভুত ভাব জেগে উঠল।

অত্যন্ত ভরাট গলায় আগন্তুক ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই কি মিঃ সেন?'

আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি এত প্রখর, যে সেদিকে তাকানো যায় না। চোখ নামিয়ে আমি বললুম, 'বসতে আজ্ঞা হোক মিঃ এমিন্ পাশা। আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?'

এমিন্ পাশা আমার সামনের একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'মিঃ সেন, সুদূর কাইরো থেকে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'আমার এতটা সম্মানের কারণ কি?'

এমিন্ পাশা সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'মিঃ সেন, খামেনের মমি আপনার কাছেই আছে?'

—'খামেন? খামেন কি?'

—'খামেন ছিল চার হাজার বছর আগে মিশরের এক বামন পুরোহিত। মাস-কয় আগে খামেনের সমাধি থেকে তার মমিটা একজন বেদুইন চুরি করেছে। ওসিরিসের অভিশাপে সেই হতভাগ্য বেদুইন আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু খবর পেলুম খামেনের মমিটা আপনার কাছেই আছে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সেই মমিটা আমি টাকা দিয়ে কিনেছি।'

এমিন্ পাশা পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে বললেন, 'কত টাকা পেলে আপনি খামেনের মমি আবার ফিরিয়ে দিতে পারেন?'

আমি একটু বিরক্ত স্বরে বললুম, 'মমিটা বেচবো বলে আমি কিনিনি। টাকার লোভ আমাকে দেখাবেন না।'

এমিন্ পাশা তাঁর দুই কনুই টেবিলের উপরে স্থাপন করে হাত-দুখানা কপালের উপর এমন ভাবে রাখলেন যে, তাঁর চোখ দুটোও আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল। সেই অবস্থায় তিনি বললেন, 'মিঃ সেন, খামেনের মমির উপরে আপনার কোনই দাবি নেই।'

আমি হেসে বললুম, 'টাকা দিয়ে কিনেও ওর উপরে যদি আমার দাবি না থাকে, তবে দাবি আছে কার?'

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে এমিন্ পাশা বললেন, 'মিঃ সেন, ও মমির উপরে কোন মানুষেরই দাবি নেই। মমি টাকা দিয়ে কেনবার জিনিস নয়। ওসিরিস্ তাকে গ্রহণ করেছেন।'

আমি হেসে উঠে বললুম, 'ওসিরিস্। সে তো সেকেলে রূপ-কথার দেবতা।'

এমনি পাশার সারা দেহের উপর দিয়ে যেন একটা কম্পনের বিদ্যুৎ খেলে গেল। হঠাৎ চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসে কঠিন কর্কশ স্বরে তিনি বললেন, 'না! ওসিরিস্ রূপকথার দেবতা নন! আজকের এই দু'দিনের সভ্যতা আধুনিক মানুষকে অন্ধ আর ভ্রান্ত করে তুলেছে, তাই তারা এমন কথা বলতে সাহস করে। ওসিরিস্ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, অমর জীবন-দাতা! প্রাণ গেলেও মানুষের আত্মা বর্তমান থাকে। প্রত্যেক মানুষের আত্মা আর দেহ ওসিরিস্ গ্রহণ করেন। শেষ-বিচারের দিন পর্যন্ত সেই দেহ তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে তিনি ছাড়া আর কারুরই মানুষের মৃতদেহের উপরে কোন অধিকার নেই!'

আমি অবহেলা ভরে বললুম, 'বেশ! তা'হলে ওসিরিস্ নিজে এসে যেদিন দাবি করবেন, সেই দিন আমি খামেনের মমি তাঁকে ফিরিয়ে দেবো।'

এমিন্ পাশা আচম্বিতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে বললেন, 'নির্বোধ মানুষ! তাই নাকি?'—বলেই তিনি একটানে তাঁর মুখের কম্ফর্টার ও মাথার টুপিটা খুলে ফেললেন এবং চশমাখানা টেনে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন!

তারপর আমার স্তম্ভিত দৃষ্টি এক অভাবিত ও অসম্ভব দৃশ্য দেখলে। এমিন্ পাশার কাঁধের উপর যে মুখখানা জেগে রয়েছে, তা কোন জ্যান্ত মানুষের মুখের মতন নয়! সে হচ্ছে হাজার হাজার বছরের পুরানো অত্যন্ত বিশুষ্ক এক নরদেহ—অর্থাৎ ভীষণ মমির মুখ! মাথার উপর থেকে বিশীর্ণ মুখের দু'পাশে তৈলহীন পিঙ্গল কেশপাশ লটপট করে দুলছে এবং চিবুক থেকে তেমনি রুক্ষ শ্মশ্রুগুচ্ছ বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে!—এ মুখ আমি ইজিপ্টের যাদুঘরে দেখেছি, এ হচ্ছে ওসিরিসের প্রস্তর-মূর্তির মুখ!

মাথা ঘুরতে লাগল, সারা দেহ অবশ হয়ে এলো—ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং সেই সময়েই আমি এক অদ্ভুত,
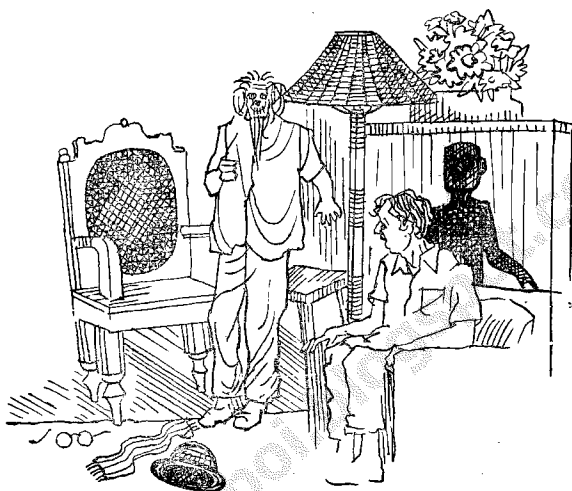
বীভৎস ও অমানুষী কণ্ঠস্বরে শুনতে পেলুম—'খামেন! খামেন! খামেন! জাগ্রত হও, তুমি আবার জাগ্রত হও!'

যখন আমার জ্ঞান হল, দেখলুম আমি সোফার উপরে শুয়ে রয়েছি এবং মাথার কাছে বসে মা আমার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন।

সব কথা আমার মনে পড়ে গেল, তাড়তাড়ি উঠে বসলুম।

মা উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোর কি হয়েছিল বাবা? এখানে অত গোলমাল হচ্ছিলই বা কেন, আর ওই 'গ্লাস-কেস'টাই বা ভাঙল কেমন করে?'

আমি এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে দেখি, 'গ্লাস-কেস'টা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং তার ভিতরে বামনের সেই মমিটা আর নেই!

তাড়াতাড়ি ফিরে বললুম, 'মা, মা, এখানে এসে আর কারুকে দেখতে পেয়েছ?

মা কিছুই বলতে পারলেন না।

চেঁচিয়ে দরওয়ানকে ডাকলুম, তার মুখে জানলুম ফটক দিয়ে কেউ বাইরে বেরিয়ে যায়নি।

সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও এমিন্ পাশা বা সেই মমির কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘরের মেঝেয় শুধু কুড়িয়ে পেলুম, এমিন্ পাশার সেই টুপি, চশমা, কম্ফর্টার, জামা, ইজের ও একজোড়া জুতো!

আমি কি অসুস্থ দেহে কোন বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি? না, কোন চোর ছদ্মবেশে এসে আমাকে ভয় দেখিয়ে ঠকিয়ে মূল্যবান মমিটাকে চুরি করে নিয়ে গেল?